এই আলোয়

তুলসী সেনগুপ্ত

১০/২ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০ ০০৯

সুদীর্ঘ বছরের বন্ধু,

প্রয়াত নির্মাল্য আচার্য-র স্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ—

রঙ্গভূমি

দূরের আকাশ

লোনা স্বাদ

পালা বদল

সুন্দরবনের মানুষখেকো

নিখোঁজের খোঁজে

খুদে ক্যামেরাম্যান

ধারাগিরি রহস্য

তিনটে নারকেল গাছ ও প্রভাবতী

দক্ষিণের জানালায় চোখ রেখে স্থির হয়ে শুয়ে থাকেন প্রভাবতী। মধ্য আষাঢ়ের আকাশ ঘোলাটে। জোর হাওয়ায় দোল খাচ্ছে গাছের পাতা, খ্যাপামি শুরু করে দিয়েছে তিনটে নারকেল গাছ। সুখেন্দুবিকাশ নিজের হাতে গাছ তিনটেকে পুঁতেছিলেন। গাছ পোঁতার আগে কত রকমের কাণ্ডই না করেছিলেন উনি, ভাবেন প্রভাবতী। কার কাছ থেকে যেন জেনেছিলেন,গাছ খুব ফলনশীল হয় যদি সোনা-রুপোর টুকরো আর বেশ কিছু নুন গাছের গোড়ায় পুঁতে দেওয়া যায়। কথাটাকে অগ্রাহ্য করতে পারেননি সুখেন্দুবিকাশ। প্রভাবতী ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ওঁর ওই সব কাণ্ড দেখে। কেননা, মানুষটাকে কোনদিনই মন্দিরে যেতে দেখেননি, চিরকাল যিনি ছিলেন পুজো-আর্চার বিরুদ্ধে তাঁরই এধরনের আচরণে বিস্ময় না হয়ে কি পারে? পারে না। বিস্মিত হলেও প্রভাবতী ওঁর কাজকর্মে কোন প্রতিবাদ তোলেননি। কেননা, প্রভাবতী ভাল করেই জানেন, ওঁর কোন ব্যাপারেই প্রতিবাদ করা মানেই অশান্তিকে ডেকে আনা। দেশ ভাগ হওয়ার অনেক আগেই তো সুখেন্দুবিকাশ সংসার পেতেছিলেন কলকাতায়। মুদিয়ালির পাড়াতেই তো কেটে গেছে জীবনের সেরা সময়। এখন প্রৌঢ় সুখেন্দুবিকাশ। হঠাৎ একদিন প্রভাবতীকে বলেছিলেন, 'ভাড়া বাড়িতেই তো জীবন কাটালাম, বাকি যে ক'টা দিন বাঁচবো, চালা ঘর বানিয়েই থাকব, কী বলো?'

প্রভাবতী খাওয়া সেরে পান মুখে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'কোথায় যাবে ভাবছ?'

'কোথায় আবার, চান্দারের অনেকেই এখন কুঁদঘাটে ঘর বেঁধে আছে। তোমার মাসতুতো ভাই মানুও তো জমি দখল করে ঘর তুলে দিব্যি রয়েছে। অফিসপাড়ায় আজই ওর সঙ্গে দেখা। ও-ই বললো, 'জামাইবাবু চলে আসুন কুঁদঘাটে। জায়গা আমরাই ঠিক করে দেব, কোন ভাবনা নেই।'

'জবরদখল জায়গায় মেয়েদের নিয়ে উঠবে? রোজই তো মারামারি কাটাকাটির কথা দেখতে পাই কাগজে। আমার খুব ভয় করে উঠতি বয়সের মেয়েদের নিয়ে ওসব জায়গায় থাকতে।' উদ্বেগমাখান গলায় প্রভাবতী বলেছিলেন কথা ক'টি।

সে কথায় হো হো করে হেসে ফেলেছিলেন সুখেন্দুবিকাশ। বলেছিলেন, 'জল-জঙ্গলের মানুষ তুমি। তোমাব এত ভয় কিসের?'

'ভয় সাপখোপের নয়, ভয় মানুষকে।' প্রভাবতী উত্তর দিয়েছিলেন।

সুখেন্দুবিকাশ সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলেছিলেন, 'তোমরাই তো বলো, মানুষের মাঝে নারায়ণ আছে, তাহলে মানুষকে এত ভয় কর কেন?'

প্রভাবতী পিকদানিতে পানের পিক ফেলে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আবার শয়তানও আছে মনে

রেখো। তোমার রুনু-ঝুনুর চেহারা নজরে পড়ার মত, এটা তো মানো? তাছাড়া এখানে যেভাবে মানুষ হয়েছে, ওসব জায়গায় গিয়ে হয়তো কষ্টে পড়বে।'

'তুমি মিথ্যে ভাবছ। অত ভেব না। নারানকে বলে রেখেছি। ওই সব দেখাশুনো করবে। আমি রোজই যাব জমি দখল করতে। কথায় বলে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। দেশভাগ তো আমরা করিনি, করেছে নেতারা। তা আমরা যদি মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিতে পারি, ক্ষতি কী?'

'অন্যের জায়গা, জোর করে দখল করা অন্যায়।'

'বাজে বকো না। ন্যায়-অন্যায়ের তুমি কী বোঝ? কাল না ফিরলেও চিন্তা করো না', আর কথা না বাড়িয়ে সুখেন্দুবিকাশ ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক রাতে জল-কাদা মাখা শরীর নিয়ে ক্লান্তগলায় ডাক দিয়েছিলেন প্রভাবতীকে। প্রভাবতীকে দরজা খুলে অবাক চোখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলেছিলেন সুখেন্দুবিকাশ, 'একা আমার দ্বারা হবে না, সকলেই বউ-ছেলে নিয়ে জমি দখলে নেমেছে। তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

প্রভাবতীর শরীরে কেমন এক ঠাণ্ডা হিমস্রোত বয়ে যায় মুহূর্তে। বলেছিলেন, 'কী বলছো তুমি। রুনু-ঝুনুকে কার ওপর ভরসা করে রেখে যাবে?'

'আহা, ওদের বুঝিয়ে বলো না। ভয়ের কী আছে। সকালেই তোমার ভাই নারান আসবে। ওই তখন সব দেখা শোনা করতে পারবে।'

কথা না বাড়িয়ে রুনু-ঝুনুকে জাগিয়ে সব বলে প্রভাবতীও সঙ্গ নিয়েছিলেন সুখেন্দুবিকাশের। কাঠের পুল পেরিয়ে একেবারে পশ্চিম পুঁটিয়ারিতে এসে দেখে অগুনতি মানুষের চিৎকার চেঁচামেচিতে বাতাস ভারী। সকলেই পাগলের মত জমি দখল করায় মত্ত। যে জমিই দখল করতে যায়, অমনি কেউ না কেউ এসে বলে, এ জমি দখল হয়ে গেছে। হতাশ হয়ে পড়েছিলেন প্রভাবতী। বলেছিলেন, 'সব জায়গাই তো দখল হয়ে গেছে।'

সুখেন্দুবিকাশ বলেছিলেন, 'বসুন্ধরা কি এতই কৃপন যে আমাদের জন্য একটুও জায়গা রাখবেন না। চল একটু এগিয়ে যাই। নিশ্চয়ই কোন না কোন জায়গা এখনও খালি পড়ে রয়েছে। নজর করে বেছে নিতে হবে এই যা।'

বুড়ো মতন একজন সব কিছু নজর করছিল। সুখেন্দুবিকাশকে হাতের ইশারায় ডেকে বলেছিল, 'এই জায়গাটা দখল নিয়ে নাও। জলা জমি হলে কী হবে। মূর্খরা বোঝে না কোন জমি ভাল, কোন জমি মন্দ।'

সুখেন্দুবিকাশ বলেছিলেন, 'ভালই যদি তো আপনি দখল নিচ্ছেন না কেন?'

'একা মানুষ, কার জন্য ঘর বাঁধবো।' একটুক্ষণ থেমে ফের বলেছিল বুড়ো মানুষটা, 'এই দেখুন, বড় রাস্তা। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই জায়গাটা জমজমাট হয়ে যাবে।' কথা ক'টি বলেই লোকটা কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল টের পাননি ওঁরা।

সুখেন্দুবিকাশ চাপা গলায় বলেছিলেন, 'বুঝলে প্রভা, লোকটা খাঁটি কথা বলেছে। জলা জমি মাটি দিয়ে ভরাট করতে কতক্ষণ। কেউ-ই এখানটা নজর করেনি।'

মানুকে দেখে সুখেন্দুবিকাশ বলেছিলেন, 'এ জলা জায়গাটাই দখল নিয়ে নি, কী বলো?'

'নিন, দেরি করবেন না। সুবল ঘরামিকে এখুনি লোকজন দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। খুব করিৎকর্মা। দু'দশ টাকা চাইলে না করবেন না, দিয়ে দেবেন।'

জায়গাটা দেখে মন ভরেনি প্রভাবতীর। বলেছিলেন, 'এখানে কি মানুষ বাস করতে পারে মানু?'

সুখেন্দুবিকাশ চাপাগলায় বলেছিলেন, 'অনেকখানি জায়গা, প্রায় ন' দশ কাঠার মত হবে। জলা জমি ভরাট করতে কতক্ষণ। কাটা খালটা দেখিয়ে বলেছিলেন, 'ওই দেখ কত মাটি ওপাশে। টাকা আছে, লোকবল আছে, ভাবনা কী। এসো। বলেই হাঁটু ডোবাজল কাদা ভেঙে সে রাতে প্রভাবতী আর সুখেন্দুবিকাশ এ কোণ থেকে ও কোণ জুড়ে বাঁশের খুঁটি পুঁতে দিয়েছিলেন। মানুও লোকজন নিয়ে সুবল ঘরামিকে সঙ্গে করে হাজির হয়ে গিয়েছিল। রাত থাকতেই ছোট্ট মতন চালাঘর তৈরি করে ফেলেছিল ওরা। এর দু-তিন দিনের মধ্যেই টাকার জোরে জলা জমি ভরাট করে ফেলেছিলেন সুখেন্দুবিকাশ।

মানুকে করুণ মুখ করে বলেছিলেন প্রভাবতী, 'মেয়ে দুটোর একটা খোঁজ নিয়ে আয় না মানু?'

'ভেব না দিদি, নারান যখন আছে কোন অসুবিধে হবে না ওদের।' কিছুক্ষণ ইতস্তত করে মানু সুখেন্দুবিকাশকে লক্ষ করে বলেছিল, 'পরশু কলোনি কমিটি গঠন করা হবে। এতখানি জায়গা আপনি একা ভোগ দখল করতে পারবেন না জামাইবাবু।'

সুখেন্দুবিকাশ বিষণ্ণ গলা করে বলেছিলেন, 'এত কষ্ট করে জায়গা দখল করলাম, সব ব্যর্থ হবে?'

'তা কেন? জানেন তো, অবিবাহিতা মেয়েদের নামে জমি রাখা চলে না। ভাবনার কী আছে, ছবি আর নিভার নামে জমি রাখুন না। শুধু ওদের জানিয়ে কমিটির সামনে হাজির থাকতে বলবেন। মোট ন' কাঠা জমি রাখতে পারবেন আপনি। ভাগ্যিস ওদের বিয়ে দিয়েছিলেন। আইনের প্যাঁচে আটকাতে পারবে না আপনাকে।' মানু সময়োচিত পরামর্শ দিয়ে বিষণ্ণ গলায় বলেছিল, 'আগে বুঝলে, এ জমি আমি আগেই দখল করতাম। যাক গে। আম-জাম-কাঠাল-নারকেল গাছে ভরা কী সুন্দর এই জায়গাটা। মরণ কামড় বসিয়ে এখানেই বসে থাকুন। ভয়ডর থাকলে জেতা যায় না। নারানকে বলে রুনু-ঝুনুকে নিয়ে আসব ভাবছি।'

সে কথায় আঁতকে উঠেছিলেন প্রভাবতী, বলেছিলেন, 'কী বলছিস মানু? ওরা কি এ জায়গায় মানিয়ে গুছিয়ে চলতে পারবে? তাছাড়া ওরা যুবতী হচ্ছে। কুনজরে পড়বে অনেকেরই।'

'পড়ুক। যত নজরে পড়বে ততই তোমাদের জিৎ। অনেক সাপোর্টার পেয়ে যাবে তুমি। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। এ কথা ভুলো না। যাদের জমি তারা আর কখনও ফিরবে না। প্রাণের মায়া বড় মায়া।' হাসতে হাসতে কথা ক'টি বলেই মানু চলে গিয়েছিল অন্যত্র।

পকেটে টাকা থাকায় জনমজুর পেতে অসুবিধা হয়নি সুখেন্দুবিকাশের। জমি ভরাট করে খুব তাড়াতাড়ি দুখানা শোবার ঘর, রান্নাঘর, পায়খানা বানিয়ে ফেলেছিলেন। ফলে জলা জায়গাটার চেহারাই গিয়েছিল পাল্টে। ঠিকমত ছবি আর নিভাকে খবর দিতে ভুললেন না সুখেন্দুবিকাশ। ফাঁক বুঝে রুনু-ঝুনুকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। ওদের ভয়ার্ত চোখ-মুখ দেখে সাহস জুগিয়ে বলেছিলেন, 'এত লোকজন আছে, আমরা আছি, ভয় কী।'

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল, দোকানপাট বসলো, বিজলি বাতিতে আলো ঝলমল করে উঠলো জায়গাটা, কলোনির লোকজন হঠাৎই একদিন আবিষ্কার করলো, সুখেন্দুবিকাশ সকলের থেকে ভাল জমির মালিক হয়েছে। মুখে কিছু না বললেও, মনের মধ্যে একধরনের খিঁচ ধরে আছে অনেকেরই।

থিতু হয়ে বসার পর একদিন সুখেন্দুবিকাশ প্রভাবতীকে বলেছিলেন, 'গাছগুলো কেমন ফনফনিয়ে বেড়ে উঠেছে দ্যাখ। উর্বরা ধরিত্রী। তুমিও তো ধরিত্রীরই মত। একটাও ছেলে নেই আমার। বড় সাধ আমার একটা ছেলে হোক।

প্রভাবতী সহাস্যে বলেছিলেন, 'সে সাধ কি আমারও নেই ভেবেছ? এখন তো তুমি আমার কাছেই আস না। কেমন দূরের মানুষ হয়ে গেছ। তুমি না এলে সাধ মিটবে কী করে?'

ভাবনাটা মুহূর্তেই লজ্জায় ফেলে দিল প্রভাবতীকে। কী লজ্জা? কী লজ্জা? ঘরে কেউ নেই অথচ লজ্জায় দু'চোখ বুজলেন প্রভাবতী, মনে পড়ল গভীর রাতে রুনু-ঝুনু ঘুমিয়ে পড়লে সুখেন্দুবিকাশের কাছে বেড়াল পায়ে চলে যেতেন। এবং সত্যি রুনু-ঝুনুর অনেকদিন পর প্রভাবতী গোবিন্দর জন্ম দিলেন। ছেলের সংবাদ জানা-চেনা মানুষদের ডেকে ডেকে বলে বেরিয়েছেন সুখেন্দুবিকাশ। কতজন কত রকমের ঠাট্টা তামাসা করেছে ওঁর সঙ্গে। সে সব গায়ে মাখেননি সুখেন্দুবিকাশ। কাঁচাপাকা চুল নিয়ে গোবিন্দকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন পাড়াময়।

প্রভাবতী বলেছিলেন, 'এভাবে ছেলে কোলে করে আর ঘুরো না।'

'নিজের ছেলেকে নিয়ে ঘুরবো, কার কী?'

প্রভাবতী উত্তর দিয়েছিলেন, 'নিমাই দাস সেদিন যা-তা বলছিল।'

'ওর কথা ছাড়। একপাল শুয়োর জন্ম দিয়ে হাঁপাচ্ছে হারামজাদা।'

প্রভাবতী ধমকে বলেছিলেন, 'ও কী কথা। ছিঃ ছিঃ। কখনও অমন কথা মুখে এনো না। এতে সংসারের অমঙ্গল হয়।'

সুখেন্দুবিকাশ রাগত স্বরে বলেছিলেন, 'শয়তানের সঙ্গে শয়তানি না করলে বাঁচা যায় না। শুয়োরের বাচ্চাদের চোখ টাটাচ্ছে আমার ছেলেটাকে দেখে।'

দক্ষিণের জানলায় চোখ রেখে নারকেল গাছ ক'টার দিকে চেয়েছিলেন প্রভাবতী। সুখেন্দুবিকাশের মৃত্যুর কিছুদিন পর পা পিছলে পড়ে গিয়ে নিম্নাঙ্গটা অসাড় হয়ে গিয়েছিল প্রভাবতীর। তাই শুয়ে শুয়ে দক্ষিণের জানলাটার দিকে অপলকে চেয়ে থাকেন। স্পষ্ট দেখতে পান, ঘাড় উঁচু করে সুখেন্দুবিকাশ পরম মমতায় গাছ ক'টাকে দেখছেন। আজকের মত এমনি হাওয়ায় গাছের পাতা যখন এপাশ ওপাশ দুলতো খ্যাপার মত, তখন উনিও খুশির হাওয়ায় মত্ত হয়ে উঠতেন।

ঠিক সে সময় গোবিন্দ ঘরে ঢুকে মা-র কপালে হাত ছুঁইয়েই আলমারি খুলে কী যেন খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

জিজ্ঞেস করলেন প্রভাবতী, 'কী খুঁজছিস?'

'মার্কশিট।'

'টিপটের ভেতরে আছে দ্যাখ।' একটুক্ষণ থেমে বললেন, 'কী হবে ও দিয়ে?'

গোবিন্দ উত্তর দেয়, 'ধীরেশ কাকুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। উনি বলেছেন, মার্কশিট নিয়ে কালই বাবার অফিসে যেতে, গভর্নমেন্টের নতুন অর্ডার বেরিয়েছে। সরকারী চাকুরেদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে একজনের চাকরি হবে এখন থেকে। কাগজে দু-একদিনের মধ্যেই খবরটা বেরুবে। অফিসে অফিসে সার্কুলার পৌঁছে গেছে।

প্রভাবতী জিজ্ঞেস করেন, 'চাকবি পেলে আর পড়বি না?'

'কী হবে পড়াশুনো করে, এম. এ. বি-এ, পাশ করা কত ছেলেমেয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে চাকরির জন্য। আজ বড়দির সঙ্গে দেখা হয়েছিল,' গোবিন্দ বলল।

প্রভাবতী সোৎসুক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু বলল?'

'নাহ্। চিনতেই পারল না, আমিও যেচে কথা বলি নি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রভাবতী। খোলা জানলা দিয়ে নারকেল গাছ তিনটের দিকে চেয়ে রইলেন।

গোবিন্দ বলল, 'ও জানলাটা এবার থেকে বন্ধ করে দেব। ওগুলো তোমাকে বড় কষ্ট দেয়।'

প্রভাবতী শঙ্কিত হয়ে বলেন, 'অমন কাজ করিস না গোবিন্দ। তবু তো চোখের দেখা দেখতে পাই।'

গোবিন্দ কথা না বাড়িয়ে মার্কশিট নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রভাবতীর দু'চোখ জলে ভরে গেল। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কান্না চাপলেন। নারকেল গাছ তিনটের কী যে টান। গোবিন্দ কি সত্যি সত্যি জানলাটা বন্ধ করে দেবে? ভাবনার কূলকিনারা কিছুই পান না। সময়ের পা যে এত দ্রুত এগিয়ে যায় টের পাননি প্রভাবতী। হিসেব কষে দেখলেন, প্রায় বাইশ বছর কেটে গেছে। গাছ তিনটেতে কত ফলই না ফলল। গোবিন্দও পাশটাশ করে জোওয়ান হয়ে উঠল। রুনু-ঝুনুর বিয়ে হয়ে গেছে। ওদের এখন ভর-ভরাট সংসার। সুখেন্দুবিকাশের ছবিটার দিকে স্থির চোখে চেয়ে থাকেন প্রভাবতী। মনে পড়ল, মানু একদিন এসে বলল, 'জামাইবাবু সরকার থেকে লোক আসবে পরশু। ছবি আর নিভাকে এসময় হাজির করে রাখবেন। না হলে কিন্তু জমি হাত ছাড়া হবে।'

'কী করবে এসে?'

সব দেখে শুনে প্রত্যেকের নামে অর্পনপত্র দেবে।

সুখেন্দুবিকাশ বলেন, 'তা বেশ। ও তুমি ভেব না মানু। ছবি আর নিভাকে ঠিক ঠিক হাজির রাখব।'

মানু বলেছিল, 'মাথা ঠাণ্ডা রেখে সব কিছু করবেন জামাইবাবু। আপনার বড় নাতি পল্টু কিন্তু দু'নম্বরী হয়ে গেছে, ওর সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনতে পাই।'

প্রভাবতীও বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, ওর বিরুদ্ধে অনেক কথা আমিও শুনেছি।'

সময় নষ্ট না করে সুখেন্দুবিকাশ ছবির বাড়িতে গিয়ে পৌঁছুলেন।

ছবি বলল, 'কী ব্যাপার বাবা?'

সুখেন্দুবিকাশ বলেছিলেন, 'সরকারের লোক পরশু আসছে। এখন তোদের উপস্থিতির বড় প্রয়োজন। ভাল জায়গায় বাড়ি করেছি বলে অনেকে জ্বলছে। তোরা থাকলে আমার কোন ভাবনা থাকবে না।'

ছবি বলেছিল, 'যাব তো নিশ্চয়ই। স্বত্ব কে ছাড়ে বল?'

'তা ঠিক। কত কষ্ট করে ও জমি এতদিন নিজের ভোগে রেখেছি। এখন কি তা হাতছাড়া করতে পারি?'

'ছাড়বে কেন? তোমার জামাইকে এক্ষুনি আমি ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি।'

'ফোন এসেছে তোর, বলিসনি তো?'

'এ আর এমন কী। ফোন ফ্রিজ সবই তো আছে। তোমার জামাই এই তো গত মাসে তিন-তলার স্যাংশান করিয়ে আনল এ বাড়িটার।' ছবি উত্তর দিয়েছিল।

শুনে সুখেন্দুবিকাশ বলেছিলেন, 'তোদের সুখই আমাদের সুখ। আমি আর বসবো না রে। চট্ করে নিভাকে খবরটা দিয়ে আসি।'

'কিছু না মুখে দিয়েই চলে যাবে? একটু বোসো, তোমার জন্যে কিছু নিয়ে আসি।'

'ওসব পরে হবে। এখন আমার অনেক কাজ।'

ছবি বলেছিল, 'ওখানকার জমি এখন নাকি পনের কুড়ি হাজাব টাকায় বিক্রি হচ্ছে?'

'বিক্রি হচ্ছে কিনা জানি না। তবে ওবকম দাম তো হবেই। লোকের হাতে এখন অনেক টাকা। জানিস তো, সরকার কাউকে সর্বস্বত্ব লিখে দিচ্ছে না।'

'সেকি? আমার জমি আমি বিক্রি করতে পারবো না।' ছবি ঝাঁঝিয়ে বলেছিল কথাগুলো।

সুখেন্দুবিকাশ বিষণ্ন গলা করে বলেছিলেন 'আগে জমিটা তো রক্ষা হোক। তারপর সে সব না হয় ভাবা যাবে। ভুলিস না কিন্তু, সকলকে নিয়ে সকাল সকাল চলে যাস। অনেকদিন তোরা কেউই যাস না। তোর মা খুব দুঃখ করছিলেন।'

ছবি হেসে জবাব দিয়েছিল, 'সংসারের শত ঝামেলা পুইয়ে কোথাও বেরুতে পারছি না।'

সুখেন্দুবিকাশ বলেছিলেন, 'বড্ড গিন্নি হয়ে গেছিস তুই। সংসার কি আমি করি না। শত সহস্র ঝামেলা কি আমাকেও পোয়াতে হয়নি। যাক্‌গে সে সব কথা। আমি আসি রে।' বলেই ধীর পায়ে ছবির বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এসেছিলেন নিভার বাড়ি।

নিভা তো সুখেন্দুবিকাশকে দেখে জড়িয়েই ধরলো। বাপ-মেয়ে দু'জনাই দুজনের গায়ের গন্ধ নিল। তারপর একসময় জলে ভরা একজোড়া চোখ নিয়ে নিভা বলেছিল, 'তোমরা আমরা কেউ কারো খোঁজ রাখি না। এ বড় অদ্ভুত সম্পর্ক। কেন যে মেয়েদের বিয়ে হয় বুঝি না। বাবা-মা-ভাই সকলে দূরের মানুষ হয়ে যায়।'

সুখেন্দুবিকাশ ধরা গলায় বলেছিলেন, 'দূর বোকা। সম্পর্কের শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। ও সব চোখে দেখা যায় না। জীবনের ধর্মই তো এই। তোদের লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়ে দিয়েছি, সব সময় তোদের মুখ মনে পড়ে। সব সময়েই ভাবি, তোরা সুখে থাক, আনন্দে থাক। এমনি তোরও একদিন হবে। মেয়েব বিয়ে দিবি। প্রথম প্রথম আসা-যাওয়া থাকবে। তারপর আস্তে

আস্তে সব থিতিয়ে যাবে। কেন জানিস, সকলেই নিজের নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এই তো জীবন। যাক গে, যার জন্য এসেছি, আগে বলে নিই, তারপর তোর সব কথা শুনব।' এক নিঃশ্বাসে সব কথা সবিস্তারে বলে নিভার মুখের দিকে সোৎসুক ভঙ্গিতে চেয়েছিলেন সুখেন্দুবিকাশ।

নিভা বাচ্চা মেয়ের মত খিলখিল করে বলেছিল, 'কেমন মজা। তোমাকে বলিনি। তোমার জামাইকে উদ্দেশ্য করে বলছি। কত বলি, চলো, একবার ঘুরে আসি, বাবু গা করেন না। খালি কাজ আর কাজ।'

সুখেন্দুবিকাশ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'অফিসের কাজ ছাড়া আর কী কাজ আছে ওর?'

'ওমা তাও জান না। বাঁশি বাজায়, ছবি আঁকে, আর থিয়েটারের ডিরেকশান দেয়। একদম খ্যাপা। সত্যি সুন্দর বাঁশি বাজায় ও। কতদিন বলেছি, বাবা-মাকে একদিন শোনাও, তো গা-ই করেন না।'

সুখেন্দুবিকাশ বিহ্বল হয়ে পড়েন সে কথায়। বলেন, এতদিনের মধ্যে একদিনও তুই একথা বলিস নি। তোর মা-ও খুব ভাল গান গাইতে পারতেন। জানিস আমাদের বিয়ের আসরে...কথাটা শেষ না করেই থেমে যান সুখেন্দুবিকাশ।

নিভা এরই মধ্যে এক প্লেট মিষ্টি আর চা নিয়ে এসে বলে, 'আগে খেয়ে নাও। তারপর শুনবো সব কথা।'

সুখেন্দুবিকাশ ভাবছিলেন, মেয়ের কাছে বাসর রাতের কথা কি বলা চলে। ভীষণ লজ্জায় পড়ে যান। কিন্তু সবকিছু গোপন রেখে খাবার খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। চা শেষ করে এবার একটা সিগারেট ধরালেন।

নিভা সহাস্যে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এবার বল তোমার বিয়ের আসরের কথা।'

সুখেন্দুবিকাশ বিপাকে পড়ে যান। তবুও নিঃসঙ্কোচে বলেছিলেন; 'তোর মা আমাকে একটা গান শুনিয়েছিলেন। কী মিষ্টি গলা। গানটা এখনও আমার মনে আছে, 'কোন সে তুমি অশোককাননে বন্দিনী তুমি সীতা।'

নিভা চটুল ভঙ্গি করে বলছিল, 'বাসরঘরে এ গান কেউ গায় নাকি?'

সুখেন্দুবিকাশ বলেছিলেন, 'আমাদের সময়ে এসব গানই হত। এখনকার মত গান আমাদের সময় ছিলই না বলতে গেলে। আর দেরি করতে পারবো না, সকলকে নিয়ে যাস কিন্তু।'

নিভা উৎসাহিত হয়ে বলেছিল, 'যাব না মানে। আজ বিকেলেই সদলবলে চলে যাব।'

সুখেন্দুবিকাশ যাবার মুখেও ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'তোরা সকলে গেলে বাড়িটার চেহারাই যাবে পাল্টে। কত কষ্টে ওই জায়গা দখল করেছিলাম, তা তোর মা ছাড়া আর কেউ জানে না। এখন যদি সব হাতছাড়া হয় তো কষ্টের শেষ থাকবে না। গোবিন্দর চাকরি বাকরি হলে যত তাড়াতাড়ি পারি বিয়ে দিয়ে দেব। অতবড় বাড়িটা এক এক সময় বড় খালি লাগে। ঘরভর্তি লোকজন না থাকলে কেমন যেন একঘেয়ে লাগে। কথা শেষ করেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন সুখেন্দুবিকাশ।

বিকেলেই ছেলেমেয়েকে সঙ্গে করে চলে এসেছিল নিভা। ছবি আসেনি।

পরদিন ছবি এল একা। সমস্ত পরিবেশটাই গেল পাল্টে। সরকারি লোকজনকে এখন আর ভয় নেই। সুখেন্দুবিকাশ আশ্বস্ত হলেন।

ছবি বলেছিল, 'তোমাদের জামাই বলেছে সবকিছু সেটেল হলে আমার অংশ বাউন্ডারি ওয়াল তুলে দেবে। ও এখানে একটা ছোটখাট লেদমেশিনের কারখানা খুলবে।'

কথাগুলো স্পষ্ট শুনলেও সুখেন্দুবিকাশ বিশ্বাস করতে পারেননি। ঘন্টা দেড়েক পর ছবির বড় ছেলে পল্টু এসে হাজির হল। কারও সঙ্গে কোন কথাও বলল না। কেবল ছবিকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার জমির সীমানা কতটুকু দেখিয়ে দাও তো?'

'আয় আমার সঙ্গে।'

সকলকে অবাক করে ছবি ওর নিজের সীমানার জমি দেখিযে বলল পল্টুকে, 'নারকেলগাছ তিনটেই আমার ভাগে পড়েছে রে।'

প্রভাবতী বলেছিলেন, 'ভাগাভাগির কথা উঠছে কেন?'

পল্টু চোঁয়াড়ে গলা করে উত্তর দিয়েছিল, 'উঠবে না কেন? এতদিন ধরে এ জমির সবকিছু ভোগ করেছ? সেটা আর হচ্ছে না। সবকিছু সেটেল হলেই কালই লোক পাঠিয়ে থাকার মত একটা ঘর তুলে ফেলব। আর বাউন্ডারি ওয়ালও যত তাড়াতাড়ি পারি তুলে ফেলব।'

প্রভাবতী কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, সুখেন্দুবিকাশ বাধা দিলেন ইশারায়।

সরকারের লোকের সামনে পল্টু বেশ কিছুক্ষণ নিজের সীমানা ঠিকমত চিনে নিয়ে ছোট বাঁশের খুঁটি পুঁতে দিয়ে নারকেল গাছ তিনটের দিকে চেয়ে হো হো করে হাসল।

সরকারী লোকজন চলে যেতেই পল্টু ছবিকে বলল, 'থেকে কী করবে, চলো বাড়ি যাই। গিয়েই বাবাকে ফোনে সব বল।'

প্রভাবতী ফ্যাকাশে মুখে চেয়ে থেকে বলেছিলেন, 'এত বেলায় না খেয়ে যাবি।'

ছবি উত্তর দিয়েছিল, 'কী করি বল। আমি না খেলে ও যে আবার খাবেই না।' কথা শেষ করেই ছবি পল্টুকে সঙ্গে করে এত বেলাতে না খেয়ে বেরিয়ে গেল।

'নিভা বলেছিল, ছিঃ ছিঃ।'

সুখেন্দুবিকাশ বলেছিল 'সবাই কি সমান হয় রে! মন খারাপ করে কী করবি। খেয়েদেয়ে একটু জিরিয়ে নে।'

খাওয়াদাওয়ার পর প্রভাবতী সুখেন্দুবিকাশকে জিজ্ঞেস করেছিলো, 'সত্যিই কি ছবি জমি ভাগ করে নেবে? নারকেল গাছ তিনটের দাবিও আমাদের থাকবে না?'

সুখেন্দুবিকাশের মন থমথমে হয়েই ছিল, তবু কোন কিছুই প্রকাশ করলেন না। বলেছিলেন, 'বাজে কথা। দেখলে না ছবি কেমন গম্ভীর হয়ে ছিল। দু-একদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

প্রভাবতী দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। বুকের গভীরে চিনচিনে ব্যথা টের পেয়েছিলেন। নারকেল গাছ তিনটের দিকে স্থির চোখে চেয়েছিলেন। কেননা, এরই মধ্যে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। পল্টু ঠিক পরের দিনই ওর মায়ের অংশের জমির মাঝখানে চালাঘর বানিয়ে ফেলেছে। একটা দিনও

ও এ বাড়িতে এল না। সারা দুপুর পড়ে পড়ে ঘুমোল। রাতে নেশা করে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছিল। সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল একদিন। সুখেন্দুবিকাশ বলেছিলেন, 'ভদ্রপাড়ায় এ ধরনের আচরণ করতে লজ্জা করে না।'

পল্টু যা জবাব দিয়েছিল, তাতে নিজেকে সামলে রাখতে পারেননি সুখেন্দুবিকাশ। পল্টুকে সপাটে গালে চড় কষিয়ে বলেছিলেন, 'ভদ্রভাবে থাকতে পারবি তো থাক নইলে...'

'নইলে কী করবি রে হেঁকোরে বুড়ো।' বলেই অশ্রাব্য গালিগালাজ আর অশ্লীল অঙ্গ-ভঙ্গি করতে কবতে বলেছিল, 'বেরিয়ে যা শালা আমার বাড়ি থেকে।'

দ্বিতীয় কোন কথা না বলে ঘাড় গোঁজ করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন সুখেন্দুবিকাশ। ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাচ্ছিলেন দিন দিন। একদিন তা প্রকট হয়ে ধরা পড়ল। বিছানা নিলেন সুখেন্দুবিকাশ।

প্রভাবতী একদিন গিয়ে পল্টুকে ডাকল। পল্টু তখনও ঘুমোচ্ছিল। ঘুম চোখেই জিজ্ঞেস করল, 'কী বলবে, বল না?'

প্রভাবতী ধরা গলায় বলেছিলেন, 'তোর দাদুর অসুখ, গোটা কয়েক ডাব নেব ভাবছি।'

পল্টু হ্যা হ্যা করে হেসে বলেছিল, 'মাল তো অনেক জমিয়েছ, বাজার থেকে কিনে আন না।'

'ও গাছ ক'টা তোর দাদু নিজের হাতে পুঁতেছিলেন। এতদিন ধরে বড় করেছেন, ও গাছে আমাদের কোন অধিকার নেই বলতে চাস।' প্রভাবতী ঋজু ভঙ্গিতে বলেছিলেন কথাগুলো।

পল্টু ঠিক আগেব মত ভঙ্গি করেই বলেছিল, 'ছোটলোকের বাড়ির ডাব খেলে ও বুড়োর ক্যাবেকটার নষ্ট হয়ে যাবে। পল্টু সরখেল যা বলে, ফাইনাল বলে, সে মাল খেয়েই বলুক, আর না খেয়েই বলুক।'

অপমান কী জানতেন না প্রভাবতী। ওব এ ধরনের কথায় তীব্র জ্বালা অনুভব করেছিলেন। তবু স্বত্ব ছাড়া চলবে না এই মনে কবে বলেছিলেন, 'গোবিন্দ লোক ডাকিয়ে কয়েকটা ডাব পেড়ে নিয়ে যা।'

পল্টু প্রভাবতীর সামনেই সিগারেট ধরিয়ে বলেছিল, 'কোন শালা এ [illegible] ড়ির ভেতরে ঢোকে দেখি, ঢুকলেই লাথি মেরে তাড়াব।'

প্রভাবতী বুঝেছিলেন, 'এই অমানুষটার সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না। মাথা নিচু করে বেরিয়ে এসেছিলেন। বাড়িতে এসে দেখেছিলেন, সুখেন্দুবিকাশ খাট থেকে পড়ে গেছেন। অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করেও যখন কোন সাড়া পেলেন না, তখন আকাশ ফাটানো চিৎকার করে সুখেন্দুবিকাশের নিথর নিস্পন্দ শরীরের ওপর আছড়ে পড়েছিলেন।

বিদ্যুৎবেগে সুখেন্দুবিকাশেব মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। চার মেয়েই এল। কিন্তু ছবির সঙ্গে কেউই কথা বলল না। ঘন্টাখানেক থেকেই পল্টুর ঘরে চলে গিয়েছিল ছবি।

নিভা, রুনু, ঝুনু শ্রাদ্ধশান্তি না হওয়া পর্যন্ত এ বাড়িতেই রয়ে গেল। পল্টু একবারের জন্যও উঁকি মারল না এখানে। কিন্তু পল্টুর ছোটভাই রান্টু এসে প্রভাবতীর পাশে বসে রইল অনেকক্ষণ।

নারকেল গাছ তিনটের দিক থেকে চোখ সরাতে পারেন না প্রভাবতী। বৃষ্টির জলে ঘর ভর্তি হয়ে গেলেও, জানালা বন্ধ করতে দেন না।

গোবিন্দকে বললেন, 'তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।'

'কী কথা?'

'বল রাখবি।'

প্রভাবতী ব্যাকুল গলা করে বলেছিলেন, 'জানলাটা তুই বন্ধ করবি বলেছিলি। আমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, ওটা তুই করবি না।'

ফ্যাকাশে হেসে গোবিন্দ বলে, 'মিছিমিছি ও গাছগুলোকে দেখে তুমি কষ্ট পাও এ আমি চাই না। রান্টু আজ বিকেলে তোমাকে দেখতে আসবে বলেছে।'

প্রভাবতী ভয়ার্ত গলায় বলেছিলেন, 'রান্টুকে এ বাড়িতে দেখলে পন্টু হয়তো যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসবে। কী দরকার ওর, এখানে আসার।'

গোবিন্দ উত্তর দেয়, 'তা তো জানি না। তবে রান্টু বলেছেন, এখন থেকে ও-ই নাকি এখানে থাকবে। পাড়ায় পন্টুর যা রেকর্ড তাতে হয়তো বেঘোরে ও কোনদিন মারা পড়বে। দিদির কানে কথাটা গেছে। ওই জামাইবাবুকে বলে রান্টুর থাকার ব্যবস্থা করেছে।'

বিকেলের দিকে ঝলমলে সুন্দব চেহারা নিয়ে হাসতে হাসতে রাণ্টু এসে প্রভাবতীর গা ঘেঁষে বসল। প্রভাবতী ওকে দেখে স্মিত হাসলেন।

রাণ্টু বলে, 'এখন থেকে আমিই এখানে থাকব দিদা। লোক দেখানো থাকা আর কী। আইন বাঁচানো যাকে বলে। এখন থেকে ও জমির স্বত্ব সব তোমার।'

প্রভাবতী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'এতে ভাল হবে না মন্দ হবে, কে জানে।'

গোবিন্দ উত্তর দিয়েছিল, 'যাই হোক, একটা কিছু যে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'জানলাটা বন্ধ করবি না তো?'

গোবিন্দ হেসে উত্তর দিয়েছিল, 'না, না, বন্ধ করবো কেন। যেমন আছে থাক না।'

কথাটা কানে যেতেই চোখ বুজে প্রভাবতী হাত দু'টোকে এক করে কপালে ঠেকালেন। মা-র এ ধরনেব আচরণ কেমন রহস্যময় ঠেকল গোবিন্দর কাছে।

কথাগুলো সহজে বিশ্বাস করতে পারলেন না প্রভাবতী। কপালে ভাঁজ ফেলে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইলেন রান্টুর দিকে।

রান্টু প্রভাবতীকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'দাদার কথায় কিছু মনে করো না দিদা। ওর ভবিষ্যৎ ভাল না। এখন থেকে ও গাছ তিনটের মালিক তুমিই।'

প্রভাবতী অপলকে দক্ষিণের জানলায় চোখ রেখে ধীরে ধীরে উঠে বসার চেষ্টা করেও পারলেন না। মুগ্ধ বিস্ময়ে গাছ তিনটেকে দেখছিলেন, না কি ওরই নিচে দাঁড়িয়ে থাকা সুখেন্দুবিকাশকে দেখতে পাচ্ছিলেন, কে জানে।

গোবিন্দ আর রান্টু লক্ষ করল, প্রভাবতীর ঠোঁঠ দুটো তির তির করে নড়ছে। দু'চোখের কোল বেয়ে ক্ষীণ জলের স্রোত নেমে আসছে।

ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে প্রভাবতীকে কোন কথা বলতে সাহস পেল না, তবে অফুরন্ত এক সুখের অনুভূতি ওদের কেমন যেন বিহুল করে তুলছিল সে সময়।

মুখোশ

আমার ছেলেটা আশ্চর্য রকম জেদি। যে জিনিসটা একবার ওর মাথায় ঢুকবে সেটা ওর তক্ষুণি চাই। নইলে বাড়ি মাথায় করে তোলে। আমাদেব মতন ঘরেব ছেলেদের জেদ থাকা ভাল নয়; এ ধারণাটা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে। কেননা, স্নেহের অতিশয্যে আজকে যে সব আমি ওর হাতে তুলে দিচ্ছি, তা যে চিরকাল পারবো এমন কোন কথা নেই। দুর্দিনের কথা চিন্তা করেই আমাদের চলতে হয়, প্রতি মুহূর্তেই হিসেব করে কাটাতে হয়। আমার বউ অজন্তাব কিন্তু এসব বিষয়ে একদম চিন্তাভাবনা নেই, স্রোতে গা ভাসিয়ে চলাতেই ও বেশি সুখ পায়। প্রথম প্রথম ছেলের জেদ, চাহিদা মেটানোর ব্যাপার নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখেছি, আমার কোন কথাই ওর ঠিক ঠিক কানে যায় না। আশ্চর্য! এমন গভীর ভাবে চেয়ে থাকে ও, যেন সব কিছু মনোযোগ দিযে শুনছে, আসলে কিন্তু সবটাই ফাঁকি! গত রবিবার আমরা তিনজন চিড়িয়াখানা গিয়েছিলাম। হাতির কাছে গিয়ে আমা'ব ছেলের অন্য সব আকর্ষণ হারিয়ে গেল। ওর ডাগর চোখে সে কি বিস্ময়, কী বলবো। বলেছিলাম, 'চলো আরও অনেক কিছু দেখার আছে, চলো'।

ছেলে বায়না করে, তাকে একটা হাতি কিনে দিতে হবে আজই।

শুনে অজন্তার কী হাসি! আমি অবাক! কোথায় একটু শাসন করবে, বুঝিয়ে দেবে তা নয়, ছেলের সোহাগে ডগমগ।

'বেশ, বেশ, হবে'খন' ছেলেকে থামিয়ে কোনরকমে চিড়িয়াখানা থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। ছেলের হাতির বায়নায় অস্থির হয়ে শেষে একদিন বেশ বড়সড় একটা খেলনা হাতি কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম অফিস ফেরতা নিউ মার্কেট থেকে— পুঁতি চুম্‌কি বসান ভেলভেটের হাতিটা সত্যিই কিন্তু খুব সুন্দর ছিল। দোকানে অনেক খেলনা, আমি অসম্ভব লোভী চোখে দোকানের সব কিছু দেখছিলাম। নিজেরই কেমন ইচ্ছে হচ্ছিল, এটা কিনি, ওটা কিনি। এ সব দোকানে এলে বোধ হয় সবাই তার বয়সের কথা ভুলে যায়। এই ভুলে যাওয়াটা বেশ সুখের। হাতিটা কিনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতেই আমার কেমন কষ্ট হচ্ছিল। কেননা, আমার নিজের ছেলেবেলার কথা খুব স্পষ্ট মনে পড়ছিল। সে বয়সে লোভ ছিল তীব্র কিন্তু না পাওয়ার বেদনা নিয়ে আমরা ক্রমশ বড় হয়ে উঠেছিলাম। সে বয়সে কী আমি কখনও মনে মনে বলেছিলাম, নিজে যা পেলাম না, তা যেন অন্য অনেকে পায়। আমার বাল্যকালের মত কারো এমন দুঃখে যেন না কাটে। যাক্ গে সে সব কথা।

বাড়িতে এসে জোরে জোরে ছেলের নাম ধরে ডাকলাম, 'সুনন্দ! সুনন্দ! এই দ্যাখো, দেখে যাও তোমার জন্য কী এনেছি

সুনন্দ ছুটে এসে কেমন থমকে যায়। খেলনা হাতি দেখে ও একটুও খুশী হয় না। একবার মাত্র হাতিটায় চোখ বুলিয়ে ওঘরে চলে যায়। আমি বোকার মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। অজন্তা আসে। বলে, 'তুমি ছেলেটার কোনো খোঁজই রাখ না। ওই রকম কত খেলনা ওর আছে জানো তুমি?'

মুহূর্তে আমার মাথায় যেন আগুন জ্বলে ওঠে। দুঃখ আর রাগের জ্বালায় খেলনা হাতিটাকে ছুঁড়ে ঘরের বাইরে ফেলে দি। অজন্তার দিকে তাকাই না। ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। খেতে গিয়েই দেখি, অজন্তা হি হি করে হাসছে। সার্কাসের ক্লাউনদের রাগতে দেখলে দর্শকরা যেমন হাসে, অজন্তার হাসিটাও ঠিক তেমনি। ওর এ ধরনের আচরণ, শুধু আজকেই নয়, বহুবারই দেখেছি। মনে মনে কতবারই না ভেবেছি, একদিন সুযোগ পেলে ওকে বুঝিয়ে দেব যা সয় তার বেশি না চাওয়াই ভাল। ভেবেছি, কিন্তু বলিনি। আমি আমার মনের সংকল্প মত কোনদিনই কিছু করতে পারি না।

এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়ে এক সময় ঠিক আবার বাড়ি আসি। দরজা খুলে দিয়ে অজন্তা কোনো কথা না বলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। আমি ওর মুখের দিকে না তাকিয়েও সব বুঝতে পারি। হঠাৎ আমার নজরে পড়ে সবে কেনা হাতিটার শরীরের বিভিন্ন অংশ এখানে-ওখানে ছেঁড়া-খোঁড়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে। কষ্ট হয় বুকে।

ছেলেকে জড়িয়ে শুয়ে আছে অজন্তা, নির্বিকার। মানুষ এত উদাসীন হয় কী করে ভেবে পাই না। উদাসীনতা না আমাকে উপেক্ষা করা! আড় চোখে দেখি। কোন উদ্বেগ অশান্তির চিহ্নও যেন নেই অজন্তার।

ডাইনিং টেবিলে খাবার ঢাকা ছিল। একা একাই খেতে হয়। খাওয়া শেষ করে নিঃশব্দে অজন্তার পাশে শুয়ে একটা সিগারেট ধরাই । ওর ঘুম খুব গাঢ়। বড় নিশ্চিন্ত আর সুখী বলেই কী অজন্তা এমন গভীর ভাবে ঘুমোতে পারে? ঘুম ভাঙিয়ে ওর সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে কেমন ইচ্ছে হয়। অ্যাসট্রের মাঝে সিগারেটটা গুঁজে দিয়ে অজন্তার হাতের ওপর নিজের হাতটাকে ছড়িয়ে দি। অজন্তা টের পেয়ে ঘুরে শোয়। বলি, 'শুনছো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'কাল শুনবো। এখন ঘুমোও।' অজন্তা ঘুম জড়ান গলাতেই বলে।

কোন কথা না বলে, উঠে গিয়ে জল খেয়ে ফের শুয়ে পড়ি। শুয়ে শুয়ে আমি কত কী ভাবি, ভাবনাগুলোকে ঠিকঠাক ধরতে পারি না, বুঝতে পারি না। কিছুতেই ঘুম আসে না। সারারাত এ-পাশ ও-পাশ করে ভোরের দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে জেগে দেখি, পাতলা একটা চাদর আমার গায়ের ওপর ছড়ানো।

আমাকে কিছু বলতে না দিয়েই অজন্তা বলে, 'রাতে তোমার খুব জ্বর এসেছিল।' অবাক হয়ে চেয়ে থাকি।

অজন্তা ঘর গুছোতে গুছোতে বলে, 'দিন দিন তুমিও ছেলেটার মত জেদি হচ্ছো, লোভী হচ্ছো।' ঠোঁটের কোণ হাসির মতন দেখায়, আবার বলে, 'তোম[illegible] জেদি না হয়ে পারে?'

'বেশ, কোথায় আমি তোমাকে বলবো ভাবছিলাম, তু[illegible] আমার ঘাড়ে দো[illegible] চাপিয়ে দিলে?' অজন্তা আমার গা ঘেঁষে বসল, 'এই জানো, তোমা[illegible] একটা কথা বলা হয়[illegible]' একটু
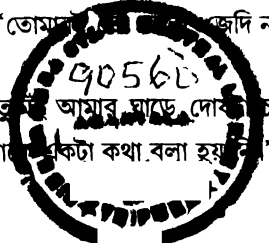
থেমে গলায় আবদারী সুর তুলল, 'বলো, রাগ করবে না?'

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক কিছুই খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। কিন্তু সে সাধ্য কী আমার আছে? বলি, 'সুনন্দ এখন স্কুলে, না?'

এ প্রশ্নের উত্তরে না গিয়ে অজন্তা বলে, 'জানো, আমাদের একটা ফোন হচ্ছে। এর মূলে তোমার ওই ছেলে। মামাদের কাছে আবদার করেছিল। তাই হয়ে গেল। কত সুবিধে বলতো? আর কী হিসেবি তোমার ছেলে?' একটু থেমে ফের মৃদু হেসে বলে, 'তোমারই তো ছেলে, হিসেবি না হয়ে পারে?'

'সে না হয় হলো। কিন্তু বছরে বছরে অনেকগুলো করে টাকা সেই আমাকেই দিতে হবে?'

'না মশাই। সে সবও আমি পাকা ব্যবস্থা করেছি। দাদারাই দিয়ে দেবে। কেন দেবে না? আমি তো একটা মাত্র বোন ওদের।'

কী বলবো। বড় অসহায় করে তোলে অজন্তা আমাকে। সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ বসে থেকে থেকে অজন্তার ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করি। ও কি একবার আমার মান-মর্যাদার কথা ভাবে না, শালাদের কাছে এমনভাবে আমি ছোট হয়ে যাচ্ছি সেটা বোঝে না কেন অজন্তা! অজন্তা খুশী গলায় বলে, 'জানতুম, তুমি এতে রাগ করবে না। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই এসে যাবে ফোন। দাদাদের কলমের জোরও যেমন, টাকার জোরও কম নয়। কী সুবিধে হলো বলো তো, মাঝেমাঝেই আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারবো— সারা দিন কী ভীষণ একা একা লাগে। একটু আধটু কথাটথা বললে যা হোক সময়টা কেটে যাবে।'

গতকালের কেনা হাতিটার তুলোর নাড়ি-ভুঁড়ি পড়ে আছে ঘরের এক কোণে; করুণ চোখে হাতিটার ছন্নছাড়া চেহারাটার দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলি। বলতে ইচ্ছে হয়, তুমি আর তোমার ছেলে বেশ আছো! কিন্তু মুখে বলি, 'তুমি তো রোজই সুনন্দকে স্কুলে দিয়ে আস, নিয়ে আস; আজ আমি তো অফিসে যাচ্ছি না, ওকে আমি আজ নিয়ে আসি।'

অজন্তা বলে, 'এখনো তোমার দাড়িটাড়ি কামানো হয় নি, এমন চেহারায় তুমি ওকে আনতে গেলে ও হয়তো ... ...। তার চেয়ে তুমি বরং রেষ্ট নাও, আমি যাই।'

অজন্তা ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কাপড়, ছোট জামা, ব্লাউস, পেটি কোট ছাড়লো। ওই শরীরটা আমার বড় চেনা। তবু মাঝে মাঝে কেমন যেন অপরিচয়ের রহস্যে ভরে যায় ওই শরীরটাই। ঝিম্ মেরে বসে থেকে ভাবি, আমার স্ত্রী আর ছেলের কাছে আমার কী মূল্য। আমার পরিচয়েই তো ওদের পরিচয়। তবে আমাকে আড়ালে রেখে ও সুখী হতে পারে কী করে?

শাড়ী জামা পালটে অজন্তা বলল, 'চা খাওয়ার ইচ্ছে হলে করে খেও, আমি আসছি।' বলেই ও ঘর থেকে চলে যায়।

সদর দরজা বন্ধ করে আসতে আসতে সত্যি সত্যি আমার চা খাবার ইচ্ছে হয়। কতদিন রান্নাঘরে ঢুকিনি। আজ অনেককাল পর ঢুকেই দেখি ঝকঝক করছে কাপ ডিস্, কফির কৌটো, স্টেনলেস স্টীলের বাসন। এ সব কবে হলো? কতকাল নিজের হাতে কাপডিস কিনি না, কফিও খাই না অনেকদিন, এবং এত টাকার স্টেনলেস স্টীলের বাসনই বা এলো কী করে! মুহূর্তেই

নিজেকে নিজের ঘরে পরবাসী বলে মনে হতে থাকে। এত কিছু করেছে অজন্তা? আমাকে এসব জানানোর প্রয়োজন মনে করে নি? সেন্ট্রাল রেটে ডি-এ পাওয়ার পর বেশ কিছু থোক টাকা পেয়েছিলাম। আমি তো নিজের কাছে কিছুই রাখি না। টাকাগুলো অজন্তার হাতে দিয়ে ব্যাঙ্কে তুলে রাখতে বলেছিলাম। ও কি ওই টাকা দিয়ে এসব করেছে? আর করলোই যদি, তা হ'লে আমাকে জানালে কী দোষ ছিল। স্টোভ জ্বেলে দু'কাপের মত জল বসালাম কেতলিতে। চা করতে করতে অজন্তা এসে গেলে, ওর সামনে এক পেয়ালা হাজির করে অবাক করে দেব। অকস্মাৎ আমার নজরে যায়, একটা রং-চং-এ খাতা টেবিলের ওপর পড়ে আছে। একগাদা রঙিন পেন্সিল ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ভাবি, অজন্তা একা, সবকিছু ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখতে পারে না। ধীর পায়ে টেবিলের কাছে এসে দেখি, খাতাটার পাতায় পাতায় কী সুন্দর সব ছবি। এক একটা ছবির নিচে, এক একটা নাম। 'ভো-কাট্টা' কাটা ঘুড়ি হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে উড়ে যাচ্ছে; লাল-নীল সবুজ কত রং-ই না ব্যবহার করেছে ঘুড়িটায় সুনন্দ। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ এক জায়গায় আমার চোখ আটকে যায়। কী সুন্দর হাতের লেখা সুনন্দর। সার্থক পিতারা ছেলের গর্বে যেমন গর্বিত হয়, এ মুহূর্তে আমারও তাই হলো। এক জায়গায় লিখেছে, শ্রীসুনন্দ কুমার মিত্র, কেয়ার অফ শ্রী নির্মল চন্দ্র মিত্র। তারপরই বাড়ির ঠিকানা। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে সুনন্দ। এত অল্প বয়সেই অজন্তা ছেলেকে কীভাবে নিজের নাম ঠিকানা ঠিক ঠিক ভাবে লিখতে হয় শিখিয়েছে। খুশী হই। আবার পরক্ষণেই ভাবি, এত সব আঁকতে পারে, লিখতে পারে সুনন্দ, আমাকে এসব দেখায় না কেন? আমাকে কী এড়িয়ে চলে? না ভয় পায়? এইসব সাত সতেরো ভাবনার মাঝে হঠাৎ মনে পড়ে স্টোভে জল বসিয়ে এসেছি। রান্নাঘরে ঢুকে কেতলির ঢাকা খুলে দেখি, জল শুকিয়ে গেছে। ফের দুকাপ জল কেতলিতে ঢেলে অপেক্ষা করি। মিনিট কয়েকের মধ্যেই জলের শোঁ শোঁ শব্দ কানে এলে ভাবি, আজ— চা নয়, কফি খাবো।

দু কাপ কফি করে অজন্তার জন্য অপেক্ষা করবো কী না ভাবি। অজন্তার কফি ডিসে ঢেকে ফের সুনন্দর পড়ার ঘরে এসে হাজির হই। যেন স্পষ্ট দেখতে পাই, সুনন্দ দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠছে। স্কুল-কলেজ ধাঁ ধাঁ করে টপকে যাচ্ছে। অজন্তার আর আমার সুখ মনের কানায় কানায়। কফি শেষ, একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবি, বতদিন ছেলেটাকে নিয়ে ছেলেমানুষী করিনি। দূরে পড়ে আছে ওর খেলার সরঞ্জাম। গতবছর রথের মেলায় একটা মুখোশ কিনেছিল সুনন্দ। প্রথম ক'দিন ও মুখোশটাকে নিয়ে মেতে থাকতো, এখন আর বোধহয় ছুঁয়েও দেখে না। মুখোশটাকে নিজের মুখে ভাল করে বেঁধে ওদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে সন্তর্পণে দরজা খুলে ভীষণ ঘাবড়ে দেব ভেবে 'হালুম' করে একটা শব্দ করি। সে শব্দে ওরা দুজনেই ফিরে তাকায়। অজন্তা গম্ভীর হয়ে ঘরে চলে যায়। সুনন্দ আমার পিঠে উঠে মুহূর্তে দৈত্যবধে লিপ্ত হয়ে যায়। বহুকাল এত হাসি হাসিনি। প্রায় পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। আমার মাথার চুল খুব শক্ত করে ধরে টানতে থাকে সুনন্দ। ভীষণ ব্যথা লাগলেও, ওকে আমি বারণ করতে পারি না। আমার ছেলে কখনো সুখ দেবে, কখনো ব্যথা দেবে এই তো নিয়ম। একটু আগে দেখা ওর আঁকা ছবিগুলো কী আমাকে সুখ দেয় নি?

অজন্তা রান্নাঘরে ঢুকে ঢাকা কফি দেখে হেসে বলে, 'কফি খেলে যে বড়'?

সুনন্দকে পিঠ থেকে নামিয়ে দিয়ে বলি, 'তোমরা দু'জন আমাকে লুকিয়ে সব কর নাকি? কেন বলোনি, সুনন্দ সুন্দর ছবি আঁকতে পারে? কেন বলোনি, এত বাসন-কোসন আর ঝক্‌ঝকে কাপ ডিসের কথা?'

অজন্তা কফি শেষ করে বলে, 'ঘরের মানুষ হয়ে তুমিই বা কেন চোখ বুঝে থাকবে?'

'কী বলছো তুমি? এসব ঘর সংসারের ব্যাপারে তুমিই তো আমাকে টেনে আনতে চাও না।'

মায়া কাড়া হাসি হাসে অজন্তা, বলে, 'বুঝলে মশাই, পুরুষরা সব সময় হেঁসেলের খবর নেবে কেন? তুমি তো সেই বেরোও, রাত আটটা ন'টার আগে ফেরোনা। আমাকেই তো সব দেখতে হয়। পাশের বাড়ির আয়া মাঝে মাঝেই আসে; কলেজের প্রিন্সিপাল গাঙ্গুলীবাবুর সঙ্গে সুনন্দর খুব ভাব। উনিও আসেন। পাড়া প্রতিবেশী অনেকেই আসে। তোমার সঙ্গে ভাল করে আলাপ পরিচয় হয় নি বলে সবাই দুঃখ করে। আবার তোমার প্রশংসাও করে তেমন। বলে, কাজ পাগল মানুষ বটে তুমি। ওদের জন্যই তো এসব করতে হয়েছে।'

মুহূর্তেই আমি কেমন শীতল হয়ে যাই। আমার সুখ, মান-মর্যাদা, এসবের প্রতি অজন্তার এত নজর, আর আমি কী না ওকে ভুল বুঝি! মনে মনে নিজেকে অপরাধী করে তুলি আমি। ঠিক এ সময় সুনন্দ হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে জিনিসপত্র ভাঙচুর করতে থাকে। অজন্তাকে দৌড়ে ও ঘরে যেতে দেখেও নিজে ছেলের আচরণে গুরুত্ব না দিয়ে চুপচাপ বসে থাকি।

অজন্তা রাগে কাঁপতে কাঁপতে এসে বলে, 'তুমি ওঘরে গিয়েছিলে? ওর সব জিনিস পত্তর তুমি নাড়াচাড়া করেছো?'

ধীর গলায় বলি, 'হ্যাঁ, করেছি। কী সুন্দর আঁকে সুনন্দ, অথচ, তুমি একদিনও ওর আঁকা আমাকে দেখাও নি; আমার মনে হয়, আমাকে তোমরা অনেক দূরে সরিয়ে দিচ্ছো। কেন যে এ কথা মনে হয় জানি না।'

আমার কথা শুনে হেসে ফেলে অজন্তা, বলে, 'ছেলেটা জেদি হয়েছে তোমার জন্যেই।'

'কী বললে?' ভীষণ রেগে গিয়ে ওঘরে ঢুকে ঠাসঠাস করে সুনন্দকে চড় মারতে থাকি আমি।

সুনন্দ, মাত্র ছ'বছর বয়স যার, সে না কেঁদে আমাকে হিংস্র ভাবে আক্রমণ করতে থাকে।। একটা গ্লাস ছুঁড়ে আমাকে লক্ষ করে মারে। ঝন্ ঝন্ করে গ্লাস ভেঙে পড়ে মেঝেতে। এবং সে মুহূর্তে আমি আর কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারি না। একটা স্কেল হাতে নিয়ে প্রায় পাগলের মত ওকে মারতে থাকি আমি। মারের চোটে নীল হয়ে যায় ও। অজন্তা ছুটে এসে আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে বলে, 'খ্যাপা কুকুরের মত এ কি করছো তুমি?' কথা ক'টি কানে যেতেই কেন্নোর মত গুটিয়ে যাই আমি। আমাদের দাম্পত্য জীবনে এই প্রথম অজন্তার মুখ দিয়ে অমন ভাষা শুনতে পেয়ে সরে আসি। ছেলেকে আদর করতে করতে কাঁদছিল সে সময় অজন্তা।

আমার হাত-পা কাঁপছিল। একটু আগের দেখা সুখ-স্বপ্ন হঠাৎ একটা ঝড়ো হাওয়ায় চুরমার হয়ে যেতে থাকল। নিজের এই ক্ষিপ্ত ব্যবহারের জন্য যেমন দুঃখে ছেয়ে যাচ্ছিল মন, ঠিক তেমনি সুনন্দর ভবিষ্যৎ চিন্তায় বড় বেশি অসহায় হয়ে পড়ি আমি। অজন্তা কেন যে বুঝতে পারছে না,

সুনন্দ ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠছে, স্বার্থপর হচ্ছে; এই ছেলের কাছ থেকেই ও একদিন এমন আঘাত পাবে যে, সেদিন আর কিছুই করার থাকবে না।

এই প্রথম সুনন্দ আমার কাছে মার খেলো। ও কোন আঘাত পাক এ আমি কোনদিনই চাই না। কেননা, বার বার মনে হয়েছে, ওর মত বয়সে নিজে যা পাই নি, সে রকম কোন অভাবই আমি রাখব না। মনে পড়ে আমার বাবা খুব কষ্টে আমাদের মানুষ করেছিলেন। প্রাইমারী স্কুলের একজন শিক্ষকের ছেলেরা কতটুকু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পেতে পারে? তবুও ওই স্বল্প আয়ের মধ্যেই বাবা কোন কোন দিন আমাদের তিন ভাই-বোনের জন্য চিনেবাদাম কিংবা লজেন্স কিনে আনতেন। সে সব দিনগুলো আমাদের বাড়িতে সুখ উপচে পড়ত। কিন্তু বাবার ওই সযত্নে লালিত সংসারটা বাবার বর্তমানেই কেমন শ্রীহীন হয়ে গেল। দাদা বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেল। দিদির বিয়েতে বাবার মাথার চুল গেল বিকিয়ে। আর আমি, শেষ পর্যন্ত অনেক লড়াই করেও বাবা-মাকে নিয়ে থাকতে পারলাম না। আমাদের বিরাট একটা হা-করা সংসারে যোগ্যতার জোরে ভাল একটা চাকরি জোগাড় করে ফেললাম। এবং সেই চাকরির সুবাদেই অজন্তার মত মেয়েকে আমি বউ করে পেলাম। অমন জাঁকালো পরিবারের মেয়েরা কখনও কী স্কুল মাস্টারের বাড়িতে বউ হয়ে আসে? অজন্তা, প্রায়ই আমাকে এসব শোনাত, এখনও শোনায়। কিন্তু এতে আমার লজ্জার কিছু নেই। কেমন এক গর্বই প্রকাশ হয়ে পড়ে। এসব কথা মনে পড়তেই মনটা বড় বেশি নরম হয়ে যায়। উঁকি মেরে দেখি, ছেলেটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ হয় তো ওর আর খাওয়াই হবে না । কেমন একটা চাপা ব্যথা ঠিক এই সময় আমি অনুভব করি। অপরাধীর ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকে অজন্তার পাশে বসে বলি, 'আমাকে ভুল বুঝো না। এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার কোনদিনই আমি করতে চাই নি। কিন্তু কী করবো, দিন দিন সুনন্দর জেদ সীমা ছাড়া হয়ে যাচ্ছে।'

অজন্তা আমার মনের ছবিটা ভাল করে পড়তে পারে না বোধ হয়। প্রথমটায় কেমন শূন্য চোখে আমাকে দেখে নিয়ে অন্যমনস্ক হবার ভান করে। আমি ওকে কাছে টেনে নি। ও কোনই বাধা দেয় না; সমস্ত শরীরের ভারটা আমার উপরে ছেড়ে দিয়ে বলে, 'আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। আসলে কী জানো, তুমি যদি তোমার ছেলেবেলার কথা আমাকে না বলতে তাহলে হয় তো, এ সব কিছুই হতো না। আমি চাই না, সুনন্দ মনের দিক থেকে কখনও গরীব হোক।'

অসম্ভব সুন্দর আর পবিত্র দেখাচ্ছিল এ সময় অজন্তাকে। কী বলবো। কী বলা উচিত কিছুই আমি ঠিক ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছিলাম না। মাসের শেষ, তবুও হঠাৎ মুখ ফস্কে বলে ফেলাম, 'আজ বিকেলে আমরা গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে যাবো। চাই কি, নৌকো করে একটু মাঝগঙ্গাতেও ঘুরে আসতে পারি।'

অজন্তা বলে, 'নৌকোয় আমার বড় ভয়। কোন বিপদ-আপদ ঘটলে তুমি একা কী পারবে আমাদের টেনে তুলতে?'

'কেন পারবো না। আমাকেই তো সবকিছু টেনে তুলতে হবে', কী ভেবে এই ভাবে উত্তর দি আমি। বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর সুনন্দর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আমার চোখে হঠাৎ-ই জল এসে যায়। অজন্তা টেরও পায় না। অনেক কষ্টে নিজেকে লুকিয়ে ফেলি আমি।

পরিবেশটা ক্রমশই হালকা হয়ে আসতে থাকে। একটু হালকা মেজাজে বলি, 'মহারাণী কী আজ আমাদের শুকিয়ে রাখবেন?'

অজন্তা যেন চেতনায় ফিরে আসে। বলে, 'ছিঃ ছিঃ। কী কাণ্ড বলো তো? এত বেলা হলো, ছেলেটাকে আর তোমাকে না খাইয়ে রেখেছি।' ত্রস্ত পায়ে অজন্তা উঠে রান্নাঘরে চলে যায়। সুনন্দ কেমন করে যেন টের পায় আমি ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। ভীষণ অভিমান আমার ছেলের। হবেই না বা কেন? আমার ছেলে তো! ওর নরম তুলতুলে গালে চুমু দিয়ে অস্ফুটে বলি, 'বাবু! আজ আমরা কোথায় যাবো জানো?'

অমনি হি হি করে হেসে ফেলল সুনন্দ। ঝাঁকড়া চুল, ডাগর চোখ নিয়ে বলল, 'জানি, গঙ্গায়। নৌকোয় বেড়াবো।'

আমি ভীষণ চমকে যাই ওর কথায়। সে কি? আমরা ভেবেছি, ও ঘুমিয়ে কাদা হয়েছে; এখন দেখছি, ও সব টের পেয়েছে। ওকে নিয়ে যে সব আলোচনা হয়েছে, তাও শুনে ফেলেছে। যাই হোক, নিজেকে যথাসম্ভব ঠিক রেখে বলি, 'নৌকোয় তোমার ভয় করবে না তো?'

'না; মা-মনি, তুমি থাকতে ভয় কী।' কী করে যে বয়স্ক মানুষের মত উত্তর দেয় সুনন্দ বুঝি না। মনে মনে ভাবি, ওকে একবার বাজিয়ে দেখি না? ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করি, 'নৌকো দেখে নৌকো কিনতে চাইবে না তো?'

কেমন অবাক চোখে আমাকে দেখে চুপ করে যায় ও। ভাবি, শিশুতো, বাস্তব বোধ বুদ্ধি ওর কতটুকুন। একদিন ওর মত বয়সে, আমারও তো অমনি সব আকাঙক্ষা ছিল, চাহিদা ছিল। হয়তো সে সব দিনগুলোতে আমরা বুঝে গিয়েছিলাম, বাবার ক্ষমতা নেই; তাই সাধ-আহ্লাদ সব এক কোণে সরিয়ে রেখেছি। আর সুনন্দ? ও জানে, আমার অনেক আছে। আর আছে ওর পেছনে বড়লোক মামারা! এই ধারণা ওর নিজের, না মা-ঘেঁষা ছেলেটা মা-কে দেখে দেখে এই সব বুঝে ফেলেছে! যদি তাই হয়। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে আমার। মুহূর্তেই কেমন একটা জটিল জালে জড়িয়ে পড়ি আমি। রান্নাঘর থেকে আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে তাড়াতাড়ি স্নান করে খেয়ে নিতে বলল অজন্তা।

সুনন্দকে বললাম, 'এসো আজ দুজনে ভাল করে তেল মেখে স্নান করবো।'

সুনন্দ ঠোঁট উল্টে বলল, 'গরমকালে মা বলেছে তেল মাখলে গা চটচট করে।'

খুশীর হাউইটা ওর কথায় দপ্ করে নিভে যায়। বুঝতে বাকী থাকে না, সুনন্দ আমার ছেলে হলে কী হবে, ক্রমশ ও আমার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ওকে জোর করে নাগালের মধ্যে আনতে গেলে বিপদই বাড়বে।

সুনন্দ একটানে জামা খুলে বাথরুমে চলে গেল সাবানের বাক্স হাতে নিয়ে। দরজা বন্ধ করার শব্দ হলো। শাওয়ারে জল ঝরার শব্দ কানে আসে। এই বয়সে কী ব্যক্তিত্ব আমার ছেলের! অসম্ভব সুখ আর ভাল লাগার স্রোতে ভেসে যাচ্ছিলাম সে সময় আমি।

'বাপি, কাম্, কাম্, বাপি,' বাথরুম থেকে জোরে ডেকে উঠল ও আমাকে।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'তোমার হয়েছে?'

বাথরুমের দরজাটা খুলে বলল, 'লুক, লুক, বাপি!

ওর হাতে অজন্তার আংটি। দেখেই কেমন থমকে যাই।

সুনন্দ বলল, 'মা-কে ব'লো না!'

প্রায়ই অজন্তার এ ধরনের ভুল হয়। এই তো সেদিন কানের দুল ফেলে রেখে কী কাণ্ডই না বাধিয়েছিল। সারাদিনের মত ওর মনেই ছিল না, বাপের বাড়ি থেকে ফেরার পথে হঠাৎ কানে হাত পড়তেই একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল ও। প্রায় পাগলের মত বাড়িতে ঢুকে এখানে ওখানে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও যখন পায় নি, তখন কী কান্না অজন্তার। রাতে বাথরুমে মুখ হাত ধুতে গিয়ে আমিই পেয়ে গিয়েছিলাম দুল জোড়া। বলেছিলাম, 'এই নাও ভুলোরাণী, তোমার দুল।'

দুল জোড়া হাতে পেয়েই অজন্তা বলেছিল, 'জানতাম, ওটা আমি পাবই!'

সুনন্দ তার মা-কে চমকে দেবে; ওদের এই সম্পর্কের চেহারাটা দেখার জন্য ভীষণ কৌতুহল বোধ করি। মনে মনে বলি, 'এই তো চাই।' কিন্তু মুখে বলি, 'ফের সেদিনের মত তোমার মা অস্থির হয়ে পড়বে, তার চেয়ে দিয়ে দেওয়াই ভাল।'

সুনন্দর আমার কথা ঠিক মনঃপুত হয় না। গম্ভীর হয়ে গিয়ে আমার দিকে চেয়ে থেকে বলে, 'ধ্যেৎ'। ওর ওই সামান্য কথার মধ্যে কী আমাকে অস্বীকার করার, তাচ্ছিল্য করার মত কিছু রয়েছে। ধীর পায়ে সরে আসতে আসতে বলি, 'বেলা অনেক হলো, তাড়াতাড়ি করো, ভীষণ খিদে পেয়েছে'। ওর শরীর থেকে জল ঝরে পড়ছিল। চোখ দুটো ঈষৎ লালচে রং হয়েছে— বুঝি, শ'ওয়ারের দিকে মুখ করে স্নান করছিল ও এতক্ষণ।

'এসো, এসো না। আমরা দুজনে এক সঙ্গে স্নান করি।' সুনন্দ ওর মা-র আংটিটা আমার হাতে দিতে দিতে বলল কথাগুলো। এই মুহূর্তে ফের আমি আমার শৈশবে চলে গেলাম। ছুটি ছাটার দিনে বাবাও আমাদের সঙ্গে ছেলেমানুষ হয়ে যেতেন। ঘণ্টাখানেক আমরা সকলে নদীতে সাঁতার কাটতাম, ডুবতাম। সে সব সময় বাবা ভীষণ কাছের মানুষ হয়ে যেতেন। কিন্তু এখন আমি তো ঠিক আমার ছেলের সঙ্গে বাবার মত ছেলেমানুষ হতে পারছি না! কতই তো চেষ্টা করি। সময় কী না কে জানে, আমরা ক্রমশই দূরে দূরে সরে যাচ্ছি— নিজের আত্মজের সঙ্গেও সহজতর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি না।

স্নান সেরে দুজনেই আমরা খেতে বসি। অজন্তা স্বল্প সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকটা পদ রান্না করেছে। আগুনের তাপে ওর মুখটা এখন টকটকে লাল। এসব সময় অজন্তার জন্য মনটা ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে। অথচ, রাধুনি রাখার কথা বললেই বলে, 'ওসব বাপের বাড়িতেও ছিল না; নিজের ঘরেও ঢোকাতে চাই না। নিজের সংসারে এ আর কী কষ্ট। একটা যদি ফ্রিজ কিনে দিতে পারতে, তাহলে, এসব কষ্ট কষ্টই না।' অজন্তা প্রায়ই বলে কথাটা।

সুনন্দ ভাতের থালায় এটা ওটা ঘাটল। অফিস যাবো না বলে, ভাল মাছ এনেছিলাম। ও মাছ একটু আধটু খুটে খুটে খেল। পাতের ভাত সবই প্রায় পড়ে রইল। নেহাতই বসতে হয়, তাই বসা।

সুনন্দ একবার আমার পাতের দিকে চেয়ে বলল, 'বাপি, তুমি খুব পেটুক। এত ভাত মাছ তরকারী কী করে খাও। মা, বাপির সঙ্গে আমাকে আর কখনও খেতে দিও না।' বলেই উঠে গেল

সুনন্দ। করুণ চোখে ওর পাতের দিকে চেয়ে থাকি আমি। বুঝি না, এত কম খেয়ে ওর পেট ভরে কী করে? বুকের ভেতরটা টনটন করতে থাকে। হঠাৎ যেন কষ্টের দিনগুলো স্পষ্ট রূপ ধরে আমার চোখের সামনে হাজির হয়। বাবা বলতেন, 'একটা ভাতও ফেলো না। বড় দুর্দিন।' বাবা হয়তো বলতে চাইতেন, পৃথিবীতে বড় দুঃসময় আসছে। আমরা কেউই সে কথা অমান্য করতে পারতাম না। পরম যত্নে থালার ভাত চেটে পুটে খেয়ে উঠতাম। বড় তৃপ্তি নিয়ে খেতাম আমরা। সুনন্দরা কেন কোন কিছুতেই তৃপ্তি পায় না?

অজন্তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলি, 'দেখলে তো ছেলেটা কিছুই খেলো না। এত কম খেলে কী করে শরীর বাড়বে?'

অজন্তা আমার কথার কোন গুরুত্বই দিল না। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে ছেলের পাতের ভাত এক জায়গায় জড়ো করে বলল, 'নিজের ইচ্ছেয় যতটুকুন খায় খাক। ঘণ্টা খানেক পর, ফলের রস আর দুধতো খাবেই।'

মনে মনে বলি, 'অজন্তা তুমি খুব ভুল করছো। জীবনটা তো পদ্মপাতার ওপর জলের মতো। ছেলেকে একটু একটু করে কষ্টের আর দুঃখের যে একটা দিক আছে, চিনিও। নইলে কিন্তু একদিন ভীষণ ফ্যাসাদে পড়ে যাবে আমাদের সুনন্দ।' কিন্তু মুখে বলি, 'ওই মাছগুলো তুমি ফেলে দিও না, আমার পাতে দিয়ে দাও। তুমি জানো না অজন্তা, ওই এক টুকরো মাছের জন্য আমরা কী লোভীই না ছিলাম।'

'বাজে ব'কো না। যখনই কোন কথা ওঠে শুধু অতীত ঘাঁটো। কী পাও ওতে তুমি?' অজন্তা রুক্ষ স্বরে বলে কথাগুলো।

কিছুই বলি না আমি। চুপ করে অজন্তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে থেকে হঠাৎ কেন যেন মনে হয়, টুপ করে হয়তো একদিন খসে যাবো। ভীষণ ভয়ে হাত পা হিম হয়ে আসতে থাকে। পাতের ভাত শেষ করে নিঃশব্দে উঠে যেতেই দেখি; সুনন্দ অরণ্যদেবের কীর্তিকলাপে ডুবে গেছে। মুখ ধুয়ে এসে হাসতে হাসতে আংটিটা বের করে দিয়ে বলি, 'স্নান করতে গিয়ে সুনন্দ এটা পেয়ে তোমাকে চমকে দেবে ভেবেছিল। ছেলেমানুষ, ভুলে গেছে। এই নাও।'

'কী যে ভুলো মন হয়েছে না আমার'— বলতে বলতে হঠাৎ কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে যায় অজন্তা। ফ্যাসফেসে গলায় বলে, 'গতকাল তোমার বড়দা এসেছিলেন।'

'কে? বড়দা? কখন?' একসঙ্গে প্রশ্নগুলো করে বসি আমি।

'তুমি অফিস বেরিয়ে যাওয়ার একটু পর।' অজন্তা বলল।

'কেন? কিছু বলেছেন?' আমি শুধোই।

'রাণুর বিয়ের সব ঠিকঠাক। কিন্তু টাকার জোগাড় করে উঠতে পারেন নি। তোমারও হাত খালি এ-ও আমি জানিয়ে দিয়েছি।'

হঠাৎ বিয়ের কথা কানে যায় সুনন্দর। আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'দিদির বিয়েতে আমি যাবো।'

অজন্তা ধমকে বলে উঠল, 'যা করছো করো, আমাদের কথায় তোমার কান দিতে হবে না।'

অমনি সুনন্দ সোজা এক লাফে চেয়ার ছেড়ে আমাদের কাছে এসে বলল, 'যাবই তো, এক্ষুণি যাবো।'

ওর এ সময়কার তেজী ভঙ্গিটা আমার এই প্রথম বলা চলে ভাল লাগে। মনে মনে বলি, 'শাবাস, শাবাস।' কিন্তু মুখে বলি, 'হ্যাঁ হ্যাঁ যাবেই তো; তোমার দিদির বিয়ে তুমি যাবে না কেন? যাও বই দেখো গে এখন।'

সুনন্দ বাধ্য ছেলের মত চলে যায়। সে সময় অজন্তা আমাকে খুব কঠিন চোখে দেখছিল। সক্রোধে বলতে থাকে, 'ওই নীচ স্বার্থপর লোকটার বাড়িতে আমি আমার ছেলেকে কিছুতেই পাঠাবো না। মনে নেই, সামান্য ক'টা টাকার জন্য তোমাকে কী অপমানই না করেছিল।'

গলায় মেঘ ডেকে উঠল না কেন এসময় আমার? কেন আমি দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলতে পারছি না, 'তাতে তোমার কী' আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ের সম্পর্কের মধ্যে তুমি নাক গলাবার কে?' কিন্তু আমি চুপ করে যাই। কেননা, অজন্তার এই মনোভাবের পেছনে আমার ভূমিকা কম নয়। বিয়ের প্রথমে আবেগের স্রোতে ভাসতে ভাসতে নিজেকে বড় করতে গিয়ে মিথ্যে গল্প বানিয়ে দাদাকে ছোট করেছি। আজ আর আমার কিছুই করার নেই। মিথ্যের খোলসটাকে কী এখন খুলে ফেলা যায়? যায় না। কেননা, চিরকালের জন্য তাহলে আমি অজন্তার কাছে ছোট হয়ে যাবো। সুতরাং এই মুহূর্তে আমি মনে মনে ঠিক করে নিলাম, ভাল মানুষের মুখোশটাকে যতদিন বাঁচবো, খুব সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করে যাবো। ওই মুখোশটাই হবে আমার আত্মরক্ষার সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এখন থেকে সারাজীবন আমাকে এই নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে– যাতে কবে অজন্তা বা সুনন্দ টেরও না পায় যে আমি কী! অজন্তার অজান্তে রাণুর বিয়ের টাকাও সংগ্রহ করে দাদার হাতে তুলে দেবো গোপনে।

যামিনীবাবুর কিছু কথা

আর দু'তিনদিন ধরে একমনে পেন্ডিং কাজগুলো সেরে ফেললেন যামিনীবাবু, যামিনী সোম। অর্থ দপ্তরের সিনিয়র অ্যাসিস্টেন্ট। একত্রিশ মার্চের মধ্যেই সব কাজ সেরে ফেলতে হবে। আগামী জুন মাসেই তাঁর রিটায়ারমেন্ট। দীর্ঘ তেত্রিশ বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন তিনি। চাকরিতে ঢোকার বছর তিনেকের মধ্যেই বিয়ে করেছেন। দু-বছর যেতে না যেতেই বড় ছেলে কল্যাণ এল, এর-ও দু-বছর পর মেয়ে কল্যাণী। কল্যাণের বয়স এখন আটাশ, কল্যাণীর ছাব্বিশ। বুড়িয়ে যাচ্ছে ওরাও। বউ স্নেহলতা ওর থেকে তিন বছরের ছোট অর্থাৎ পঞ্চান্ন বছরের একজন মহিলা। জরুরী ফাইল চাপা দিয়ে বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন যামিনীবাবু। বাইশ বছরের সেই হরিণ চপল মেয়েটাই কিনা আজ পঞ্চান্নর মহিলা। সেদিনের স্নেহলতার চেহারা, কথাবার্তা, মান-অভিমান ঝাঁক বেঁধে ওঁর চোখের সামনে হাজির হতে লাগল। ছেলেমেয়ের হামাগুড়ি, অস্ফুট কথাবার্তা, ওদের প্রথম টাল-মাটাল হাঁটা-চলা স্পষ্ট হয়ে উঠলে যামিনীবাবুর ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটে উঠল। অভাবিত সুখের স্রোতে ভাসতে ভাসতে হঠাৎই মনটা কেমন হয়ে গেল।

তিন দশক ধরে কত অফিসার এ অফিসে এল গেল। যামিনীবাবুর সঙ্গে কারও কোনদিন মতান্তর হয়নি। ছুটিছাটার দিনগুলো ছাড়া এবং নিজের বা বাড়িব কাবো অসুখ-বিসুখ ছাড়া অফিস কামাই করতে মন চায়নি তাঁর। স্নেহলতাও কোনদিন কোন আপত্তি করেননি। মুখ বুজে সংসাব চালিযেছেন। ছেলে-মেয়েব লেখাপড়া, সুখ সুবিধের দিকে নজর দিয়ে... । ওবা যখন পাস কবে বেরুল, কল্যাণ নিজের চেষ্টাতেই দুর্গাপুরে চাকরি নিয়ে চলে গেল এবং বছর দেড়েকের মাথায় ওর-ও বিয়ে হয়ে গেল। মেয়ের বিয়ের জন্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের বলে রেখেছিলেন। রিষড়ার বড় একটা কোম্পানীর এঞ্জিনিয়ার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল কল্যাণীর। জামাই অনিন্দ্য বিয়ের ক'মাসের মধ্যেই ট্রেনিং-এ গেল বিলেতে; ফিরে এল বছর তিন বাদে। কল্যাণীকেও সঙ্গে নিয়েছিল। সুতরাং বর্ষাকালীন নদীর মত সুখ যামিনীবাবুর মনে কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল।

কলমটা পকেটে গুঁজতে গুঁজতে মনে মনে ঠিক করে নিলেন পুবো তিন মাসের ছুটি পাওনা। এই ক'টা মাস উইথ পে ছুটি পাবেন। ছুটির শেষে অখণ্ড অবসরের জীবন। ভাবলেন, স্নেহলতাকে নিয়ে বাইরে কোথাও ঘুরে অসবেন— মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী কিংবা হরিদ্বার। আগেভাগে কিছুই জানাবেন না স্নেহলতাকে, সব কিছু পাকাপাকি করে ভীষণ চমকে দেবেন ওঁকে। ভাবনাটা যামিনীবাবুকে খুশীর স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ছেলেমেয়েও এখন বাচ্চার বাপ-মা হয়ে গেছে।

তার মানে, নিজেরা এখন আর শুধু স্বামী-স্ত্রীই নন, বাবা-মা নন; ঠাকুর্দা-দাদু, ঠাকুমা-দিদিমা হয়ে গিয়েছেন। সব ক'টি ফুল-ফল নিয়ে বেঁচে আছেন, আর থাকবেনও অনেকদিন। যামিনীবাবু নাতি-নাতনির নাম রেখেছেন বিবেকানন্দ আর দময়ন্তী। মনে মনে সেসব চিন্তা করে আনন্দ আর সুখে বিভোর হয়ে গেলেন তিনি। টেবিলে ঢাকা জলের গ্লাস থেকে জল খেয়ে নিয়ে ভাবলেন, অনেক হল, আর নয়। পাওনা ছুটির দরখাস্ত আজই করে বাকি দিনগুলো যা যা করা হয়নি, তাই করবেন।

পাশের চেয়ারে বসতেন বিলাস লাহিড়ী। তিন মাস ধরে খালি পড়ে আছে চেয়ারটা। প্রায় একই সময় ওঁরা এ অফিসে ঢুকেছিলো। বিলাস সব কিছু ছেড়েছুড়ে চলে গেল। কেন যে গেল কে জানে। বড় প্রাণোচ্ছল মানুষ ছিল বিলাস। বিশ্বাসই করতে ইচ্ছে হয় না, বিলাস নেই। ওর জন্য কেমন দুর্বল হয়ে গেলেন যামিনীবাবু।

বিলাস নিজের নামকে সার্থক করতে কসুর করেনি। ওর মন বসতো না অফিসের কাজে। ফাইল-পত্তর ডাঁই করে রেখে পদ্য লিখত। প্রেমের কবিতা! কিছুই বুঝতেন না যামিনীবাবু। অবাক চোখে ওকে দেখে বলতেন, 'ব্রিলিয়ান্ট লিখেছ হে। পাঠিয়ে দাও পত্রিকা অফিসে।' কেন ভাল লেগেছে, তা জানতে চাইত না বিলাস। যত্ন করে খামে ভরে সেসব পত্রিকা অফিসে পাঠিয়ে দিত। ছাপা হয়নি একটাও।

এর জন্য দুঃখ বা ক্ষোভ কখনও করেনি বিলাস। হেসে হেসে বলত, 'আমার মনের কথা জানিয়েছি; ছাপা হল কী না হল, তাতে আমার কী যায় আসে।'

এছাড়াও রেসের মাঠে যেত বিলাস। যে ঘোড়াটার কোন কদর নেই, তাতেই টাকা লাগাত ও। হেরে যেত। বিলাস বলত, 'চমৎকার দৌড়েছিল কিন্তু ঘোড়াটা। আসলে কী জান যামিনী, ঘোড়াটার সবই ছিল, ছিল না শুধু ফিনিসিং। এই ঠিক আমার মত। সবই করি কিন্তু ফিনিসিং-এর জন্য তোমার বা হরিপ্রসাদের কাছে যাই।' কথা শেষ করে একটানা হাসত বিলাস। ভাবলেন যামিনীবাবু; অনেককাল বিলাসের বাড়ি যাওয়া হয়নি। আজ দেখা করি না কেন?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই ওঁর সামনের টেবিলের মিস কনক অধিকারী বলল, 'কী ভাবছেন এতক্ষণ?'

চমকে গেলেন যামিনীবাবু। ভাবলেন, কনক এসব টের পেল কী করে? বছর তিনেক হল কনক চাকরি করছে এখানে। বড় নিরীহ, ধীর-স্থির।

দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে উত্তর দিলেন যামিনীবাবু, 'মনে হয়, কাউকে কিছু একটা বলার আছে। কিন্তু ঠিক কী যে বলবো, তা-ই বুঝে উঠতে পারছি না।'

ধীর গলায় উত্তর দেয় কনক, 'মনের কথা গুছিয়ে একটা কাগজে লিখে ফেলুন। দেখবেন এ গণ্ডগোল আর থাকছে না।'

'তুমি তাই করো বুঝি?'

কনক হেসে বলল, 'মানুষ যা চায় তার সব কিছুই কী সে পায়? আমার অনেক কিছুই চাওয়ার আছে, কিন্তু পাই না। এই দেখুন না—একটু থেমে নিঃসঙ্কোচে বলতে থাকে, 'পাকাপোক্তভাবে দাঁড়াবার ইচ্ছে ছিল; কিন্তু হল না। আমারও অনেক কথা বলার আছে। কাকে বলব বলুন? কে শুনবে?'

যামিনীবাবু ইতস্তত এদিক-ওদিক চেয়ে বলেন, 'দেরী করো না। চটপট কাউকে খুঁজে বের করো।'

কথা না বাড়িয়ে একটা সাদা কাগজে দরখাস্তটা লিখে ফেললেন যামিনীবাবু। কনকের দিকে না তাকিয়ে—একেবারে সোজা ডেপুটি সেক্রেটারির ঘরে ঢুকে যান উনি। দরখাস্তটা ওঁর সামনে রেখে দাঁড়িয়ে থাকেন। ডেপুটি সেক্রেটারী ওঁকে ইশারায় বসতে বলেন, চিঠিটায় চোখ বুলোন। বলেন, 'আজই আমি রেফার করে পাঠাচ্ছি। যতদিন উত্তর না আসে ততদিন অন্ততপক্ষে জরুরী ফাইলগুলো ঠিক করে যান।'

যামিনীবাবু ঠিক এ ধরনের উত্তর আশা করেননি। ভেবেছিলেন, ডেপুটি সেক্রেটারী নানান রকমের প্রশ্ন করে ওঁকে একটু সাধবেন। কিন্তু দুঃখের বা সুখের ছিঁটেফোটাও মানুষটার মুখে-চোখে দেখতে না পেয়ে কেমন ধাঁধায় পড়ে যান। ভাবেন, আশ্চর্য! এই মানুষ। একসঙ্গে এই মানুষটার সঙ্গেই তো পাঁচ-পাঁচটা বছর কাজ করলাম। তাহলে কী এই পাঁচবছরে লোকটার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি?

ঠিক সে সময় ডেপুটি সেক্রেটারীর বেয়ারা গোবিন্দ এসে বলল, 'সাহেব ডাকছেন'। যামিনীবাবুকে ডেপুটি সেক্রেটারী বললেন,'বসুন। আসলে কী জানেন, আমি তো কিছুতেই ভেবে পাই না, মানুষ এতগুলো বছর চাকরি করে কী করে? আপনার অ্যাপ্লিকেশান পেয়ে তাই একটুও অবাক হইনি। মানুষ ক'দিনই বা বাঁচে? ষাট, সত্তর আশি—এর মধ্যে যদি তিরিশ পয়ত্রিশ বছর অফিসেই কেটে যায় তো জীবনের থাকলোটা কী? এ প্রশ্ন আমার প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক মুহূর্তে মনে পড়ে। বলি না। শোনার লোক কই? আবার সব ছেড়েছুড়ে বসবো যে, এমন বুকের জোরও তো নেই। এই বাড়ি গিয়ে দেখব, বউ চোখ উল্টে পড়ে আছে, নয়তো হাঁপাচ্ছে। ছেলে অফিস থেকে তার বউকে ফোন করে সিনেমায, নয়তো বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি গেছে। মেয়েটা কার সঙ্গে কোথায কোথায় যে ঘুরে বেড়ায় কে জানে? বাড়িতে গিয়ে করবোটা কী বলুন? এই যে সারা জীবন অনেস্টি নিয়ে কাজ করে গেলেন, ছেলে-ছোকরারা শুনলে কী বলবে জানেন?....সেসব কথা না শোনাই ভাল।' বলেই বেল বাজান ডেপুটি সেক্রেটারী। গোবিন্দ আসতেই দু'কাপ চায়ের কথা বলে ফের বলেন, 'ছুটি নিয়ে কী করবেন? বিশ্বাস করুন, ছুটির দিনগুলো আমার ভীষণ খারাপ লাগে। বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন এলে খুশী হওয়ার কথা। কিন্তু আমি বিরক্ত হই, সারা শরীর জ্বলে।'

গোবিন্দ চা দিয়ে গেলে দু'জনই চুপচাপ চায়ে চুমুক দিলেন। চা শেষ করে যামিনীবাবু বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, 'স্যার, যত তাড়াতাড়ি পারেন, আমার ছুটির ব্যবস্থা করে দিন। বাকী দিনগুলো আমার অনেক কিছু করার আছে।' বেশিক্ষণ আর সেখানে না থেকে বেরিয়ে আসেন যামিনীবাবু।

অফিস ছুটি হতে তখনও মিনিট পনেরো বাকি। যামিনীবাবু কনকের দিকে চেয়ে বলেন, 'আজ আসি কনক।'

'আমিও যাব। একটু দাঁড়ান।' কনক বলে।

'তুমি যাবে যাদবপুর, আমি শ্যামবাজার।'

কনক বলে, 'আপনাকে আমার কিছু বলার আছে যে?'

'শুনবো। নিশ্চয়ই শুনবো। তবে আজ নয়।' যামিনীবাবু কথাকটি বলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যান।

পশ্চিম আকাশটা এখন আবীর কুমকুমে রাঙান। হাওয়া দিচ্ছিল খুব। বড় বড় গাছের পাতায় হাওয়ার ঝাপটা লেগে শনশন শব্দ হচ্ছিল। পাখিরা সারাদিনের পর ঘরে ফিরছে। সেই অনেককাল আগের দেখা বড়ুয়ার ছবিতে এরকমই একটা পরিবেশেই তো সেই বিখ্যাত গানটা শুনেছিলেন যামিনীবাবু....দিনের শেষে ঘুমের দেশে, ঘোমটা পরা ওই ছায়ায়...গানটা ফের এত বছর পর মনে পড়লে মন কেমন যেন হয়ে গেল। স্মৃতির জগৎ অলৌকিকভাবে খুলে গেলে যুগপৎ দুঃখ ও সুখে রোমাঞ্চ অনুভব করলেন তিনি। সিগারেটের দোকান থেকে খুচরো দুটো সিগারেট কিনে দড়ির আগুনে একটা ধরিয়ে পর পর দু-তিনটে টান দিলেন। মনে হল, অনেক কিছু করার আছে—স্তূপীকৃত হয়ে আছে সেই সব কাজ। শুধু অবসরের মুহূর্ত খুঁজছিলেন। কিন্তু কোন কাজটা প্রথম করবেন অর্থাৎ কাজের গুরুত্ব খোঁজার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রাস্তায় ক্রমশই ভিড় বেড়ে যাচ্ছে, দ্রুততা বাড়ছে মানুষ-মানুষীর, ট্রামের—বাসের। পথ চলতে চলতে সব কিছুই নজর করে দেখছিলেন যামিনীবাবু। মনে পড়ল বিলাসের কথা। ওর শ্রাদ্ধের দিন সব কিছু নিজে দাঁড়িয়ে করেছেন। বিলাসের বউ, ছেলে-মেয়েকে দিয়ে চেষ্টা করেছেন সব কিছু মানিয়ে চলতে। দেরি না কবে বিলাসের বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন যামিনীবাবু। 'ভগবান এত নিষ্ঠুর কেন?' বিলাসের বউ-এর এ প্রশ্নে জবাব দিয়েছিলেন, 'ভগবানকে বিশ্বাস করলে তাঁর বিধানকেও বিশ্বাস করুন। মনে শান্তি পাবেন।' বিলাসের বাড়ির দিকে যতই এগিয়ে আসছিলেন, ততই ওঁর অনেক অনেক কথা স্পষ্ট মনে পড়ল। অফিস ফেরত সুরেন বাড়ুয্যের স্ট্যাচুর নিচে প্রায় দিনই ঘন্টাখানেক বসে থাকতেন ওঁরা। ঝালমুড়ি, বাদামভাজা ও কলসীর চা খেতেন। বিলাসের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। ও মানুষ দেখে তাদের আসল চেহারাটা আবিষ্কার করতে পারতো। একদিন একজন পাকানো চেহারাব লোককে হাতের ইশারায় কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'খদ্দের পিছু কত কমিশন পাও?' লোকটা প্রথমে কোন উত্তরই দিতে চায়নি।

বিলাস ধমকে বলেছিল, 'সত্যি কথা বল। নইলে ছ'মাস জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়বো।'

লোকটা মিয়োন গলায় উত্তর দিয়েছিল, 'ঠিক নেই স্যার, কারো কাছে দু'টাকা, কারো কাছে তিনটাকা।'

বিলাস ভুরু কুঁচকে বলেছিল, 'পুরুষ মানুষ হয়ে ওসব নোংরা ঘাঁটতে লজ্জা করে না? ফের যদি এখানে দেখেছি তো...। লোকটা মাথা হেঁট করে চলে গিয়েছিল।

যামিনীবাবু বলেছিলেন, 'জীবনের ওই একটা দিক দেখতে বড় ইচ্ছে হয় বিলাস।'

হো হো করে হেসে উত্তর দিয়েছিল, 'এ আর এমন কী কঠিন কাজ। চলো না, আজই যাই।'

সত্যিই বিলাস ওঁকে নিয়ে গিয়েছিল। গিয়ে বুঝতে পারল যামিনীবাবু, এসব জায়গা বিলাসের খুবই পরিচিত।

বিলাসের বাড়ির সামনে একদণ্ড কী সব ভেবে নিয়ে কড়া নাড়লেন যামিনীবাবু।

'ওমা! আপনি? আসুন, আসুন।' বিলাসের বউ ঘোমটা ঠিক করে বললেন কথাকটি।

যামিনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছেন?'

'চলে যাচ্ছে।' ছোট্ট উত্তর দিয়ে বিলাসের বউ বললেন, 'বাড়িতে কেউ নেই, ছেলেমেয়েদুটো বেরিয়েছে। আপনি একটু বসুন। চা করে আনি।'

যামিনীবাবু থমথমে গলা করে বললেন, 'বিলাসের চলে যাবার পর থেকে বিকেলে আর আমি চা খাই না। চা খেতে ও বড় ভালবাসত।'

বিলাসের বউয়ের কপালে সামান্য ভাঁজ পড়ল। বললেন, 'উনি তো অনেক কিছুই পছন্দ করতেন— উনি নেই বলে সব কিছুই তো তাহলে ছেড়ে দিতে হয়। আপনিই না বলেছিলেন, ভগবানকে মানলে তাঁর বিধানকেও মানতে হয়।'

প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্যই যামিনীবাবু বললেন, 'বিলাসের পি-এফ-এর টাকা নেক্সট মান্থেই পেয়ে যাবেন আশা করি। আমরা দুজনই সরকারি চাকরি করে ভুল করেছি। যদি আমরা মার্চেন্ট ফার্মে চাকরি করতাম তো আপনার ছেলেমেয়েদের একজনের না একজনের একটা যা হোক গতি হ'ত।'

বিলাসের বউ উত্তর দিলেন, 'আপনি থাকতে আমাদের কোন ভয় নেই। জানি, একটা বটগাছ তো এখনও রয়েছে।' বলেই স্নেহলতার সমান বয়সী বিলাসের বউ ম্লান হাসলেন।

ঠিক এই মুহূর্তে বিলাসের একটা কথা মনে পড়ে গেল যামিনীবাবুর। প্রতি মাসের মাইনের দু'তিনদিন পরে বিলাস মদের দোকানে ঢুকতো। নেশার ঝোঁক নয়, খুব স্বাভাবিক গলায় বলেছিল বিলাস, 'যামিনী আমার মাথায় একটা নতুন আইডিয়া এসেছে। সেটা কী জানো। কেউ না কেউ আমরা একজন আগে সটকে পড়বো—কথা দাও, আমাদের বউদের বিধবার মত আচরণ করতে দেব না—আমি যদি আগে যাই তো তুমি আমারটাকে দেখবে, আর তুমি যদি আগে যাও তো আমি তোমারটা দেখবো।'

যামিনীবাবু হেসে বলেছিলেন, 'আমরা মানলেও ওরা মানবে কেন?'

'আলবাৎ মানবে। এই ভাবেই সোস্যাল অর্ডারের চেঞ্জ আনতে হবে।'

এই মুহূর্তে যামিনীবাবুর মনে হল, বিলাস তাহলে সোস্যাল অর্ডারের চেঞ্জ চাইত। আরও কত কী যে চাইতো বিলাস, কে জানে? কই ওর মতন তো আমি কখনও এরকম ভাবতে পারিনি, মনে মনে ভাবলেন যামিনীবাবু। কোনদিনই বিলাস ফিনিসিং টাচ দিতে পারতো না—কেমন হুটহাট করে চলে গেল। বুকের ভেতর ব্যথা অনুভব করলেন যামিনীবাবু। বিলাসের বউ হেসে বলেছিল, 'আপনাদের সব কিছুই আমি জানি। ও আমাকে কোন কিছুই গোপন করতো না। তবে কী জানেন, প্রতি মাসেই দুটো একটা দিন ও কোথায় যেন চলে যেত। বলেই যেত ফিরবে না। আপনি কী জানেন ও কোথায় যেত?'

বুকের ভেতরটা হঠাতই শূন্য হয়ে গেল যামিনীবাবুর। এই প্রথম বিলাসের সম্পর্কে এক ধরনের রহস্যের সন্ধান পেলেন। বললেন, 'না, বিশ্বাস করুন, এসব আমি কিছুই জানি না।'

ঠিক সেই ফাঁকে বিলাসের বউ উঠে গেল। এত কাছের মানুষ ছিল বিলাস—তবু কেন যে, ও এমন দুর্জ্ঞেয় রহস্য রেখে গেল কে জানে।

মিনিট পনেরোব পর ওমলেট আর চা নিয়ে এল বিলাসের বউ। সেন্টার টেবিলটা যামিনীবাবুব দিকে এগিয়ে দিযে বলল, 'খান।'

ওমলেটের টুকবো মুখে দিয়ে সেই আগের প্রশ্নের রেশ ধরেই যেন উত্তর দিলেন যামিনীবাবু, 'সব মানুষের মধ্যেই বুঝি এমন একটা রহস্যময় বিলাস থাকে। কেউ কোনদিন তার হদিস পায় না, একটু আধটু বহস্য কী আমার আপনাব সকলের মধ্যেই নেই?' চায়ের কাপে সত্যিই ঠোঁট ছোঁয়ালেন না যামিনীবাবু। বললেন, 'আজ উঠি তাহলে, পরে আবার আসবো।' দেয়াল ঘড়িতে আটটা বাজার শব্দ হল। উঠে দাঁড়ালেন যামিনীবাবু। পেছনে পেছনে বিলাসের বউ দোরগোড়া পর্যন্ত এগিয়ে এলেন।

রাস্তায় পা দিয়েই যামিনীবাবুব মনে হল, বিরাট একটা পরিবর্তন অন্ধকারে আততায়ীব মত ওঁত পেতে বসে আছে। কেউ-ই টের পাচ্ছে না। ভাবলেন, সময় শেষ হযে আসছে। কিছু একটা করে যেতেই হবে তাকে। দিন কয়েকের মধ্যে সব কিছু ঠিক কবে ফেলতে হবে, কোন কাজটা প্রয়োজনীয়, কোনটা নয়। নিঃশব্দ শিশিব পাতের মত শুধু চলে যাবো—শুধু নিজেব ছেলে-মেয়ে-বউ-এর মধ্যে চাপা হাহাকাব দিন কয়েক বড় বেশি গুরুত্ব পাবে....নাহ্ ডেপুটি সেক্রেটারী যেমন কথার শেষে বলেছিলেন, 'সারা শরীর জ্বলে, জ্বলে জ্বলে খাঁক হয়ে যায', এ সময় যামিনীবাবুও তীব্র জ্বলন অনুভব করলেন। কেমন ক্লান্ত বোধ করলেন। মাথার ভেতবে অজস্র জট। একটা দোকানের সিঁড়িতে বসে পড়লেন তিনি। আকাশে অজস্র তারাব মেলা। ছেলেবেলায যেমন সপ্তর্ষিমণ্ডল, ধ্রুবতারা দেখে অবাক হয়ে যেতেন, আজও ঠিক তেমনি অবাক হবার চেষ্টা কবলেন। কিন্তু পারলেন না। সময় ওঁর জীবনের অনেক কিছুই হরণ কবে নিয়েছে। উচ্ছ্বাস, আবেগ, এসব একদম আর নয। ঠিক সেই ফাঁকে কনকের কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেলেন--এই দেখুন না, এই তিরিশ বছর বয়সেও আমি মিস্ কনক অধিকারী। ভাবলেন, কনকের কথা কালই শুনবেন তিনি।

বাড়িতে যখন এলেন-তখনও টি-ভিতে সিনেমা হচ্ছে বুঝতে পারলেন। ইদানীং পাশেব বাড়িব সঙ্গে স্নেহলতাব খুব ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। টি ভি সেই আকর্ষণের যোগসূত্র। যামিনীবাবু স্নেহলতাব স্বপক্ষে বেশ কতগুলো যুক্তি দাঁড় কবালেন। সারা দিন ধরে মানুষটা বড় একা-- সব থেকেও একা। নিজে কখনও কী এই একাকিত্বের যন্ত্রণা সহ্য করেছেন? ভাবলেন, সেও আর একবকম ভাবে নিঃসঙ্গ। অবশ্য—এ দু'য়ের পার্থক্য আছে যথেষ্ট। দীর্ঘ তিবিশ বছরের দাম্পত্য জীবনের মধ্যে যামিনীবাবুও মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠেছেন, কতবার পাশে শুয়ে থাকা বিভোর ঘুমে আচ্ছন্ন স্নেহলতাকে অপবিচিত ঠেকেছে। মনে হয়নি কী তাঁর, এই যে স্নেহলতা তাকে কী পুরোপুরি জানেন, চেনেন ? কল্যাণ আর কল্যাণী মাঝে মাঝে বাড়িতে এলে মৌসুমী আবহাওয়ার সৃষ্টি হয ঠিকই, কিন্তু এসবের মধ্যেও তো কখনো-সখনো, ওবা সকলেই কেমন অপরিচিত, রহস্যময়। এমনটা হয কেন?

জামা-কাপড় ছেড়ে বাথরুমে গিযে ঢুকলেন যামিনীবাবু। ভাল করে মুখে হাতে জল দিলেন। বাথরুম থেকে বেরিয়ে স্বস্তি বোধ করলেন। রাঁধুনী জলখাবার দিয়ে চলে গেল। চায়ের কাপ থেকে ধোঁযা বেরুচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবলেন যামিনীবাবু, বিলাসের বউ-এর কাছে

মিছে কথা বলে, ওদের বন্ধুত্বের গভীরতাকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। প্রতারকের চেহারা কেমন হয় জানেন না যামিনীবাবু। দেয়ালে টাঙানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজতে চেষ্টা করলেন, নিজের ভেতরে প্রতারকের অস্তিত্বকে। নাহ্, সবই তো একই রকম দেখাচ্ছে। সকালের দেখা চেহারার সঙ্গে এখনকার চেহারার কোন তফাৎ নেই। ভীষণ নিশ্চিন্ত বোধ করলেন যামিনীবাবু। ওখান থেকে সরে এসে খাবার-চা খেয়ে নিলেন। সেই বিকেলে কেনা সিগারেটের একটা এখনও আছে মনে পড়তেই হ্যাঙারে টাঙানো পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেট বের করে দেশলাই জ্বাললেন। হাসি হাসি মুখে ঘরে ঢুকে বললেন স্নেহলতা, 'কখন এলে?'

একমুখ ধোঁয়া বের করে যামিনীবাবু উত্তর দিলেন, 'এই কিছুক্ষণ। কী সিনেমা দেখলে?'

স্নেহলতা হেসে জবাব দেন, 'সংসার।'

'সংসার? সে তো এতকাল ধেরে দেখছো। নতুন কী দেখলে?' প্রশ্ন করলেন যামিনীবাবু।

'হ্যাঁ।' একটু থেমে স্নেহলতা বললেন, 'কিন্তু সব সংসারের চেহারা এক নয়, অমিল প্রচুর।'

সরাসরি স্নেহলতাকে দেখলেন যামিনীবাবু। চেষ্টাকৃত উপেক্ষার ভাব ফুটিয়ে বললেন, 'সব কী একরকম হয় কখনো?'

স্নেহলতা কী বুঝলেন কে জানে। কোন উত্তর না দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন। যামিনীবাবু ড্রয়ার খুলে একটা ধূসর রং-এর ডায়েরী বের করলেন। চাকরির দিন থেকে আজ পর্যন্ত সব কিছুই এই ডায়েরীতে লেখা আছে। পি এফ কত জমেছে, কত লোন, কো-অপারেটিভের হিসেব গ্র্যাচুইটির পাওনা, ব্যাঙ্কে জমান টাকা, সব কিছুর হিসেব লেখা রয়েছে। ইনটারেস্ট কত তাও ঠিক ঠিক হিসেব কষে রেখেছেন। দেখলেন, লাইফ ইনসিওরেন্সও ম্যাচিওর করে গেছে। সব মিলিয়ে কত পাবেন ডায়েরীর শেষ পাতায় তা লিখে যোগ করলেন। বাঃ বেশ! এতগুলো টাকা কী দু'জনের পক্ষে যথেষ্ট নয়—একটা জীবনের সম্পূর্ণ মানচিত্র স্পষ্ট চোখের সামনে ফুটে উঠলে যামিনীবাবুর মন হঠাৎই কেমন ভার হয়ে গেল। মনে মনে ভাবলেন, সারা জীবন ধরে শুধু কাজ করে গেলাম। এই জীবন! শুধু একটুখানি সিকিউরিটির জন্য জীবন ভোর এই শ্রম .হলতার কত সাধ আহ্লাদ, নিজের একটুখানি আকাঙ্ক্ষাকে কী প্রতিদিন গলা টিপে মেরে ফেলেননি তিনি? অস্ফুটে বলে উঠলেন, 'ক্রিমিন্যাল। আমি একটা ক্রিমিন্যাল।' সামান্য ওই কথাটা অসম্ভব অসহায় করে তুলল যামিনীবাবুকে। 'নিজেকে খুন করেছি, স্নেহলতাকে খুন করেছি'— ভাবলেন যামিনীবাবু। ভীষণ কষ্ট হতে লাগল সে সময় ওঁর। চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল।

যামিনীবাবুকে অমন করে ডায়েরী খুলে বসে থাকতে দেখে স্নেহলতা হতভম্ব হয়ে গেলেন। ওঁর উপস্থিতি টের পেলেন না যামিনীবাবু।

স্নেহলতা যামিনীবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে খোলা ডায়েরীর পাতায় চোখ রেখে দেখলেন, যোগ-বিয়োগের হিজিবিজি কাটাকুটি। হেসে বললেন, 'কী ভাবছ এত?'

যামিনীবাবু যেন এতক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন। স্নেহলতার সহাস্য মুখ দেখে খুব করুণ গলা করে বললেন, 'কী করি বলো তো?'

'কী করবে?'

'জানো, আমাদের কিছু একটা করা উচিত।' একটু থেমে ফ্যাঁসফ্যাসে গলায় বললেন যামিনীবাবু।

'দার্জিলিং যাবে? পুরী, কাশী কিংবা হরিদ্বার।'

স্নেহলতা হেসে বললেন, এতগুলো জায়গার নাম করলে, কোনটায় যাই বলো তো? আর যাবেই বা কী করে? ছুটি কই?'

যামিনীবাবু বিমর্ষ চোখে স্নেহলতাকে দেখলেন। মনে পড়ল, কতবার স্নেহলতা বেড়ানোর কথা বলেছে। তখন সে সব কথার কোন গুরুত্বই দেননি। গম্ভীর মুখে বসে থাকতেন শুধু। সতর্ক ভঙ্গিতে যামিনীবাবু উত্তরে বলেছিলেন, 'ইচ্ছে তো হয় খুব, ছুটি নেই।' আজ এই মুহূর্তে কী করে বলবেন তিনি, অনেক অনেক ছুটি পাওনা আছে তাঁর। বললেন, 'সে দেখা যাবে। কিছু একটা ঠিক করো তো?' স্নেহলতা বললেন, 'জব্বলপুরে কল্যাণী কতবার যেতে লিখেছে। যাওয়া হয়নি। গতকাল চিঠি এসেছে, ওর শরীর নাকি ভাল নেই। কী হবে, পুরী, কাশী, কিংবা হরিদ্বার গিয়ে? তার চেয়ে বরং জব্বলপুরেই চলো। কতদিন ওদের দেখি না।' যামিনীবাবুর মুখের দিকে উদ্‌গ্রীব চোখে চেয়ে রইলেন স্নেহলতা। কী মনে করে ফের বললেন, 'ফেরার পথে কল্যাণ-এর ওখান থেকেও না হয় ঘুরে আশা যাবে।'

কিছু একটা উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করে যামিনীবাবু বললেন, 'বেশ তাই চলো।'

সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারলেন না যামিনীবাবু। ছায়াছবির মত অনেক কিছুই এলো গেল। অনেক মুখ, অনেক কথা সবই বড় বেশি অস্পষ্ট আর আবছা। বাবা, মা, স্টীমার ঘাট, ঘাঘর নদী, মনসার পাঁচালী, গহনার নৌকো, করিম, হাবিব, ভোলা, টুনু সবই আজ একসঙ্গে ওর সঙ্গে রসিকতা করছে। 'রেলগাড়ি ঝমাঝম, পা পিছলে আলুর দম' —ছেলেবেলার সেই ছড়া হঠাৎ এত স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন কেন? আবছা আলো অন্ধকারের মধ্যে স্নেহলতার মুখ চোখে পড়তেই দেখলেন, বড় নিশ্চিন্ত ও। আজ ক'দিন ধরেই তো মনে হচ্ছে, কিছু একটা করা উচিত, কিন্তু কিছুই ঠিকঠাক গুছিয়ে উঠতে পারছেন না তিনি। বিছানা থেকে উঠে জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। নিঃশব্দে ছাদে উঠে এলেন যামিনীবাবু, জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হচ্ছে বিশ্বচরাচর। হঠাৎ কতগুলো কাক একযোগে ডেকে উঠল। একেই কী কাক জ্যোৎস্না বলে? বড্ড ঠকল কাকগুলো। যামিনীবাবুর মন হঠাৎ খুশীতে ভরে গেল। শরীরটা কালিয়ে উঠলে নিচে নেমে এলেন।

শুতে যেতেই স্নেহলতা ঘুম চোখে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছাদে এতক্ষণ কী করছিলে?'

চমকে গেলেও হাসি পেল, যামিনীবাবুর, 'তুমি না ঘুমোচ্ছিলে?'

স্নেহলতা ঘুম জড়ান গলাতেই উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, তবু টের পেয়েছি। টের পেয়ে যাই।'

'সব টের পাও।'

উত্তর এল স্নেহলতার, 'এবার ঘুমোও তো। রাত শেষ হতে আর বেশি দেরী নেই।' পাশ ফিরে যামিনীবাবুর পিঠের ওপর হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন স্নেহলতা।

এখনও রিলিজ অর্ডার এল না। জরুরী ফাইল শেষ। মনের সেই ভাবনাটা ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে, ফলে অস্থিরতা বাড়ছে।

অফিসে বেরুবার মুখে স্নেহলতা বললেন, 'আজ একটু সকাল সকাল ফিরো। যতক্ষণ না ফেরো বড় দুশ্চিন্তা হয়।'

সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে পড়লেন যামিনীবাবু। আশ্চর্য! দু'জনের মধ্যে কত পার্থক্য। যামিনীবাবু ভাবছেন, কিছু একটা করা দরকার আর স্নেহলতার শুধু চিন্তা ছেলে-মেয়ে আর ওঁকে নিয়ে। সংসার, সংসার করেই ও কেমন নির্বিবাদে দিন কাটিয়ে যাচ্ছে।

সারাদিন মুখ বুজে কাজ করলেন যামিনীবাবু। কনকের সঙ্গে দু-একটা কথা হ'ল। ডেপুটি সেক্রেটারীর কাছে খোঁজ নিলেন। অফিসে সব জানাজানি হয়ে গেছে। ছেলে-ছোকরাদের ওঁর ব্যাপারে তেমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে দেখলেন না। শুধু কনক দুঃখীর মত মুখে মাঝে মাঝে দেখছিল ওঁকে। বিকেলের দিকে এসপ্ল্যানেডের মোড়ে মানুষ থিক্ থিক্ করে। বড় পরিচিত দৃশ্য এসব। কেউই কাউকে ভাল করে দেখে না। সকলকেই কেমন ব্যস্ত আর উদ্বিগ্ন দেখায়। হঠাৎ কানে যায় যামিনীবাবুর। 'কেউ আমাকে রাস্তাটা পার করে দিন না'— যামিনীবাবু থমকে দাঁড়ান। সকলেই শুনেছে সে কথা কিন্তু কারুরই সে কথায় নজর দেবার সময় নেই। লোকটার হাত ধরলেন উনি। ঢ্যালা বের করা অন্ধ মানুষটার মুখে খুশী ছুঁয়ে গেল। যামিনীবাবু লোকটাকে সাপটে ধরে রাস্তার পার হলেন। সামান্য এটুকুন কাজের মধ্যেই যামিনীবাবু আনন্দ পেলেন। লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাবেন? থাকেন, কোথায়?'

একটু আগের দেখা মানুষটার মুখের হাসি আর নেই।

লোকটা থমথমে মুখে বলল, 'জানি না।'

যামিনীবাবু বললেন, 'কিছু খাবেন?'

'একটু জল'। লোকটা উত্তর দিল।

যামিনীবাবু বললেন, 'শুধু জল? বলুন, আপনার কী খেতে ইচ্ছে করে, আমি খাওয়াবো।'

লোকটা ম্লান হাসল। বলল, 'রসগোল্লা, সন্দেশ, মাংস, মোগলাই পরটা।'

ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন যামিনীবাবু। ভাবলেন, এত খিদে নিয়ে লোকটা জল খেয়েই কী বেঁচে থাকে। আর সত্যিই যদি এসবই ওকে দেওয়া যায় তো খাবে কী করে? একটা ভাল মিষ্টির দোকানে ঢুকে লোকটাকে পেট ভরে খাওয়ালেন। লোকটা পর পর দু' গ্লাস জল খেয়ে বলল, 'এত টাকা আপনি আমার জন্য খরচ করলেন কেন? পাপ-পুণ্যের দোটানায় পড়েছেন বুঝি?'

ভীষণ রাগ হল, কথাগুলো শুনে। কিন্তু প্রকাশ করলেন না। ভাবলেন, লোকটা বড় অকৃতজ্ঞ। এমন করে কী কেউ কোন উপকারীকে প্রশ্ন করে? ফের বিলাসের কথা মনে পড়ে গেল ওঁর। একজন ভিখিরিকে পয়সা দিতে দেখে বিলাস বারণ করে বলেছিল, 'কত লোকের দুঃখ তুমি দূর করতে পারো যামিনী? মনেও ভেব না, এই সামান্য দানে তোমার পুণ্য হবে। আসলে কী জানো, এ সবই লোক দেখান ব্যাপার? বলতে পারো, নিজেকে জাহির করা। দেখোনি, রোজ সকালে গঙ্গার ঘাটে চোর, বাটপার, লম্পট স্নান সেরে মুঠো মুঠো দান করে। তা দেখে আমরা ধন্যি ধন্যি

করি। আমাব তো মনে হয়, ওসব করলে নিজেকে ছোটই করা হয়।' সেদিন বিলাসের কথার প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যামিনীবাবু, 'সবাই খারাপ, ভাল মানুষ, সৎ মানুষ একটাও নেই, তা ভাবা কী ঠিক হ'ল?'

বিলাস সম্মতি জানিয়ে বলেছিল, 'তা ঠিক। তবে বেশির ভাগ মানুষের মধ্যেই লোক দেখানো ব্যাপার বড্ড বেশি।'

আজ এই মুহূর্তে ভাবলেন, সত্যিই কী এই অন্ধ মানুষটাকে রাস্তা পার করে দেওয়া আর খাওযানোব পেছনে নিজেকে জাহির করার মতলব ছিল? না, নেহাতই উপকার করার মন নিয়ে অন্ধ মানুষটার সঙ্গে এ রকম ব্যবহাব করেছেন। সব কিছুই ভীষণ জটিল হয়ে উঠলো যামিনীবাবুর মনে। কিছুতেই সঠিক কিনাবা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ধীর মন্থর পায়ে হাঁটছিলেন যামিনীবাবু, স্নেহলতা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বলেছিলেন। ঘরের দিকে পা বাড়ালেন । এবার বাড়িতে গিয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে একটু সুস্থ বোধ করলেন। পথে থাকতেই কালো মেঘ চোখে পড়েছিল— ঝড় হবে, হতে পারে, এই সম্ভাবনায় একটা রিকশা করে বাড়ি ফিরেছিলেন। এখন বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

স্নেহলতা জলখাবারেব প্লেট টেবিলে রাখতে রাখতে স্মিত হেসে বললেন, 'আমি ভাবতেই পারিনি তুমি এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে। ঘড়িব কাঁটা প্রায আটটা ছুঁই ছুঁই। যামিনীবাবু মনে ধাক্কা খেলেন। ভাবলেন, এই যদি তাড়াতাড়ি হয, তাহলে দেরী কাকে বলে। এব থেকেও দেরীতে ফেরেন তাহলে। উত্তব না দিয়ে অপলকে স্নেহলতাকে দেখলেন। খাবাবের প্লেটে হাতও ছোঁয়ালেন না।

খুব করুণ গলা করে প্রশ্ন কবলেন যামিনীবাবু, 'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস কববো স্নেহ।' উত্তবের অপেক্ষায না থেকে বিকেলে যা যা ঘটেছে সব নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে বললেন, 'আচ্ছা, তুমিই বলো, এব পেছনে নিজেকে কী জাহিব করার কোন ইচ্ছে ছিল আমার?'

স্নেহলতা উত্তর দিলেন, 'কী জানি। আগে হ'ত না, এখন আমিও মাঝে মাঝে ভিখিরি খাওয়াই। অতশত বুঝি না।'

যামিনীবাবু পাল্টা প্রশ্ন কবলেন, 'তাহলে অন্ধ মানুষটা অমন কথা বলল কেন? লোকটা ভীষণ ধড়িবাজ, তাই না?'

স্নেহলতা উত্তর দিয়েছিলেন, 'এসবেব কিছুই বুঝি না আমি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন উনি। কী ভেবে ফের বললেন, 'তুমিই তো বলেছিলে, ওরা নাকি আমাদের থেকেও বেশি বোঝে। ওসব ভেবে মন খারাপ করে কী হবে, এবাব খেয়ে নাও তো?'

যামিনীবাবু কথা বাড়ালেন না। এক মনে খাবার খেতে লাগলেন। খাওয়ার শেষে স্নেহলতার চোখে চোখ পড়তেই ভীষণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'অমন করে কী দেখছো?'

স্নেহলতার গলা ভীষণ আর্দ্র। বললেন, 'তোমার এত খিদে অথচ মুখ ফুটে কিছু চাও না।'

সে কথায় না হেসে পারলেন না যামিনীবাবু।

স্নেহলতা প্রশ্ন করলেন, 'এতে হাসির কী হলো। না খেয়ে খেয়ে শরীবটার কী করেছো দেখো তো?'

অনেক দূরবর্তী জিনিসকে যেমন করে দেখে ঠিক তেমনি ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলে যামিনীবাবু উত্তর দিলেন, 'আমার খাওয়া ঠিক যেমন করে দেখছিলে, আমিও অন্ধ মানুষটার খাওয়া ঠিক তেমনি করেই দেখছিলাম। অত খিদে লোকটার তবু শুধু জল খেতে চেয়েছিল; কী আশ্চর্য। আসলে খিদের সময় সব মানুষের চেহারাই বুঝি এক রকম হয়ে ওঠে।' কথাগুলো একটানা বলে হাল্কা হয়ে গেলেন যামিনীবাবু।

স্নেহলতা উঠে দাঁড়ালেন। যেতে যেতে বললেন, কী জানি, অত শত বুঝি না।'

অফিসে কোন কাজই হচ্ছিল না। লোড শেডিং চলছে। চেয়ারগুলো ফাঁকা হয়ে গেল মুহূর্তে। ছেলে ছোকরারা হই হই করে কমন রুমে চলে গেল। যামিনীবাবুর সামনের সিটে শুধু মিস কনক অধিকারী বসে। অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ করছিলেন যামিনীবাবু কনক কিছু বলবে বলবে করেও কিছু বলতে পারছে না। কেন যেন কিছুই ভাল লাগছিল না।

যামিনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'সেদিন কী যেন বলবে বলেছিলে কনক, আজ বলে ফেলো।'

পুরু লেন্সের চশমার ফাঁক দিয়ে কনক সরাসরি যামিনীবাবুর দিকে চেয়ে রইল। বলল, 'আসলে আমিও গুছিয়ে উঠতে পারছি না। কোনটা যে বেশি প্রয়োজনীয় তা বুঝতে পারছিনা।'

যামিনীবাবু বললেন, 'ওটাই তো সব চেয়ে বড় প্রবলেম। সব মানুষ আলাদা হলেও এক জায়গায় অভিন্ন। আর সে কারণেই আমার মনে হয়, সকলেই বড় অসহায়।'

ছলছলে চোখে ফ্যাকাশে গলায় বলল কনক, 'আপনার লিভ স্যাংসানড্ হয়েছে।' বলেই ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল কনক। নিজেই নিজেকে সামলে বলল, 'সকলেই বলাবলি করছিল, আগামী সোমবার আপনার ফেয়ারওয়েল! আমিও সোমবার থেকে ক'দিনের ছুটি নেব।'

যামিনীবাবুর কানে সেসব কথা গিয়ে পৌঁছল না। মুহূর্তেই রেলের হুইশেল শুনতে পেলেন তিনি। মুহূর্তেই মনটা বিবাগী হয়ে গেল। সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে অ[illegible]বাসের জন্য বড় বেশি কাঙাল হয়ে উঠলেন। আবার ধীরে ধীরে অস্থিরভাব ঢেউ কমেও গেল। যামিনীবাবু কনকের উদ্দেশে বললেন, 'যাই ক'রো আমাকে জানিও কনক। চেষ্টা ক'রো সুখী হতে।' শেষের কথাকটি বলতে বলতে গলা কেঁপে গেল যামিনীবাবুর। হিসেব করে দেখলেন, আর মাত্র চারদিন তারপর থেকে দিন-রাত্রির চব্বিশ ঘণ্টা একান্তই তাঁর নিজের। কেউ-ই কোন খবরদারি করবে না, একেবারে স্বাধীন। ফুরফুরে মন নিয়ে বাড়ি এলেন যামিনীবাবু।

অসময়ে ওঁকে বাড়িতে আসতে দেখে স্নেহলতা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'তাড়াতাড়ি চলে এলে যে? শরীর খারাপ?'

'না। এমনি চলে এলাম।'

স্নেহলতা খুশী খুশী গলায় বললেন, 'তা বেশ করেছো। রোজই ভাবতাম তুমি কোন না কোনদিন আগে আগে চলে আসবে, কিন্তু আসনি। সকলেই আসে। এ রকম আগে যদি আসতে তো খুব ভাল হ'ত।'

স্নেহলতা যে খুশী হয়েছেন বুঝতে পারলেন যামিনীবাবু। এই মুহূর্তে স্নেহলতাকে আরও একটু চমকে দিতে পারেন মনে করেই বললেন, 'এই দেখো ট্রেনের টিকিট।'

'ও মা। কোথাকার টিকিট? জব্বলপুর না দুর্গাপুরের। কবে যাবে?' স্নেহলতার উৎকণ্ঠা ক্রমশই বাড়তে থাকে।

যামিনীবাবু সহাস্যে উত্তর দিলেন, 'এই রোববার।'

স্নেহলতা বললেন, 'এক্ষুনি ওদের সে কথা জানিয়ে দিতে হয়। ভীষণ খুশী হবে ওরা। তুমি চা খাবে?'

যামিনীবাবু বললেন, 'জানিয়েছি। তোমার জন্যও চা করো। একসঙ্গে দু'জনে চা খাবো।'

শনিবার থেকেই গোছগাছ শুরু হল। নিউমার্কেট থেকে নাতি-নাতনির জন্য দামী খেলনা কিনলেন। কল্যাণী আমের আচার পছন্দ করে, তাও দু'শিশি কিনে ফেললেন। জামাই আর বউ-মার জন্য কিনলেন প্যান্টের কাপড় আর তাঁতের শাড়ী। কল্যাণের জন্য কী কিনবেন? বড় ধাঁধায় পড়ে গেলেন যামিনীবাবু।

স্নেহলতা বললেন, 'ছোটবেলায় ও খুব জলছবি পছন্দ করতো। তাই কেন না?'

'ধ্যুৎ। এখন কী ওর জলছবির বয়স আছে।'

স্নেহলতার ভুল ভাঙে। বললেন, 'তাহলে কিছু একটা কেনো?'

'দামী একটা লাইটার দিলে কেমন হয়।' যামিনীবাবু উৎসুক চোখে চেয়ে থাকেন স্নেহলতার দিকে।

'সেই ভাল। সকলের জন্য জিনিস নিচ্ছি, ওর জন্য কিছু না নিলে মনে দুঃখ পাবে।'

অনিন্দ্য আর কল্যাণী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। ওঁদের ট্রেন থেকে নামতে দেখেই ছুটে এল কল্যাণী। নাতনি প্রণাম করলো, অনিন্দ্যও। অফিসের গাড়ি করে অনিন্দ্য নিজেই গাড়ি চালিয়ে বাড়ি এল। মিনিট দশেকও লাগল না। ছিমছাম সুন্দর ফ্ল্যাট। ঘরে ঢুকেই কল্যাণী চা জলখাবার করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আজ সোমবার। ঘড়িতে সময় দেখলেন যামিনীবাবু। বেলা দশটা। একটু পরেই অফিসের কেউ না কেউ ওঁর বাড়ি আসবে। দরজায় তালা দেখে চলে যাবে। অবাকও হবে, আবার বিরক্তও। ভাবলেন, আশপাশের বাড়িতে খোঁজ-খবর নেবে নিশ্চয়ই। যামিনীবাবু একটু অন্যমনস্ক। দীর্ঘ বছরগুলোয় কত ফেয়ারওয়েলই তো তিনি দেখেছেন। ওপরে ওপরে কত দরদ— ভেতরটা বড় বেশি শূন্য। শুধু এ সময় কনককে বড় বেশি মনে পড়ছে যামিনীবাবুর।

'কী হলো? কী ভাবছো এত?' কল্যাণী আর স্নেহলতা একসঙ্গেই বলল কথাগুলো। সম্বিত ফিরে পেলেন যামিনীবাবু। কিছুই বলতে পারছিলেন না।

পাশের ঘরে নাতনি নতুন খেলনা পেয়ে হই হই করছিল। অনিন্দ্য বাজারে গেছে কিছু কেনাকাটা করতে।

যামিনীবাবু ধরা গলায় বললেন, 'স্নেহ, আমার কিছু বলার আছে। জানো, আজ আমাব ফেয়ারওয়েল ডে। এতদিন কিছুই জানাইনি তোমাকে। ওসব আমার একদম ভাল লাগে না।' মা-মেয়ে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে চলে গেল ঘর থেকে। ওদের অনেক কাজ। শুধু স্থির হয়ে বসে যামিনীবাবু ভাবছিলেন, তাঁর অনেককে অনেক কথা বলার আছে। চেষ্টা করেও সে সব বলতে পারছেন না। বিলাস যদি থাকতো তাহলে হয়তো নিজের মনের সব কথা বলতে পারতেন। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। মনে মনে বললেন, 'ফিনিসিংটা বেশ দিয়ে গেলে বিলাস। শেষ পারানির কড়ি নিয়ে আমি বসে আছি। একটা উজ্জ্বল আলোকিত সমাপ্তির জন্য কতদিন আমাকে অপেক্ষা করতে হবে কে জানে!' চাপা এক দুঃখ যামিনীবাবুকে ছুঁয়ে গেল এ সময়। অফিসের সব সহকর্মীদের মুখ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। ভাবলেন, এভাবে ওদের কাছ থেকে পালিয়ে আসাটা কী খুব ভাল হ'ল। পরমুহূর্তেই একটা যুক্তি দাঁড় করিয়ে নিজেকে হালকা করার চেষ্টা করলেন। ফেয়াওয়েল নেওয়া মানেই অথর্ব আর পঙ্গু হয়ে যাওয়া। পালিয়ে এসে ভালই করেছি। ভাবলেন এখনও অনেকদিন তাঁকে বাঁচতে হবে, ধীর স্থির অবিচলভাবে সব অসমাপ্ত কাজ শেষ কবতে হবে। যদিও সহকর্মীরা ওকে ভুল বুঝবে, তবুও এছাড়া আর কোন পথই ছিল না।

কল্যাণী ফিরে এসে যামিনীবাবুর গা ঘেঁষে বসে বলল, 'ভালই করেছো। মিছিমিছি ওদের কথা চিন্তা করো না।' যামিনীবাবু হাসলেন, ফ্যাকাশে হাসি।

ঠিক সেই সময় ওরা টের পেল সিঁড়ি ভেঙে অনিন্দ্য ওপরে উঠে আসছে।

কি জানি কেন

হঠাৎ অসময়ে বৃষ্টি না এলে আমাকে গাড়ি-বারান্দার নিচে দাঁড়াতে হত না। ইদানীং আমার সঙ্গী-সাথী সব কমে গেছে। প্রৌঢ়ত্বের সীমানা ছুঁই ছুঁই করছে আমার বয়স। এখন খুঁজলে মাথায় পাকা চুল অনেক পাওয়া যায়-- খুব নিবিড়ভাবে তাকালে কপালে বলিরেখা ধরা পড়ে, চোখের কোণে তিন-চারটে সরু সরু দাগ যেন ঘোষণা করে অস্ফুটে, অনেক তো হল, এবার পারের হিসেব কর।

একথা বললে স্ত্রী রাগ করে। অভিমানে মুখ ভার করে থাকে। ওরকমের একখানা অভিমানী মুখ আমার দেখতে ভাল লাগে। স্ত্রীর মুখটা কোন সময় আমার দৃষ্টির সমুখ থেকে সরে যায়, সেখানে আমার মৃত মায়ের মুখটা ভেসে ওঠে। একবার সুস্থ শরীর সুখের মনে করে নিয়মিত ব্যায়াম করতাম। মাসখানেকও হবে না, মা-র সামনে খালি গায়ে বুক ফুলিয়ে ঘোরাফেরা করছিলাম। মনোতোষ রায়কে হারিয়ে দিতে আর বেশি দেরী নেই এই রকমের একটা ভাব বা ধারণা তখন আমার বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। মা আমাকে অমন করে হাঁটতে দেখে এক সময় জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হ্যাঁরে অমন করে হাঁটছিস কেন? বুকে ব্যথা-ট্যাথা হয়নি তো?' অমনি ফিক করে হেসে মাকে ভড়কে দেবার জন্য বলেছিলাম, 'সবই ব্যায়ামের গুণ। ক'দিনেই শরীরটার কী রকম মাসল হয়েছে দেখেছো।' মার হাতের কাছে ছিল এক তালপাতার পাখা। সেটা নিয়ে তেড়ে এলেন মুহূর্তে। বলেন, 'বলদ, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাড়-পাঁজরা গোন গে যা। মুখপোড়া, মাসল তোর এ জন্মে হবে না।'

তখন খুব কষ্ট হয়েছিল ও কথা শুনে। অন্তত এইটুকু আশা ছিল, মা সত্যি কথা বলবেন। কিন্তু কী হল, মনটা ভীষণ বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল সে সময়। মিথ্যে বলতে পারবো না, সেদিন কম করেও আমি তিন-চারবার বড়দার বিয়ের পাওয়া ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে আয়নায় বুক দেখেছিলাম। শত চেষ্টা করে শরীর ফুলিয়ে এক কণা মাসলও আমার চোখে পড়ে নি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম, শরীর আমার আগের থেকে অনেক ভাল, বেশ জোর পাই, কাজে উৎসাহ বোধ করি; তাহলে কী হচ্ছে ব্যাপারটা তা বুঝতে আমার অনেকদিন লেগেছিল। পরে যখন বুঝতে পারি, মায়েরা কিছুতেই স্বীকার করে না যে ছেলেরা তাদের সুস্থ ও সবল। ও কথা বললেই নাকি ছেলের শরীর খারাপ হতে থাকে। পরবর্তীকালে ছেলেপুলে না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী কিছুতেই বলতে চাইত না যে, শরীর আমার ভাল হয়েছে। এখন ছেলেপুলের ব্যস্ত সংসারে আমার দিকে নজর দেবার সময় ছিল না তার। ফলে আমিই যেন বাড়তি হয়ে যাই দিন দিন। সারাদিন পরিশ্রমের পর বাড়ি এসে

ইজি চেয়ারটার ওপর শরীর এলিয়ে দি; মুখ ফুটে কিছু বলতে হয় না, চা-জলখাবার অটোমেটিক এসে পড়ে। গরম চায়ে চুমুক দিয়ে বেশ একটু তৃপ্ত ভাব ফুটে উঠলে ভাবি, একেই বুঝি সুখ বলে, সুখী সংসার বলতে বুঝি এই বোঝায়।

যাই হোক, যে কথা বলছিলাম, সেটায় ফিরে আসা যাক, যে কথা শুরু করি তা চট করে বলতে পারি না; মাঝখানে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা চলে আসে। পারের হিসেব করবো যে এমন শক্তি আমাব নেই। হিসেব তারাই করতে পারে, যোগ-বিয়োগের ব্যাপারটা যাদের অনেক। আমার যোগও নেই, বিয়োগও নেই! ফুসমন্তর ফুস যেমন জীবন শুরু করেছি, তেমনি ফুস মন্তর ফুস করতে করতে আমি শেষ করবো। এখন প্রশ্নটা এই দাঁড়ায়, তাহলেও তো একটা হিসেব হল। তা করতে না চাইলেও, কোন ফাঁকে যে কী করে বসি, ঠাহর করতে পারি না। ব্যাপারটা ঠিক এরকম, ঠাকুর-দেবতা মূর্তিফূর্তি কিছু নেই অথচ ত্রিশুল-গাঁথা মন্দিবের মত একটা কিছু দেখলেই কোন ফাঁকে দুটো হাত এক হয়ে যায়, জোড়া হাত কোন ফাঁকে কপালে উঠে আসে। আশ্চর্য! সেসব সময় আমি কী বলি? কিছু বলি কী? অনেক দিন এমন অবস্থা হয়েছে আমার যে, ওই এক প্রশ্ন মনের মধ্যে তুলে পথ চলতে চলতে উত্তর দি, প্রশ্ন করি, আবার উত্তর দি, প্রশ্ন করি। আসলে ওই সব কিছুর পেছনে কী যুক্তি থাকতে পারে, অনেককাল ধরে সেই সব প্রশ্ন কবেছি নিজেকে। পরে ভুলে গিয়েছি। আবার হয়তো মনে পড়েছে পরমূহূর্তেই মনটাকে সাবধানী করে তুলে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্যে মনটাকে তৈরী করেছি। অনেকদিন পর হঠাৎই ওই প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছি। আমরা একান্নবর্তী সংসারে মানুষ। বাবা-মার ঘর, কাকা-কাকীমাব ঘর, দাদা-বউদির ঘর আলাদা। বিয়ের পর আমারও একটা ঘর হয়েছে। এবং আগে যা কখনই নজরে পড়তো না, এবার আস্তে আস্তে সেইসব বিষয়ের প্রতি নজর পড়তে লাগল। যেমন, বাবা-মার ঘরে লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তি বা ফটো, কাকা-কাকীমাব ঘরে শিব-পার্বতী আর মা কালীর, দাদা-বউদির ঘরে লক্ষ্মী-সরস্বতীর সঙ্গে খানকযেক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির ছবি। ওসবই আলাদা আলাদা ভাবে পুজো হত। মাকে দেখতাম ওই ঠাকুরেব সামনে বসে কত কী খুটখাট কবেন, পলতে পাকান, বাবা মাথার ওপবে হাত রেখে ইজিচেয়ারে বহুক্ষণ বসে থাকেন, নয়তো বা ইংবেজী কাগজের এডিটোবিযাল পড়েন, কোন কোনদিন দেখি লাল কালিতে ভুল ইংরেজী, ভুল বানান দাগিযে যান, কাকা-কাকীমা শিব-পার্বতী আর কালীর ছবি ফুল বেলপাতায় ঢেকে দেন, ধূপ জ্বেলে ঘরটায় পবিত্র পবিত্র ভাব ফুটিয়ে তোলেন, আর দাদা-বউদির ঘরে ছোট্ট পিতলেব থালায় গুজিয়ার সঙ্গে সাদা বাতাসা দেওয়া থাকে, সামান্য কুচো ফুল সেই থালার পাশে জড়ো করা থাকে। দাদাব ছেলেটার বয়স চার। বেশ ডাঁটো শাঁসালো ছেলে হবে ভবিষ্যতে, এ বয়সেই ও বেশ নিজেরটা বুঝতে শিখেছে; বউদি ও দাদা ওকে কোলে নিয়ে হেসে বাঁচে না। আত্মজের বুদ্ধি বিচক্ষণতায় মুগ্ধ। ঈশ্বর আশীর্বাদ-ধন্য একজন কেউ দয়া করে এই তুচ্ছ সংসারে হাজির হয়েছে তাই যেন ডেকে ডেকে সকলকে দেখায়, ওদের সামনে কেউ কিছু বলে না। যে যার ঘরে এসে মুখ বাঁকায়, দাদার বুদ্ধিহীনতা ও বউদির ঠুনকো আভিজাত্যকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ পর্যন্ত করে; আর আমার ঘরে আমার বউ আমার প্রথম রত্নটিকে নিয়ে কালীতলায় যায়; ফুল, বেলপাতা আর গঙ্গা জলের ক্বাত বেশ কিছুটা ওর পেটে সেঁধিয়ে

ওকে শুদ্ধি করে নিয়ে বলে 'নমো, নমো'। মা-কে দেখে ছেলে আমার, নমো নমো করতে শেখে। এই দৃশ্যটা যেদিন আমি প্রথম দেখি, সেদিনই প্রায় আকস্মিক আমি আমার অনেককালের একটা প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাইঃ কেন হাত জোড় করি, কেন সেই হাত কপালে উঠে আসে উপলব্ধি করতে পারি। আমার বাবা-মাও হয়তো আমাকে অমনি করে ভগবৎ বিশ্বাসী করার চেষ্টা করেছিলেন। অসফল হয়েছেন ওকথা বলি না। বরং বলা চলে, সংস্কারের বোধটা আমাদের মনে অমনি করেই ধীরে ধীরে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে।

তাই শত চেষ্টা করেও পারের হিসেব করতে পারি না। যখনই করতে বসি, তখনই কেমন যেন নিজেকে ছোট মনে হয়। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে গিয়ে মন হাঁপিয়ে ওঠে। নিজেকে সতেজ রাখার জন্য আমি এমন সব কাণ্ডকীর্তি করে বসি যা দেখে আমার বউ আর ছেলে ভয় পেয়ে দুদিন আমার সঙ্গে কথাই বলে না। অকারণে ওরা ঘরের মধ্যে ইতস্তত পায়চারি করে। ওদের সে মুহূর্তের মনকে বুঝতে অসুবিধে না হলেও আমি কিছুতেই সহজ হতে পারি না। রামগড়ুরের ছানার মত মুখ করে কান্টের ফিলজফি কিংবা ডসটেয়ভস্কির ক্রাইম অ্যানড্ পানিসমেন্ট পড়তে বসে যাই।

বই-এর অক্ষরগুলো সে সময় আমার চোখের সামনে ছোট ছোট কালো পিঁপড়ের মত গুটগুট করে চলাফেরা করে। আমি ভ্যাবলা চোখে সেই পিঁপড়ের হাঁটাচলা লক্ষ করি। ছেলে ও বউ-এর দিকে চোখ ফেরাতেই দেখি ওদের সারা শরীরে ওই কালো কালো পিঁপড়েগুলো হাঁটাচলা করছে; পিঁপড়েগুলো ওদের বুঝিবা ভীষণ রকমের সুড়সুড়ি দেয়; ওরা হেসে গড়াগড়ি খায়। তা দেখে আমার চোয়াল শক্ত হয়, চোখ স্থির হয়ে আসে। আমি সেসব মুহূর্তে ভীষণ অসহায় হয়ে পড়ি। কেমন যেন বোকার মত ছেলেকে কাছে ডেকে নিয়ে বলি, 'দ্যাখতো আমার হাতের কপালের শিরাগুলোর রং লাল না নীল? সে প্রশ্নে ভীষণ ঘাবড়ে যায় আমার ছেলে। শূন্যদৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। অবশেষে কিছু না বলে, ছুটে আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। এবং তখনই ছেলেকে আমি কি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তা ভাবতে বসে যাই। কুলকিনারা কিছুই আমি পাই না। ভীষণ কষ্টে আমার গলা বুক শুকিয়ে যেতে থাকে।

সোনামুখীতে আমার এক মাসীমা থাকেন। কত বয়েস জানি না। তিন মাথা এক হয়ে গিয়েছে তাঁর। সেই কবে কোন ছেলেবেলাতে তাঁর বিয়ে হয়েছিল, যৌবনের খররৌদ্রে যখন ঝলমল করছিল তাঁর জীবন, সেই সময় মাসীমা বিধবা হন। ছেলে নেই, মেয়ে নেই। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁর ছায়া মাড়ায় না। সেই মাসীমাকে আমার প্রায়ই মনে পড়ে। সব কিছুতে যখন আমার ধন্ধ লাগে সে সব সময়ই আমার তাঁকে মনে পড়ে। আশ্চর্য। ছেলেটার দৌড়ে পালাবার পর কেন কী কারণে জানি না কোলকুঁজো তে-মাথাওলা বুড়িটা আমার সামনে হাজির হয়ে ফোকলা মুখে হাসে। সে হাসির অর্থ আমি বুঝি। যেন বলতে চায় সোনামুখীর মাসীমা, হিসেব করে মূর্খেরা। দেখছিস না আমাকে। কেমন দিব্যি রয়েছি। হাসির সময় তাঁর কোঁচকান মুখটা বিরাট হাঁ হয়ে যায়, কোটরাগত চোখ দুটো ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে আসে। ওইরকম একটা উৎকট হাসিমুখ দেখে আমার কেন যেন ভয় হয় না, কেমন যেন এক ধরণের সান্ত্বনা পাই। অমনি আমি একা বেশ জোরে হেসে উঠি। সে হাসির শব্দে রান্নাঘর থেকে বউ ছুটে আসে, পেছনে ভয়ার্ত চোখে আমার ছেলে ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকে।

দুদিন যে কথা বলিনি ওদের সঙ্গে সেসব তখন আমার আর মনে পড়ে না। কিংবা একটু আগেই আমি কেমন গোমড়ামুখে বিশ্রী চেহারা নিয়ে বাড়ির আবহাওয়া সচকিত করে তুলেছিলাম, সেকথা মনে পড়তেই দ্বিতীয় দফায় আর একবার হেসে উঠি। বউ-ছেলেকে আশ্বস্ত করার সুরে বলি, 'তোমার ছেলে ভীষণ সাহসী হবে, বুঝলে? যেই জিজ্ঞেস করেছি অমনি ও ছুটে পালিয়ে গেছে; ছেলের দিকে ফিরে বলি, 'আমাকে ভয় পাস কেন রে? আমি তোর কে বল দেখি?'

অল্প সময়ের মধ্যে ওরা বেশ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। দীর্ঘ অন্ধকারের পর হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলে যেমন হয়, এও ঠিক তেমনি। বউ রান্নাঘরে যেতে ভুলে যায়, ছেলে নতুন বায়না ধরে চিড়িয়াখানায় হিমাদ্রি না নীলাদ্রির বাচ্চা হয়েছে তাই দেখতে যাবে। অতটুকু ছেলে কোথায কোন জায়গায় নতুন কী হচ্ছে তার ঠিকঠাক সব হিসেব ওর প্রায় কণ্ঠস্থ। ভাবতে আমার অবাক লাগে। কেন না, আমার ছেলের বয়স তো আমারও একদিন ছিল। এক গুচ্ছ ভাইবোনের ভিড়ে আমাব চাহিদা বলে কী কিছু ছিল?

হঠাৎ বুঝিবা আমার বউ-এর মনে পড়ে যায় রান্নাঘরের দোর খোলা। ষোড়শী মেয়েদের শরীরের ভঙ্গি নিয়ে ও ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ছেলেটা আমার গা ঘেঁষে বসে আমার শরীবের গন্ধ শোঁকে। বুঝি এখনও তার কিছুটা সংশয় রয়েছে আমার ওপর, তাই গন্ধের ভেতর দিয়ে প্রত্যয়বান হতে চায়। মনে মনে ওর আচরণকে তারিফ না করে পারি না। মনে মনেই বলি, বেশ বেশ, এই তো চাই, তোকেই তো সব বুঝে নিতে হবে; ইন্দ্রিয়গুলোকে ভোঁতা করে রাখিস নে, খোলা রাখবি, সজাগ রাখবি। বউ ফিরে এসে আমাকে জিজ্ঞেস না করেই গান গায়। ও জানে কাছের নয়, দূবের গান আমার ভাল লাগে। তাই ও দূরের গান গায়। যার ফলে আমাদের মধ্যে এক জাতীয় সুদৃশ্য নৈকট্য গড়ে ওঠে। আমি দুচোখ বুজে গান শুনি। আজ এতকালের মধ্যেও জানি না, গান গাওয়ার সময় বউ-এর আমার কথা মনে পড়ে কি না।

ঘড়িতে সময় দেখি সওয়া সাতটা। এমন আর কী রাত্তির মনে করে ঋজু গলায় বউকে বলি, 'রান্নার কাজ কী সব শেষ করে ফেলেছ?'

ওকি বোঝে জানি না, গম্ভীর মুখে উঠে যেতে গিয়ে আমাকে কেমন যেন ভ্রূকুটি করে। বুঝি, এই সময় এমন একটা মুহূর্তে আমার ওকে একথা না বলাই উচিত ছিল। তাই ভুল শোধরাবার জন্য ওর নরম তুলতুলে বাহুটা ধরে ওকে নিজের কাছে নিয়ে আসতে চাইলে অমনি আমার নজরে পড়ে, ওর দু'চোখে মুক্তোর বিন্দুর মত জল এক্ষুনি প্রবল বন্যার আকার ধারণ করবে। ছেলে এক মনে আমাদের দিকে চেয়ে থাকে। আমি ওর উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে বউকে বুকের খুব কাছে নিয়ে বলি, 'ভেবেছিলাম রান্না না হলে তোমাদের নিয়ে চিনে হোটেলে খেতে যাবো।'

কিছুদিন ধরে আমার বউ একটা বিড়ালছানা পুষেছিল। সেটা ঠিক এই সময় মিউমিউ করে উঠলে ছেলেকে বলি, 'যা তো, পুষি অমন করছে কেন দেখে আয় তো।' ছেলে এক দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলে পর বউকে আমি খুব নিবিড়ভাবে চুমু খাই; ওর চোখের নোনতা জল আমার গালে মুখে লাগে। অনেকদিন পর ও বলে, 'অসভ্য'। অমনি আমার বুকের মাঝে খুশীর মাদল বাজতে থাকে।

ও বলে, 'না, সবে গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। চলো, আজকে আর রান্না করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।' কোথাও বেরুলে ছেলেকে সাজাবার দায়িত্ব আমার ওপর বর্তায়। এবং তা করতে আমার ভালই লাগে। ধোপ-ভাঙা জামা-প্যান্ট-মোজা পরিহিত ছেলেকে দু'চোখ ভরে দেখি। আমার ছোট্ট সংস্করণ আমার ছেলে, বুকের ভেতর ছলাৎ ছলাৎ করে ওঠে সে ভাবনা। অল্প কিছু সময়ের মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়ি। ট্যাক্সি করে সোজা পার্ক স্ট্রীটের দোকানে ঢুকে গোগ্রাসে নানারকমের খাবার খেয়ে তৃপ্ত হই। সেসব সময় আমি লক্ষ করি বউ একটু কায়দা করে কথা বলে, মেপে হাসে। ছেলেব সারল্যে খুব যে খুশী হয় তা নয়, বরং মুখ চোখে একটু বিরক্তির ছাপ ফুটিয়ে তোলে। বেনারসের বাঙালীটোলার মেয়ে আমার বউ। যাকে বিয়ে করে প্রথম প্রথম আমার নিজেরই কীরকম সংকোচ হয়েছে, সেই-ই মাত্র ক'দিনের মধ্যে কী অদ্ভুত কৌশলে কলকাতার মেয়ে হয়ে গেল, সেটা ভাবলে আমার নিজেরই কেমন যেন অবাক লাগে। বড় কোম্পানীর প্রায় বড় রকমেরই একজন হোমরাচোমরা আমি, সেই আমার সব কিছু ও কেমন সুন্দর মেনে নিল; পণ্ডিতের বাড়ির মেয়ে হলেও ওব মদ্যপানটান পার্টিটার্টির ব্যাপাবে খুব যে একটা বিরূপতা আছে সে-রকমের কোন মনোভাব ও দেখায় নি, বরং উন্নতির চাবিকাঠিই যে ওইসব তা উপলব্ধি করতে পেরেছে জেনে আমার বেশ একজাতীয় অহংকার মনটাকে চাঙ্গা করে তোলে। ফলে বাড়ির অন্যান্য বউদের সঙ্গে আমাব বউ-এর দুস্তর একটা ফারাক রচিত হয়।

গত ডিসেম্বরের পর থেকে আমার রোজগাব দু'হাজার ছাড়িযে গেছে। অবশ্য আসল মাইনে এত নয়, এ সবই আমাকে নানান কৌশলে করতে হয় এবং সেসব বাড়তি টাকাগুলো এক এক সময় আমাকে একটু ফ্যাসাদে ফেলে। জট ছাড়াতে আমার বউ ওস্তাদ। ওব হাতে ঘুষ-ঘাষেব বাড়তি টাকা তুলে দিযে আমি নিশ্চিন্ত হই। ঠিক অনেক গুমোটের পর হঠাৎ যদি এক দমকা হাওযা গেঞ্জিব ভেতরে ঢুকে পড়ে তাহলে যেমন সুখ ও আরাম অনুভব হয়, এ-ও ঠিক তেমনি।

চিনে দোকান থেকে বেরিযে, একটা ট্যাক্সি অনেকক্ষণ ধরে ভাড়া করি। ড্রাইভাবকে গঙ্গার ঘাটের দিকে যেতে বলে সিগারেট ধরাই। ছেলে জানালার একপাশে, মাঝে বউ, আব একপাশে আমি। কেন যেন এই সময় বউ-এর থাই-এ হাত দিয়ে শয়তান হয়ে উঠি। বউ সে-সব ব্যাপারে আপত্তি তো করেই না। উপরন্তু একটু বেশিই যেন প্রশ্রয় দেয়। যেন কত ক্লান্ত, এই রকম একটা ভাব করে, ও হেলে পড়ে আমার বুকের ওপর; কী এক ধরনের বোধ আমাকে তাতাতে থাকে, আমার ভেতরের ঘুমন্ত সিংহটা ভীষণভাবে আমাকে অস্থির করে তোলে। আশ্চর্য! ভযানক আশ্চর্য হই এই ভেবে এমনটা কেন হয়! বাবার বয়সী পাঞ্জাবি ড্রাইভারের অস্তিত্বকে এমন কবে অস্বীকার করি কেন? কেন এমন নির্লজ্জ হই? যা ঘরে করা সম্ভব, বাইরে যা দোষের, তাই কেন করবার জন্য মন ব্যাকুল হয়! স্টিয়ারিং-এ নজর রেখে ড্রাইভার অস্ফুটে এবাব কোথায় যাবো জিজ্ঞেস করলে মনে মনে অসম্ভব বিবক্ত হই। নিতান্তই ট্যাক্সিব ড্রাইভাব তুমি, এতটুকু বুদ্ধি খবচা করতে শেখোনি; কী করে বোকা সেজে অপরের পকেট কাটতে হয় জানো না, তোমার কিচ্ছু হবে না, পারে যাবার সময় তো হল, এবার কিছু গুছিয়ে নাও না, সৎ থেকে তো অনেক দেখলে, এইসব ভাবনা প্রথমটায় আমাব মনে এলেও মুখে বলি 'আরও দু'একবার এবকম ঘুরিয়ে, সোজা সাদার্ন অ্যাভিন্যু নিয়ে যাবে।'

সাদার্ন অ্যাভেন্যুয়ে বড় বাড়িটার সামনে এসে যখন গাড়ি দাঁড়ায় তখন ঠিক সাড়ে ন'টা। একগুচ্ছের টাকা দিয়ে ড্রাইভারকে বিদেয় করে ঐ বাড়িটার দোতলায় উঠে কলিং বেল বাজাই। মিনিট কয়েকের মধ্যেই দরজা খুলে যায়, রমেশ প্যাটেলের ভারি মাংসল মুখটায় যুগপৎ বিস্ময় ও হাসি একসঙ্গে ঝিলিক দিয়ে অভ্যর্থনায় গদ গদ হয়ে গলতে দেখি। অসময়ে ওকে বিরক্ত করলাম কী না সেকথা আমার বলার আগেই বউ বিশুদ্ধ ইংরেজীতে সেকথা জিজ্ঞেস করে দোষস্খালনে তৎপর হয়ে ওঠে। মিসেস প্যাটেল ও তাঁর ছেলেমেয়েরা একে একে এসে আমাদের সঙ্গে মিশে যায়। গরম কফি ঠোঁটে ছুঁইয়ে ভদ্রতা রক্ষা করে ওদের কাছ থেকে বিদেয় হই। অনেক খরচা করে রমেশ প্যাটেলের কাছে এসে যে আয় হল, তা এখন দেখতে না পেলেও বছর ঘুরলেই তা টের পাবো। তখন সোনামুখীর মাসীমার ফোকলা মুখ এক্কেবারেই আমার মনে পড়ে না। প্রায় ঘন্টাখানেক রমেশ প্যাটেলের বাড়িতে কাটিয়ে যখন রাস্তায় নেমে এলাম তখন টের পেলাম বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ফুটপাথের ওপরও জল থই থই করছে। টিপ টিপ করে তখনও পড়ছে বৃষ্টি। চার বছরের ছেলেকে দীর্ঘ সময় কোলে করে চলা বেশ একটু কষ্টকর; তার ওপর জল ভেঙে চলা, বউ-এর মুখ ইচ্ছে করেই যেন দেখি না সে সময় আমি। এক সময় ও আমাকে ডেকে ছেলেকে কোলে নিতে বলল, আমি কেমন যেন শয়তানী দৃষ্টি মেলে ধরে বলি, 'তবু তোমার আঁচলে ঢাকা থেকে বৃষ্টির জল ওর মাথায় লাগছে না; আমার কাছে এলে বৃষ্টিতে ভিজবে ওর মাথা, তারপর একটা কিছু অঘটন ঘটুক; এ আমি চাই না।' ছেলে ওই আঁচলের তলা দিয়ে মুখ বের করে কেমন মজা পেয়ে গিয়ে হাসে। সে হাসি দেখে, জলভাঙার কষ্ট, বাড়ি পৌঁছতে কত দেরী হবে সেসব একেবারে ভুলে গিয়ে বলি, 'শাবাস, বাপকা বেটা। এই তো চাই, পারবে, তুমিই পারবে আমার সব কিছুকে টিকিয়ে রাখতে।' কেন যেন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, 'হ্যাঁরে, ট্যাক্সিতে বসে তুই কী কী দেখেছিস।' কিন্তু বলি না; বলতে পারি না। আমারই ছেলে তো! যদি বলে বসে, 'দেখেছি, সব দেখেছি, তোমরা কী করেছ সব।' তখন আমার কী হবে বুঝি না, তবে এটা বুঝি বউ আমার ভীষণ লজ্জা পেয়ে যাবে। আর তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই যেন অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে বলবে, 'আগামী রোববার তোমাকে নিয়ে ঠিক চিড়িয়াখানায় যাবো, তোমার বাবা যাক আর না যাক। আমরা দেখবো রং-বেরং-এর পাখি, ভোঁদর, উট, বাঘ, হাতি আরও কত কী!' কিন্তু বাস্তবে হয়তো সে সবে একেবারেই যেতে চাইবে না আমার বউ, নানা অজুহাত দেখিয়ে ছেলের সজীব মনটাকে কিছু পরিমাণে ভোঁতা করে দেবে। বুঝি, এইভাবেই সংসারের ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে ওঠে, যে বড় হওয়া শুধু দৈহিক, ছলনা, চাতুরী আরও কত কী তাতে মিশে থাকে কে বলবে।

অবশেষে আমরা এসে পৌঁছুই বাড়ির কাছাকাছি। গাড়ি-বারান্দার নিচে দেখি অনেক লোকের মাঝে ভিখিরিদের জায়গা নিয়ে কথা কাটাকাটি চলছে। একপাশে টেবিল আলমারি চেয়ার ডাঁই করা। একটা ছোট্ট বেঞ্চের ওপর বসে আছে একটা ছোটখাটো সংসার। আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্যে ঠিক দেখতে পাচ্ছি শচীন কবরেজকে। ছেঁড়া গেঞ্জি গায়, কোলে আট-দশ মাসের ছোট মেয়ে, কেমন শূন্য দৃষ্টির মাঝে রাগ আর নালিশ! তোবড়ান, ক্লান্ত, রক্তহীন কবরেজের বউটা আর দুজন ছেলেকে নিয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে। এমন করে ওরা বসে আছে কেন? তাহলে

কী বাড়িঅলা ওদের আইনের সাহায্যে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে? লোকটা কবরেজ ছিল এটা ঠিক। কিন্তু কবরেজীতে হাত যশ হয়নি তার; তাই টাইপ মেশিন বসিয়ে টাইপ শেখাত, চিঠি পত্র টাইপ করে দিয়ে রোজগার করত। মনে পড়ল, দশ বছর পর, আজই যেন প্রথম ওর কথা আমার মনে পড়ল। যে চাকরিতে এখন আমার এত উন্নতি, তার দরখাস্ত তো এই লোকটাই টাইপ করে দিয়েছিল। এখন যদি ও আমাকে চিনতে পেরে জিজ্ঞেস করে, আপনি সেই অমুকবাবু না; সেই আপনি এখন কত উন্নতি করেছেন, সুতরাং আপনার ওপরে আমার একটা দাবী আছে, আমি এখন বিপদে পড়েছি, আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে আমাকে কিছু টাকা দিন। তাহলে? মাথার ভেতরে কী অদ্ভুত সব যান্ত্রিক শব্দ দাপাদাপি করতে শুরু করে; কেমন যেন গা গুলোনো একটা ভাব আমাকে অস্থির করে তুলতে থাকলে আমি অস্ফুটে বউ ছেলের দিকে তাকিয়ে বলি, 'এখানে দাঁড়িয়ে আর কী হবে, চলো বাড়ি যাই; সামান্য তো বৃষ্টি ছেলেকে আমার কোলে দাও, চলো।' বউ কী বোঝে জানি না; কোন কথা না বলে, ছেলেকে আমার কোলে পাচার করে, বুক ভরে একটা শ্বাস নেয়। ঘরে ঢুকে হাত-পা পরিষ্কার করেও মন থেকে আমার সবকিছু সরে যায় না। সকলে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লে আমার মনে পড়ে, শচীন কবরেজকে আমি বলেছিলাম, আট আনা তো আমি দিতে পারবো না। শচীন কবরেজ স্মিত হেসে বলেছিলেন, বেশ তো, যা আছে তাই দেবেন, না হয় পরে দেবেন-- তবু চাকরিটা হোক, এই আমি চাই।' লোকটাকে এই মুহূর্তে ভীষণভাবে ধমকে বলি, 'তোমার সবকিছুই বুজরুকি, কবিরাজ না হাতি; তুমি কী করে রোজগার করতে তা কি জানি না ভেবেছ? মোদক বেচে সমাজের তুমি কী করেছ, একবার ভেবে দেখ দিকি!'

একদিন বাড়ি এসে দেখি মন্টুর দাদু বিশ্বনাথ পণ্ডিত বসে রয়েছেন। শরীরের মাঝে মাঝে খাবলানো খাবলানো শ্বেতীর দাগ। আমাকে দেখেই পণ্ডিতমশাই বললেন, 'তুমি অমুক না? আমার মুখ থেকে উত্তর পাবার আগেই তিনি বলতে থাকেন, 'তোমাকে দেখে সত্যি বুকটা ভরে যাচ্ছে আমার। শুনেছি, তুমি খুব বড় হয়েছো, আমাদের জীবনে এর থেকে বড় সুখ আর কি আছে?' থামান মুশকিল দেখে শুধোই, 'আমার ঠিকানা পেলেন কী করে?' ঘর কাঁপিয়ে হেসে পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন, 'বেশ বলেছ যা হোক। তুমি জানো না, কত বড় হয়েছ তুমি। সবাই তোমার ঠিকানা জানে।' একটু থেমে গাঢ় গলায় বলেছিলেন, 'আমার বড় বিপদ বাবা, আমি বড় বিপাকে পড়েছি। তাই তোমার কাছে আসা। জানো তো, সারা জীবন শিক্ষকতা করে পি এফ-এ যা পেয়েছি তা মুখে আনতেও লজ্জা করে, মাত্র আঠারো শো টাকা। হঠাৎ গায়ের চাদর তুলে বলতে থাকেন, দেখো, দেখো না। আমার সারা জীবনের সম্বল জোচ্চরের হাতে খোয়া গেছে। কী করি এখন? তোমরা রত্ন হয়েছো, জাতির ভবিষ্যত্, একটা কিছু উপায় কর।'

বলার ইচ্ছে, সারাজীবনের সম্বল অমনি ট্যাঁকে নিয়ে ঘুরতেন এটা কী একটা কথা হল? কিন্তু সে সব কথার ফাঁদে পা না দিয়ে খুব অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করে বলে উঠি, 'তা অবন্তীদা আমেরিকা না বিলেত কোথায় গিয়েছিলেন, ফিরবেন কবে?' ফলে মরা মাছের ফ্যাকাশে দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। শুকনো খরখরে ঠোঁট দুটো ঈষৎ কেঁপে উঠল। কেমন যেন একটা কাতর গোঙানির ঢেউ সে সময়ে তাঁর বুকের ভেতর থেকে ঠেলে উঠলে আমি নিপুণ

অভিনেতার মত ওঁর গায়েব চাদবটা তুলে দেখলাম, ট্যাঁকেব কাছে লম্বা মতন একটা কাটা দাগ; যা দেখে সে মুহূর্তে আমাব কাছে সবকিছু বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। পরিষ্কার আমি দেখতে পেলাম দক্ষ পকেটমার বর্তমান জগৎ-অনভিজ্ঞ একজনকে পেয়ে দয়া করে নি। দয়ার কথাটা আমার মনে এল কেন? শিকারীর কাছে দয়া চাওয়াটাই তো মস্ত ভুল। ঠিক সেই সময় পণ্ডিতমশাই বলেন, 'অবন্তী আমাকে শেষ চিঠি লিখেছে দু বছব আগে; আমার সম্পর্কে আমাকেই ভাবতে বলেছে।' কিছুক্ষণ থেমে হঠাৎ বলে ওঠেন পণ্ডিতমশাই, 'মনে পড়ে তোমাব অবন্তীকে; কালো একমাথা কোঁকড়া চুল, লাজুক চেহারা. ' আমি আর বেশি দূর এগোতে দেই না। একটা দশ টাকাব নোট ওঁর হাতে দিয়ে বলি, 'মাসের শেষ, বোঝেনই তো, বিবাট সংসার . এখন আপনি যাবেন কোথায়?'

'ঝাড়গ্রামে আমাব এক পিসতুতো বোন আছে, ভাবছি বাকি দিনকটা যদি সম্ভব হয়- ' টাকা দশটা হাতে নিয়ে বললেন, 'গিয়েই তোমাকে চিঠি লিখব, উত্তব দিও।'

মুখ ফস্কে বেবিয়ে পড়ে, 'ভাবছি এখান থেকে অন্য কোথাও শিফ্ট কববো, এখানে একদম পোষাচ্ছে না।'

স্মিত হেসে বলেন তিনি, 'সে আমি খুঁজে বেব কববো, কিচ্ছু ভেবো না ' বলেই ধীব মন্থব পায়ে উঠে দরজার বাইরে চলে যান।

কি জানি কেন, সে রাতে আমাব ঘুম আসে না। একটার পর একটা সিগারেট শেষ কবি। অ্যাশট্রে বোঝাই হয়ে যায়। পাশের ঘবে, বউ-ছেলেকে অকাতরে ঘুমোতে দেখি। আমাব বউ, আমার ছেলে। কোঁকড়া কালো একমাথা চুল, উজ্জ্বল এক জোড়া চোখ আমার ছেলেবও। বড় নিষ্পাপ, বড় পবিত্র। কেমন মা-ব গলা জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। বড় নির্ভাবনার একটা জগৎ, বড় সুন্দর। আমি অস্পষ্ট আলো অন্ধকারে ভেতব থেকে অনেকক্ষণ অপলক চেয়ে চেয়ে দেখি। হঠাৎ একটা ভাবনা আমাকে পেয়ে বসে। তা হচ্ছে, আমাব বউ, আমাব ছেলে যদি কোনদিন আমাকে ভুলে যায়? যদি ওরাও পকেটমারেব মত নির্মম নিষ্ঠুব হয়ে আমার প্রতি দয়াহীন চিত্তে সরে যায়? মনে হয়, শুধুমাত্র দয়া ছাড়া ওদেব কাছে আমাব আর কিছুই চাইবাব নেই।

অন্ধকার ঘবে আমি সেই ভাবনাকে বুকে নিয়ে ঠায় কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি জানি না। ভোরের হিমেল হাওয়া গায়ে লাগলে, কোন রকমে ক্লান্ত শবীবটা টেনে নিয়ে আমি বিছানাব দিকে এগিয়ে যাই।

এই আলোয়

অমরনাথ দূর থেকেই দেখল বাড়িটায় আলো জ্বলছে। গুমোট গরমে ভেপ্‌সে যাওয়া শরীরে হঠাৎ দমকা হাওয়া লাগলে যেমন সুখ হয়, বাড়িটাতে আলো দেখতে পেয়ে ঠিক তেমনি মনে হ'ল ওর। অ্যাটাচি কেসটা দুপায়ের ফাঁকে রেখে পকেট হাতড়ে সিগারেট বের করে সিগারেটে আগুন ধরাল। সমস্ত অঞ্চলটাতে অন্ধকার কামড়ে বসে আছে, ওরই মাঝে নিজেদের দোতলা ফ্ল্যাটেআলো দেখে বেশ সুখ পাচ্ছিল। ধীর পায়ে বাড়িমুখো হচ্ছিল অমরনাথ। মিছিমিছি এতদিন কষ্ট করেছে। কয়েক হাজার টাকা খরচ করলেই এই সুখ—একটা পাখা, দুটো আলো। ওকে দেখে আরও অনেকের বাড়িতে এরকম ব্যবস্থা প্রায় বছরখানেক হ'ল হয়েছে। প্যাঁচপেচে গরমে সকলে যখন ভাজাভাজা, সেই সময় পাখার হাওয়া নরম মাখনের মত গায়ে এসে লাগবে, মাত্র এটুকুন সুখ কেন সে নেবে না সুযোগ থাকতে। অলকানন্দা প্রায়ই বলত এ ধরনের কথা।। গায়ে মাখে নি অমরনাথ।

হেসে বলত অলকানন্দা, 'তোমার আছে, তুমি কেন কষ্ট করবে? যাদের নেই তাদের জন্য তোমার কী? কে কার জন্য কতটুকু ভাবে বল?'

ঠিকই বলেছিল অলকানন্দা। কেউ কারো জন্য ভাবে না, যে যার নিজের নিয়েই ব্যস্ত। পরেশের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল ওর। নিজের রক্ত জল করা পয়সা কীভাবেই না দুস্থ ছেলেমেয়েদের পেছনে ঢালত পরেশ। কিন্তু ও-ই যখন কিডনির ট্রাবলে ভুগলো, তখন তো ওকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে এল না কেউ। সকলেই তো জানে, দুটোর মধ্যে একটার ফাংসান ঠিক থাকলেই মানুষ বাঁচে, তবু ভবিষ্যতের ভাবনায় মানুষ বড় সচেতন। দেখতে দেখতে ওই আদর্শবান পরেশ, বাঁচার জন্য ভিখিরির মত সকলের সাহায্য চাইল, কেউ এগোলো না। পরেশকে চোখের সামনে মরে যেতে দেখল। ওর কথা মনে পড়তেই রাগ আর দুঃখের মিশ্র অনুভূতি অমরনাথকে ভীষণভাবে পেয়ে বসল। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে মোড়ের মাথার দেকান থেকে দু'প্যাকেট কিংসাইজ সিগারেট কিনল।

'অলকানন্দাকে আজ একটু বেশি করেই আদর করবো'—ভাবতে ভাবতে বাড়িতে ঢুকে সিঁড়ি ভেঙে কলিং বেলে হাত রাখল অমরনাথ। টের পেল ঘরের ভেতরে বেলের ডিং ডং ডিং ডং আওয়াজ হচ্ছে। সহাস্যমুখে দরজা খুলে দাঁড়াল অলকানন্দা।

ওকে আদর করতে গিয়েই টের পেল, নিজের সারা শরীর ঘামে জবজব করছে। অলকানন্দার গা থেকে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল।

অমরনাথ একপলক অলকানন্দাকে দেখে নিয়ে বলল, 'ইটস্ ভদ্দু, ফাইন'।

অলকানন্দা হেসে বলল, 'এসব তুমি টের পাও কী করে?'

অ্যাটাচিকেশটা টেবিলের ওপর রেখে বলল অমরনাথ, 'অফিসে তো ফেয়ার সেক্স-এর একজিবিশনে থাকি, সব টের পাই', বলেই গলা ছেড়ে হাসল।

জামা প্যান্ট খুলে বাথরুমে ঢুকল অমরনাথ। যেতে যেতে বলল, 'আজ আর চা নয়। লেটস্ অনার ইয়োর প্ল্যান; ড্রিঙ্কস রেডি করো', হেসে বাথরুমে ঢুকল ও।

স্কচের বোতলটা বের করল অলকানন্দা। ফ্রিজ খুলে ঠাণ্ডা জলের একটা বোতল বের করল। ফিনফিনে দুটো গেলাস টেবিলের ওপর সাজিয়ে অমরনাথের জন্য অপেক্ষা করছিল। টাওয়ালে শরীর ঢেকে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আড় চোখে সব দেখে সামান্য হাসল অমরনাথ। খুশি হল। শিস দিল ঠোঁট সুচালো করে।

পাকা হাত অলকানন্দার। দুটো গেলাসে সমান সমান হুইস্কি ঢেলে জল মেশাতে যাবে ঠিক সেইসময় অমরনাথ বাধা দিয়ে বলল, 'নো নো আই ওয়ান্ট এ গুড কিক্'।

অলকানন্দা নিজের গেলাসে সামান্য জল ঢেলে গেলাসটা সামান্য তুলে বলল, 'চিয়ার্স'।

'চিয়ার্স।' এক চুমুকেই নিজের গেলাসটা শেষ করে একটা সিগারেট ধরাল অমরনাথ। সিগারেটে ঘন ঘন দু-চারটে টান দিয়ে বলল, 'ফিনিস ইয়োর ফার্স্ট রাউন্ড কুইক।'

ওর কথা শেষ হতে না হতেই অলকানন্দা গেলাস খালি করে হাসল। হাতের ইশারায় নিজের পাশে বসতে বলল অমরনাথকে। সে ডাকে সাড়া দিল ও। পাশে বসে অলকানন্দার ঘাড়ে হাত রেখে সুন্দর হাসল। সময় ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিল। বড় রাস্তা থেকে গাড়ির শব্দ, লোকজনের সোচ্চার কথাবার্তা ভেসে আসছিল। খোলা জানালার দিকে চোখ রাখল অমরনাথ। আকাশে অসংখ্য তারা ঝিকমিক করছে। সম্ভবত একটা দলছুট পাখিকে উড়ে যেতে দেখল। অলকানন্দাকে যাচাই করার জন্যই যেন বলল, 'আউট ; ইউ আর আউট অলকা!'

'ওহ্ নো'। উত্তর দিল অলকানন্দা। মুখে ম্লান হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল, 'কিছু মনে ক'র না; তোমাকে একটা কথা বলবো'।

'বল না'। অমরনাথ আগ্রহ প্রকাশ করল।

অলকানন্দা নিজের গেলাসে কিছুটা হুইস্কি ঢেলে বলল, 'এখানে আমার সারাদিন খুব ভয় করে। কেন যেন মনে হয়, আমাদের কিছু নেই; ফাঁকা শূন্য'।

অমরনাথ জোর করে হাসল। নিজের গেলাসে কিছুটা ঢেলে জল মিশিয়ে বলল, 'হঠাৎ এসব বলছো কেন? আই হেট অল দোজ মিডল্ ক্লাস সেনটিমেন্টালিজম। আই নো দ্য আলটিমেট এন্ড অব আওয়ার জার্নি। সো আই উইল ড্রিঙ্ক লাইফ টু দ্য লিজ'।

'বাট আই কান্ট হেল্প'—জড়ান গলায় কথাগুলো বলে করুণ চোখে চেয়ে রইল অলকানন্দা। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'এই শোন। থ্রু আউট দ্য ডেজ দিস্ পিপলস আর ক্রিয়েটিং নুইসেন্স। বেগারস হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার। নিউ আলিপুরে ওরা একদম ঢুকতে পায় না।'

অমরনাথ ঈষৎ ভুরু কুঁচকে বলল, 'আই নো অলকা। কিন্তু এখন ওরাই মেজরিটি। কলকাতা এখন ওদেরই দখলে বলতে পারো'।

চোখেব সামনে বং মশাল জ্বলছে কী। মাথার মাঝে ঝম্ ঝম্ বাজনা বাজছে অবিরাম। গলা শুকিয়ে কাঠ। অলকানন্দা প্রায় টলতে টলতে ফ্রিজ খুলে ঠাণ্ডা আর একটা জলেব বোতল বেব করে ঢকঢক কবে জল খেয়ে বলল, 'সকাল থেকে ওদের বিশ্রি গলাব আওযাজে ভবে যায় চতুর্দিক। কী বীভৎস সব চেহাবা। হবিবল্'।

অমরনাথ বলল, 'বাড়িটা ছাড়তে বলছো; কিন্তু কেন ছাড়বো? বাপ্ ঠাকুর্দার বাড়ি ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে...না না সে হয় না। ট্রাই টু ফবগেট অল দিজ। অ্যাভয়েড দেম। জাস্ট অ্যাজ আই অ্যাভয়েড অল মাই কমরেডস্।'

যেন ভীষণ মজার কথা শুনল অলকানন্দা। হাসতে হাসতে একেবারে অমরনাথেব কোলে লুটিয়ে পড়ল। 'কী বললে? কমরেডস্! ওহ্, হোয়াট এ ফানি টার্ম কমরেড্স। য়্যুনিভাবসিটিতে পড়ার সময় কতগুলো ছেলে ওই শব্দটা ব্যবহার করত। ঝোলা ব্যাগ কাঁধে, রুক্ষ চুল; গর্তে বসান চোখ। জানো, ওদের দেখলে খুব মজা লাগত আমাব। চাঁদা চাইতে আসত নীলাদ্রি বলে একজন। চাইতো একটাকা। আমি করুণা করে ওকে দশ টাকা দিতাম। প্রতিবাবই ওকে ওই করতাম, আব প্রতিবারই নীলাদ্রি বাকী টাকা ফেরত দিয়ে যেত। ফুড মুভমেন্টে নীলাদ্রি মাবা গিয়েছিল।'

অমরনাথ নিথর নিস্তব্ধ বসে রইল। বেশ কিছুক্ষণ একটা কথাও বলতে পারল না। হঠাৎ ওব নজরে গেল, অলকানন্দার চোখেব সাদা জমি ঈষৎ গোলাপী। বলল, 'সেদিন নীলদ্রির জন্য তুমি কেঁদেছিলে। তাই না?'

'হ্যাঁ কেঁদেছিলাম।' স্পষ্ট জবাব দিল অলকানন্দা। খোলা জানালাব দিকে তাকিয়ে বইল কিছুক্ষণ।

অমরনাথ প্রশ্ন কবল, 'সেদিন কী তোমার মনে হয়েছিল, এই মৃত্যুব কোন মূল্য নেই। অ্যাবসলিউটলি রাবিশ।'

অলকানন্দা ফ্যাকাশে চোখে চেয়ে বলল, 'জানি না, ও ওরকমভাবে মরবে ভাবিনি।'

অমরনাথ উত্তরে বলল, 'আমাদের ভাবা না ভাবায় কিছু যায় আসে না।'

ঠিক সেই সময় কারেন্ট এল। নিমেষেই অন্ধকার সরে গেল। হৈ চৈ শব্দ উঠল--বোজকাব মত।

টালমাটাল পায়ে অমবনাথ উঠে গিয়ে বেকর্ড প্লেযার চালিয়ে দিল। ওয়েস্টার্নি মিউজিকেব আবহে স্বপ্নময় জগৎ তৈবী হল যেন। অলকানন্দাও উঠে দাঁড়াল। পায়ে পা মিলিয়ে সুরের তালে তাল রেখে নাচল, হাসল বেশ কিছুক্ষণ। দুজনেবই মনে হচ্ছিল, মাথাটা ভীষণ ভারী, চোখ দুটো আঠার মত লেগে আসছিল। বাবকয়েক ঝি-চাকব উঁকি মেবে সব দেখে সবে গেছে। এমন পরিস্থিতি ওদের কাছে নতুন নয়। ডাইনিং টেবিলে খাবার ঢাকা দিয়ে রাখল ওবা।

শিয়ালদা'ব মোড়ে ট্র্যাফিক জ্যামে রাস্তা পার হতে পারছিল না আদিত্য। দীর্ঘদেহ, উরু ঝুরু চেহারা, ঘাড়ে ঝোলান ব্যাগ নিয়ে বিস্ফারিত চোখে সব কিছু দেখছিল। জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া, পেট্রোলের দামও হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে, তবু এত গাড়ির জট দেখে সাময়িক অবাক

হলেও নিজেকে সামলে নিল ও। গাড়ির ফাঁক-ফোঁকরের ভেতর থেকে নিজেকে বের করে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। ট্র্যাফিক পুলিসের সঙ্গে দুজন সার্জেন্টও জট ছাড়ানোর কাজে গলদ ঘর্ম। ড্রাইভারেরা হর্ন বাজাচ্ছিল মাঝে মাঝেই। অনেক কষ্টে কাপড় সামলে একটা গাড়ির পাশ দিয়ে যেতে গিয়েই হঠাৎ নিজের নাম শুনতে পেয়ে থমকে গেল আদিত্য। পেছন ফিরেই দেখতে পেল, গগলস্ চোখে একজন সুবেশ ভদ্রলোক ওকে হাতের ইশারায় ডাকছে। আদিত্য এগিয়ে গেল সতর্ক ভঙ্গিতে।

'শালা! আমাকে ভুলে গেলি'— কথাগুলো বলেই অমরনাথ ইশারায় ওকে গাড়িতে বসতে বলল।

হো হো করে হেসে উঠল আদিত্য। 'অমরনাথ' নামটা উচ্চারণ করেই আদিত্য ওকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল।

'আয়। ভেতরে আয়।' অমরনাথ বলল।

'আজ নয় রে! একদিন তোর ওখানে ঠিক চলে যাবো। ঠিকানাটা দে।' আদিত্য সহাস্যে উত্তর দেয়।

গগলস্‌টা খুলে খালিচোখে আদিত্যকে দেখে নিয়ে বলল অমরনাথ, 'এখনও কী মাঠে ময়দানে ...

ওকে শেষ করতে না দিয়েই আদিত্য বলল, 'ঠিকানাটা দে, একদিন ঠিক যাবো। হৃদয়পুর থাকি। বাবার অসুখ। ঠিক যাবো অমর, কথা দিচ্ছি।'

অমরনাথ ব্যাগ খুলে একটা কার্ড ওর হাতে দিয়ে বলল, 'একদিন আসিস আদি, একদিন।'

কার্ডটা ব্যাগের ভেতরে রেখে এক মুহূর্তও দেরী করল না আদিত্য। 'যাইরে-টাইরে' গোছের কোন উত্তর না দিয়েই একটা ফাঁকের মাঝে নিজেকে গলিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভীষণ গরম হচ্ছিল। রুমাল বের করে মুখ ঘাড় মুছে সিগারেট ধরাল অমরনাথ। মনে পড়ল, এক পয়সা ট্রামভাড়া বৃদ্ধির আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল আদিত্য। হারানো অনেক কথা ঝাঁক ঝাঁক মনে পড়ে গেল। সিগারেটটা প্রায় আঙুলের কাছে এসে পড়েছে, সামান্য গরম তাপ লাগছিল। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল অমরনাথ। সিগারেটের আগুন ছ্যাঁক করে হাতে লাগতেই টুকরোটা ফেলে দিল মনে পড়ল, বেশ কয়েকজন সে আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছিল। ওকে না দেখলে কিছুই মনে পড়ত না। নিজেও তো ওই আন্দোলনে 'সামিল' হয়েছিল। 'সামিল' কথাটা মনে পড়তেই চাপা হাসল অমরনাথ। কতদিন পর ওই শব্দটা মনে পড়ল। ঠিক সেই সময় জ্যামের জট একটু খুলতেই সতর্ক ভঙ্গিতে গাড়িটাকে জটের বাইরে বের করে নিল। নরেন কেবিন, হৃষিকেশ পার্ক, মানিকতলায় সোমেনদের তিনতলার বারান্দা সব স্পষ্ট হয়ে উঠল। আদিত্য, সমু, দুলু, বিকাশ, গোপাল— সব, সকলের মুখগুলো ভেসে উঠল চোখের সামনে। আদিত্য সামনের বাড়ির নাট্যকারের মেয়ে কুসুমের প্রেমে পড়েছিল। একতরফা প্রেম। খুব জ্বালান জ্বালাত আদিত্যকে ওরা ওই নিয়ে। সোমেন বলেছিল, 'তোদের সাপোর্ট করতে পারি না ওই এক কারণে। আদর্শই যদি থাকবে তো দুঃখী বাপের মেয়ে পার কর। তা না, সকলে সুন্দরী বউ-এর স্বপ্ন দেখে। ওদের মত মেয়েরা আমাদের ঘরের বউ হয় বুঝলি।'

আদিত্য তারপর থেকেই সোমেনের বাড়ি আসা বন্ধ করে দিল। প্রথম প্রথম সকলে ভেবেছিল, আদিত্য কোন কাজে আটকে পড়েছে, নয়তো শরীর খারাপ। দিন পনেরোর মাথায় ওরা হঠাৎই একটু নাড়া খেল যখন জানতে পারল, আদিত্য আর কখনও আসবে না।

সোমেন হেসে বলেছিল, 'খামোকা ওকে তোরা ইম্পরট্যান্স দিচ্ছিস। সরীসৃপ প্রাণীরা বুকেভর দিয়েই চলে, আদিত্যও ঠিক তেমনি। মাথা উঁচু করে, মেরুদণ্ড সোজা রেখে ও জীবনে দাঁড়াতে পারবে না। আসলে রিয়েলিটি যা তাই বলেছিলাম, ঠাট্টা করিনি একটুও।'

বিকাশ তার উত্তরে বলেছিল, 'ওর মেরুদণ্ড নেই এটা মানতে পারছি না। আসলে ও দুঃখ পেয়েছে এই ভেবে যে কী করে আমরা একটা মেয়েকে নিয়ে নোংরা ভাবনা ভাবতে পারি। রিয়েলিটি যাই হোক না কেন, আমি বলছি, তোর সেদিন ওভাবে কথা না বলাই উচিত ছিল। আফটার অল মেয়েটা এখানে ফ্যাক্টর নয়, ফ্যাক্টর হচ্ছে আদিত্য।'

দুলু একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলেছিল, 'আজ আদিত্য, কাল আমি, পরশু অমরনাথ, তারপর একদিন আমরা সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো— কেউ কারো খোঁজও রাখবো না। নিজের নিজের নিয়েই বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়বো সকলে।'

প্রচণ্ড গোঁয়ার্তুমিতে পেয়ে বসেছিল সোমেনকে সেদিন। রাগ করে বলেছিল, 'আই ওন্ট বদার।'

গাড়ি চালাতে চালাতে সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল অমরনাথ। বা-দিকের রিক্সা স্ট্যান্ডে তখন দু-তিনখানা গাড়ি। ওতেই ধাক্কা মারতে যাচ্ছিল প্রায়। অনেক কষ্টে স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে সামলে নিয়ে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামল অমরনাথ। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। গাড়ি লক করে একটু এগিয়ে একটা চায়ের দোকানে ঢুকল। চায়ে চুমুক দিয়ে একটু আরাম বোধ করল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ওর মনে পড়ল, আদিত্যকে বাড়ির আর অফিসের ঠিকানা ছাপান কার্ড দিয়েছে। কেন, আদিত্যর ঠিকানা নিল না ও। যদিও আদিত্য বলেছে, হৃদয়পুর থাকে, তবুও হৃদয়পুরের কোনদিকে, স্টেশনের কাছে না অন্য কোথাও, তা কেন জেনে নিল না। সর্বশান্ত, রিক্ত মানুষের মত ওর চেহারা দেখেও, সে মুহূর্তে ওর জন্য দুঃখ বোধ করল না কেন? অথচ, কতদিন এককাপ চা ভাগাভাগি করে খেয়েছে। কতদিন আদিত্যর বাড়িতে গিয়ে টিফিন করেছে অমরনাথ।

মুহূর্তেই অমরনাথের বুকের ভেতরে বড় রকমের একটা শূন্যতা রচিত হয়ে গেল। ট্রেনটা পেয়েছে তো আদিত্য? নাকি ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ট্রেন ফেল করেছে। যদি ট্রেনটা ও না পেয়ে থাকে, তাহলে এখন ও নিশ্চয়ই প্ল্যাটফরমে বসে আছে। কী করছে ও এখন? সত্যিই কী ও এখনও একটা সুন্দর ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখে? আদিত্যর অনেক কথা মনে পড়ে গেল। ওর সব চেয়ে প্রিয় গান ছিল 'বড় আশা করে এসেছিগো, কাছে ডেকে লও' আর গলা ছেড়ে গাইত, 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' গানটা। খালি গলায় হাজার খানেক লোককে স্পষ্ট শুনিয়ে দিতে পারত। বেয়ারা এসে দাঁড়াতেই ও ফের আর এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে পকেট হাতড়াল। আশ্চর্য। এইটুকু সময়ের মধ্যে কুড়িটার প্যাকেট শেষ করে ফেলেছে। ইশারা করে বেয়ারাকে ডাকল। একটা দশ টাকার নোট বের করে বলল, 'কিছু মনে করো না ভাই, এক প্যাকেট সিগারেট এনে দাও। কি

সিগারেট কিছুই বলল না। বেয়ারাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, 'যা খুশী নিয়ে এসো।'

ছেলেটা চলে যেতেই আদিত্যর গলা যেন শুনতে পেল অমরনাথ। আদিত্য বলত, 'সিগারেটের আবার ভাল-মন্দ কী। ধোঁয়া বেরোন নিয়ে কথা। দামী-অদামীতে কী যায় আসে।'

অমরনাথ বলেছিল, 'সস্তা সিগারেটে থ্রোট কমপ্লেন হয়। ক্যানসার-ট্যানসার...

হো হো করে হেসে উঠেছিল আদিত্য। বলেছি, 'পান দোক্তা কোনটাই আমার মা খেত না অথচ ওই মানুষটার হলো কিনা লিভার ক্যানসার। আসলে কী জানিস, নিজেকে জাহির করাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। আরও আছে, তা হল, মানুষকে জেলাস করে তোলা।'

হলদে রঙ-এর একটা প্যাকেট নিয়ে এসে ছেলেটা সঙ্কোচের সঙ্গে দাঁড়াল অমরনাথের সামনে। নোটগুলো তুলে নিয়ে খুচরো পয়সাগুলো ছেলেটাকে নিতে বলেই ভীষণ হোঁচট খেল অমরনাথ। আদিত্যর কথা যে এমন নিখুঁতভাবে মিলে যাবে ভাবেনি। প্রায় আশি পয়সার মত টিপ্স দেওয়ার পেছনে কী অমরনাথের নিজেকে জাহির করার মনোভাব নেই? খুব সন্তর্পনে পয়সাগুলো তুলে ছেলেটা সেলাম দিল অমরনাথকে। চায়ের দাম মিটিয়ে ফের এসে গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে বসল। যতদূর সম্ভব ধীরে গাড়ি চালিয়ে যেতে থাকল। ইচ্ছে করেই সোমেনের বাড়ির সামনে গাড়িটা দাঁড় করিযে একটু এদিক ওদিক চেয়ে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকল।

'কাকে চাই?' ভরাট গলায় একজন প্রশ্ন করল অমরনাথকে।

'সোমেন রায়--'

'বহুদিন ওরা এবাড়ি বেচে চলে গেছে।' লোকটা উত্তর দিল।

'কোথায় গেছে জানেন।'

'দত্ত পুকুরে।'

আস্তে আস্তে পেছন ফিরল অমরনাথ।

লোকটা বলল, 'মাঝে মাঝে উনি আসেন এখানে। আপনার নামটা বলুন, এলে বলে দেবো।'

অমরনাথ ইতস্তত করল খানিকক্ষণ। বলল, 'নাহ্, তার দরকার নেই।'

মাথাটা ভীষণ ভারী, সংশয় কিছুতেই দূর হচ্ছিল না অমরনাথের। কী এমন কারণ থাকতে পারে যে, সোমেনদের কলকাতার বুকে এমন সুন্দর জায়গার বাড়িটা বেচে দিতে হল। সেই সোমেন যে কিনা আই. এ. ফেল করে রাগে একটা ঘুমন্ত কুকুরের পেটে লাথি মেরেছিল। যে কিনা বাজার করতে বললে বিরক্ত হ'ত। ধোপ দুরস্ত জামা প্যান্ট পরে মাছের পিস পকেটে করে নিয়ে এসেছিল একবার। দেওয়ালীতে গুরুজনদের সঙ্গে বসে সরারাত ফ্লাস খেলত। বড় করে শ্বাস টানল অমরনাথ। সৌখিন সোমেন দত্ত পুকুরের মত একটা জায়গায় সত্যি কী করে থাকছে ভেবে পেল না। এখন এসময় ভয়ানক রাগ হ'ল আদিত্যর ওপর। ওর সঙ্গে দেখা না হলে, পুরনো দিনগুলোকে ভালভাবেই ভুলে থাকতে পারতো। সব কিছু কেমন গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল অমরনাথের। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বেশ জোরেই বাড়িমুখো হ'ল। কলিং বেলে হাত রাখতেই ঘরের ভেতরের

ডিং ডং আওয়াজ শুনতে পেল। গোপালের মা দরজা খুলে দিতেই জিজ্ঞেস করল অমরনাথ, 'বৌদিমণি কী বাড়ি এসেছে?' কেন না, গত দু'সপ্তাহ অলকানন্দা বাপের বাড়ি গিয়েছিল। আজকে ফেরার কথা।

গোপালেব মা মৃদু হেসে বলল, 'শরীর খারাপ, শুয়ে আছেন।'

একটু ব্যস্ততা নিয়ে ভেতরের ঘরে ঢুকতেই চমকে গেল অমরনাথ। নানা রঙের উলের বল সাজিয়ে বসে আছে অলকানন্দা।

অমরনাথ ওর গা ঘেঁষে দাঁড়াল, 'হঠাৎ এসব কী ব্যাপার?'

অলকানন্দা ধরা গলায় উত্তর দিল, 'কিচ্ছু হয় না আমাকে দিয়ে। এখন ভীষণ রাগ হচ্ছে মা'র ওপর।' ওর মুখটা ভীষণ থমথম করছিল সে সময়।

গোপালের মা-র হাসি, অলকানন্দার এই ধবনের খেলাঘর সাজিয়ে বসার ভেতর কী কোন ইঙ্গিত পাচ্ছে না অমরনাথ।

ভীষণ উল্লসিত হয়ে উঠল মুহূর্তে। অলকানন্দাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি'?

'হ্যাঁ।' অলকানন্দা স্নিগ্ধ হেসে বলল, 'পরশু মাকে বলতেই মা ডঃ মুখার্জির কাছে নিয়ে গেলেন, জানো সে সময় ভীষণ ভয় করছিল আমার। ডঃমুখার্জি সব দেখেশুনে ইউরিন টেস্ট করে গতকাল জানিয়ে দিলেন।'

অমরনাথ বলল, 'মেয়ে হবে। আমার মন বলছে।'

অলকানন্দা ঠিক তেমনি জোর দিয়ে বলল, 'ছেলে হবে।' একটুক্ষণ থেমে বলল, 'সিনেমায় দেখনি, ভাবী মায়েরা আগে থাকতেই জামা তৈরী করে, মোজা বানায়। কিন্তু এই দেখো, সব আছে, কিন্তু কিছুই পারি না আমি।'

'লেটস্ সেলিব্রেট' বলেই অমরনাথ ফ্রিজ থেকে হুইস্কির বোতল বের করল।

অলকানন্দা হেসে বলে, 'প্লিজ, তুমি একা এনজয় করো। ডঃ মুখার্জি বারণ করে দিয়েছেন ওসব।' পটু হাতে গেলাসে হুইস্কি ঢালল, সামান্য জল মেশাল। সামান্য সময় নিয়ে বেশ ঋজু-ভঙ্গিতে বলল, 'মা বলছিল ওখানে একটা ফ্ল্যাট খালি হয়েছে, ইচ্ছে হলে তুমি নিতে পার।'

ঠিক এ সময় ফোন বেজে উঠল। এক চুমুকে গেলাস শেষ করে অমরনাথ রিসিভার তুলে বলল, 'হ্যালো। ও আপনি। হ্যাঁ সব শুনেছি। সব সেটেল করে ফেলেছেন? সি ইজ অল রাইট। আচ্ছা ঠিক আছে।' রিসিভারটা অলকানন্দার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার মা'।

অলকানন্দা কথা বলছিল হেসে হেসে। অমরনাথের সে সবে কান ছিল না। কেন যেন মনে হল, জমাট নেশা এখন ভীষণ প্রয়োজন। সারাদিনের সব কিছু ছায়াছবির মত ভাসতে থাকল চোখের সামনে। দুপুরে জি. এম. বাসুদেবন-এর স্ত্রী শোভার গায়ের গন্ধ হঠাৎই টের পেল। বাসুদেবন এখন দিল্লিতে। শোভার 'নিমফো' ক্যারেকটার টেরও পায় না ওই গাধাটা। অফিসের কাজে বেরিয়ে শোভার সঙ্গে ধস্তামি মন্দ লাগে না। কী হতো ওই সব পার্টি ফার্টির মধ্যে গিয়ে। অবশ্য রাজনীতির পাঠটা আদিত্যর কাছ থেকে শিখেছিল বলেই না, ওই বড় অফিসের পি-আর-ও হওয়ার সিঁড়িটা তরতর করে পেয়ে গেল। মন্দ লাগে না ওসব মানুষদের সঙ্গে মাতাল অবস্থায়

সাম্যবাদ আর বিপ্লবের কথা বলতে। কঙ্কালসার, রুখু আদিত্যর চেহারাটা ভেসে উঠতেই বিষণ্ণ হয়ে গেল অমরনাথ।

কী মনে করে হঠাৎই বলে ফেলল, 'আদিত্যর সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিল।'

'আদিত্য। কে সে?' অলকানন্দা প্রশ্ন করল।

'তাইতো, তোমার তো ওকে চেনার কথা নয়। বলল, 'নীলাদ্রির মতই ও আর একজন। আজ বহু বছর পর দেখা হয়ে গেল।' আরও কীসব বলার ইচ্ছে ছিল অমরনাথের। হঠাৎ, অলকানন্দার দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পেল, ও রঙীন উলের বল নিয়ে লালের পাশে সাদা, তার পাশে সবুজ, নীল এই সব নিয়ে মেতে আছে। বিভিন্ন সাইজের বুনবার কাঁটা বিছানার ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। উল আর কাঁটা নিয়ে বিভোর অলকানন্দা একদম অমরনাথের অস্তিত্বকে ভুলেই ছিল যেন। এই প্রথম অলকানন্দা ওর কাছে ভীষণ রহস্যময়ী হয়ে উঠল। ওর ওই শরীরের মধ্যে আর একজন বেড়ে উঠছে, শ্বাস নিচ্ছে, যেন স্পষ্ট দেখতে পেল অমরনাথ, মাথা ভর্তি কালো চুল, টিকোল নাক, ধপধপ করছে গায়ের রঙ নিয়ে ওই অন্ধকার গহ্বরে শুয়ে এই আলো ঝলমল পৃথিবীতে আসার অপেক্ষায় রয়েছে। এমনি করেই তো সকলেই পৃথিবীতে আসার অপেক্ষা করে। সে, অলকানন্দা, আদিত্য, পৃথিবীর তাবৎ নর-নারী। বড় সুন্দর আর পবিত্র মনে হয় অলকানন্দাকে। ওকে ছুঁয়ে দেখাব ভীষণ লোভ পেয়ে বসে অমরনাথকে। কিন্তু সাহসে কুলোয় না। স্বপ্নের জগতে যতক্ষণ পারে থাক অলকানন্দা। ভেবেই নিঃশব্দে উঠে গেল ওখান থেকে।

'তারপর কেমন আছিস বল।' খুব অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল অমরনাথ। এবং ঠিক সেই ফাঁকে ও আদিত্যর ঘরের আসবাবপত্র দেখে নিল এক পলকে। যেমন ভেবেছিল তেমন নয়, বেশ পরিষ্কার, ছিমছাম, গুছোন সব কিছু। লেনিনের বক্তৃতারত বিখ্যাত ছবিটা বেশ বড় করে বাঁধানো। একপাশে একটা গ্রুপ ফটো। ফটোটা দেখেই চিনতে পারল অমরনাথ, ছবিটা ওদের ছাত্রজীবনের। কেমন ঘোলাটে হয়ে গেছে ছবিটা। একটু এগিয়ে গিয়ে ছবিটায় চোখ রাখল। 'সকলেই আমরা কীরকম সরু গোঁফ রাখতাম'— বলেই হাসল।

'দুলু আড়চোখে কাকে দেখছিল রে সে সময়?'

আদিত্য সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'ভালই আছি। কী যে ভাল লাগছে না তোকে দেখে।' একটু রহস্য করে বলল, 'এই যে সাহেব, এবার অতীত থেকে বর্তমানে চোখ ফেরা, দেখ কে এসেছে।'

'কে? কুসুম না!' নামটা উচ্চারণ করেই অবাক চোখে চেয়ে রইল অমরনাথ।

কুসুম হাসছিল। বলল, 'কেমন আছেন? বাড়ির সব ভাল? চা করে আনি।' ভেতরের ঘরে চলে গেল কুসুম।

অমরনাথ আদিত্যর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'এত সব হ'ল কবে? জানাসনি কেন?'

আদিত্য স্পষ্ট জবাব দিল, 'এমনি জানাই নি।' সামান্য সময় নিয়ে বলল, 'আচ্ছা তোকে তো আমি ঠিকানা দেই নি, এলি কী করে?'

অমরনাথের মুখোমুখি বসে আদিত্য ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল।

অমরনাথ জবাব দিল, 'কপাল ঠুকে চলে এলাম।' সিগারেটের প্যাকেট বের করে আদিত্যর দিকে এগিয়ে বলল, 'নে। ভেবেছিলাম, তোকে এখানে সকলেই চিনবে। দেখলাম, কেউ চেনে না। তবু হাল ছাড়িনি। একটা মুদির দোকানে জিজ্ঞেস করতেই বলে দিল।'

আদিত্য সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলল, 'তোদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির দু'বছর পর আমি পার্টি থেকে এক্সপেল্ড হয়ে গেলাম। শান্তিদার নামে ফলস্ অ্যালিগেশন এসেছিল। আমি শান্তিদাকে ডিফেন্ড করেছিলাম। ব্যস, খেল খতম।' ধীর গলায় জবাব দিল আদিত্য।

'তা হলে, সেই সুন্দর ভারতবর্ষের স্বপ্ন।'

'দেখি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেখবো। সবুজের সমারোহ, আদিগন্ত ফসলের স্বপ্ন এসব দেখায় তো বাধা নেই। স্বপ্ন দেখার স্বাধীনতা কী কেউ কোনদিন কেড়ে নিতে পারে?' সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রের মাঝে গুঁজে দিয়ে অমরনাথের মুখের দিকে চেয়ে রইল আদিত্য।

কুসুম চা নিয়ে এল। একটা ডিসে ঘরে বানান কিছু কুচো নিমকি।

'বসুন।' অমরনাথ বলল।

কুসুম খুব সহজভাবে উত্তর দিল, 'ছেলের স্কুলেব সময হয়ে গেছে। ওকে দিয়ে আসতে হবে।' আদিত্যর দিকে চেয়ে বলল, 'আজ আর তুমি অফিস না গেলে।' অমরনাথকে লক্ষ করে বলল, 'খেয়ে যাবেন, কেমন?'

আদিত্য মুচকি হেসে বলল, 'ওকে জানো? খেতে বলছো, তোমাব সাহস তো কম নয?'

কুসুম বলল, 'সে তো তুমি ভাল করেই জানো, সাহস আমার কারো থেকে কম নেই। অত কিছুতে আমার কী দরকার, তোমার বন্ধু, ব্যস্।'

সে কথায শব্দ কবে হাসল আদিত্য। পরে ম্লান মুখে বলল, 'মাঝে মাঝে ভুলে যাই, একদিন আমি...'

অমরনাথ ওকে কথা শেষ-করতে দিল না। কুসুমের দিকে চেয়ে বলল, 'ছেলেকে স্কুলে দিয়ে ফেব চা খাওয়াতে হবে। দুপুরে খেয়ে ঘুমিয়ে আড্ডা মেরে বিকেলে ফিরব।'

কুসুম খুশী হয়ে বলল, 'আমারও তা-ই ইচ্ছে।' বলেই ছেলেকে নিয়ে চলে গেল।

অমরনাথ শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তোর বাবার অসুখ এখন কেমন?'

আদিত্য বলল, 'সে সপ্তাহেই বাবা মারা গেলেন। খুব বাঁচা বেঁচে গেছি। কী কষ্টই না পেলেন শেষ জীবনে। জানিস, এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি, ছেলে হয়ে রোজ আমি বাবার মৃত্যু কামনা করতাম। কিন্তু যেদিন সত্যি মবে গেলেন, সেদিন প্রথম টের পেলাম, একটা শূন্য খাঁ খাঁ মাঠের মধ্যে বড় একা দাঁড়িয়ে আছি; ছেলে বউ সব সত্ত্বেও কেন যে সেদিন এমন মনে হয়েছিল জানি না। আর একটা সিগারেট দে। একটু বোস, আমি চা করছি। আর শোন এসব খুলে এই কাপড়টা পর।' বলেই চা করতে চলে গেল আদিত্য।

আদিত্যর দেওয়া কাপড়টা পড়ল অমরনাথ। একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরের মাঝে পায়চারি করতে করতে ভাবল, কী সাংঘাতিক পরিবর্তনই না হয়েছে ওদের সকলের। বদ্ধ পাগলের মত সে শুধু উপরে ওঠার সিঁড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর আশ্চর্য! দুঃখকষ্টের মধ্যে থেকেও আদিত্য সুন্দর

স্বচ্ছল ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখছে এখনও। আদিত্য যখন স্বপ্ন দেখার স্বাধীনতা কেউ কেড়ে নিতে পারে না বলছিল, তখন অমরনাথের মনে হয়েছে ও পারে, এখনও পারে হাজার হাজার মানুষকে খালি গলায় গান শুনিয়ে মুগ্ধ করতে।

আদিত্য চা নিয়ে এসে বলল, 'খেয়ে দেখ। কী রকম হয়েছে বল?'

অমরনাথ সুরুৎ করে এক চুমুক টেনে নিয়ে বলল, 'বেড়ে বানিয়েছিস।'

দুলে দুলে হাসছিল আদিত্য। বলল, 'কুসুম এলে বলিস। কতদিন জুৎ করে চা খাইয়েছি, কিছুতেই কুসুম ভাল বলে না।'

অমরনাথ টান টান চোখে চেয়ে বলল, 'কুসুমের সঙ্গে ব্যাপারটা কী করে ঘটল রে?'

'তা কি আমিই জানতাম। ওই সোমেনটাই তো এসবের মূলে।'

'সোমেন?' একটু অবাক চোখে চেয়ে থেকে বলল, 'সেদিনের পর থেকে ওর সঙ্গে তো তার কোন সম্পর্কই ছিল না। কী বলছিস তুই?' একটু যেন অসহিষ্ণু হয়ে পড়ল অমরনাথ।

ধীর গলায় উত্তর দিল আদিত্য, 'রেস আর জুয়াতে ওর বাবা সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। বাড়িটা বেচা ছাড়া কোন পথই ছিল না। ওর বাবা শেষ বয়সে দত্তপুকুরে মাস্টারী নিয়ে চলে গেল। সোমেন গেল না। বাড়িটার মায়া ও ছাড়তে পারেনি এখনও। একডালিয়ায় ও পিসির কাছে চলে গিয়েছিল। কুসুমকে সরাসরি বলেছিল, 'কুসুমের সঙ্গে ওর ভীষণ দরকার। ওকে চিনতো বলেই কুসুম ভয় পায়নি। আমার কথা সব ওকে বলেছিল।' এই পর্যন্ত বলেই হাসতে হাসতে আদিত্য বলল, 'এর পরের যা কিছু তুই ওর কাছে থেকে শুনে নিস।'

সিগারেটের পর সিগারেট খাচ্ছিল অমরনাথ। জিজ্ঞেস করল, 'সোমেন এখন কী করছে, কিছু জানিস?'

আদিত্যর মুখ কষ্টে ফ্যাকাশে হয়ে গেল মুহূর্তে। বলল, 'বড়লোক পিসি ওকে একটা মার্চেন্ট ফার্মে ঢুকিয়ে দিল, রোজগারের সব টাকা জুয়া, রেস আর খারাপ মেয়েছেলের পেছনে ব্যয় করে। আর ওর বাবা জমিদারী মেজাজ রাখতে গিয়ে প্রতি মাসে মাইনে পেয়ে সহকর্মীদের খাওয়ায়। পি এফ থেকে ধার করে, অ্যাডভান্স নিয়ে মাস চালায়।'

দুঃখ কী, কষ্ট কী অনেকদিন পর টের পেল অমরনাথ। সোমেন আর তার বাবার জন্য দুঃখে মনটা ছেয়ে গেল। পালছেঁড়া নৌকোর মত ওরা ভেসে চলেছে, কোনদিন কী ওরা নিশ্চিন্ত তীর খুঁজে পাবে? ভাবল অমরনাথ।

কুসুম এল। চড়া রোদে মুখটা টকটকে লাল। ফেরার পথে বাজার করে এনেছে।

আদিত্য কুসুমকে লক্ষ করে বলল, 'মাংস এনেছো?'

অমরনাথ বলল, 'ফের এসব করতে গেলেন কেন? বাড়িতে যা ছিল তাতেই তো চলতো।'

কুসুম হেসে বলল, 'আপনার বন্ধুটি বাজারমুখো হয় কোনদিন? শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুখ মুছে বলল, 'এবার একটু চা খাই, কী রাজী?'

আদিত্য অমনি বলল, 'আমরা একবার করে খেয়েছি। তুমি বরং অমরনাথের সঙ্গে বসে গল্প করো, আমি চা করে আনছি।'

কুসুম স্নিগ্ধ হেসে বলল, 'বেশ তো করনা। তবে চা একটু বেশিক্ষণ ভিজিও।'

আদিত্য যেতে যেতে বলল, 'তোরা গল্প কর, আমি আসছি।'

অমরনাথ কুসুমের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, 'আমাদের কখনও দেখতে ইচ্ছে হয়নি আপনার?'

'হ্যাঁ, খুব ইচ্ছে হ'ত। কিন্তু কী জানেন', একটু থেমে সময় নিয়ে বলল, 'ও ভীষণ ছেলেমানুষ। আমার বাবার সঙ্গে ওর ভীষণ মিল। এককালে কী নামই না ছিল আমার বাবার। এখনকার কেউ বাবার যে নাটকের জগতে কোন অবদান আছে স্বীকারই করতে চায় না। বাবা এখন পঙ্গু। বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারেন না। নিজের লেখা নাটকের এক একটা অংশ শুয়ে শুয়ে আবৃত্তি করেন। আর আপনার বন্ধুটি! কারো সঙ্গে মেশে না। যেটুকু সময় পায়, ওইসব বইপত্রের মধ্যে ডুবে থাকে। মাঝে মাঝে আমাকে বোঝায়, কেন আমরা এখনও পিছিয়ে আছি। বলে কী জানেন, এমন একদিন আসবে যেদিন এদেশে একটা লোকও না খেয়ে মরবে না, সকলেই পাবে মাথা গোঁজার ঠাঁই। এসব শুনতে শুনতে আমারও বিশ্বাস জন্মেছে, হবে, সব হবে। সুন্দর, ঝলমলে একটা স্বপ্নময় দেশ নিশ্চয়ই গড়ে উঠবে। তাই ওকে সংসারের কোন কাজে টেনে আনি না। কোথায় কোনদিন কীভাবে ও কত মানুষের সামনে গান গেয়েছিল, কীভাবে বক্তৃতা করতো সব আমাকে শুনিয়েছে। বলে কী জানেন, ভিকট্রি স্ট্যান্ডে সকলেই উঠতে পারে না, প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়াই বড় কথা।'

অমরনাথ মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনছিল কুসুমের কথা। চা খেল, দুপুরের খাওয়া শেষ করে গল্প করতে করতে সময় পার হয়ে গেল। ফের আসবে কথা দিয়ে অমরনাথ চলে গেল।

কিছুতেই ঘুমোতে পারছিল না অমরনাথ। অলকানন্দা বিভোর ঘুমে আচ্ছন্ন। অস্পষ্ট আলো আঁধারির মাঝে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে। আদিত্যর স্বপ্নের সুন্দর সমৃদ্ধ ভারতবর্ষে আর একজন নতুন মানুষ আসছে। ভরাট আত্মবিশ্বাস আর ঋজু মেরুদণ্ড নিয়ে জন্মাবে ওরা। ঠিক সেই সময় শুনতে পেল অমরনাথ, 'মা-মাগো, দুদিন খাইনি মা, কিছু খেতে দাও।' বুকের ভেতরটা হঠাৎই কেঁপে উঠল অমরনাথের। জানালা বন্ধ করতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিল। ভাবল, এই ভালো, খোলা থাক সব। ভাবনাটা ওকে মুহূর্তেই আলোকিত করে তুলল।

দশ বছর পর

ট্রাম রাস্তার দিকে এগোতে গিয়েই মাধব হাঙ্গামা হুজ্জুতের গন্ধ টের পেল। মুহূর্তেই নিজেকে আড়াল করে নিয়ে বাঁ পাশের গলিতে সেঁধোয়। অভ্যেসটা এখনও নষ্ট করেনি। পুলিশের খাতায় নাম আছে, জেলও খেটেছে বেশ কয়েক বছর। ও জানে ঘুরপথে বড় রাস্তায় যেতে একটু সময় লাগে। তা লাগুক। ওসব ঝুট ঝামেলায় মাধব আর নেই। ছেলে বউ নিয়ে বেশ সুখী সংসার গড়ে তুলেছে ও। এখন আর সেদিন নেই। হাঙ্গামা হুজ্জুতির গন্ধ পেলেই সাট্ করে হাজির হয়ে যেত। মতলব আর কী! কোন একটা দলে ভিড়ে গিয়ে কাজ হাসিল করা। পার্টিগুলোর তখন খুব রবরবা। কোন দলের পাল্লা ভারী সেটা বুঝতে এতটুকু সময় লাগত না মাধবের। গলার শির ফুলিয়ে হাউইয়ের মত হুস হুস করে পাল্লা ভারি দলের শ্লোগান আউড়ে মওকা বুঝে ঢুকে পড়তো। যে পার্টিতে বকুলদা অদ্ভুত কায়দায় গরিব দুঃখীর কথা বলতো, বড়লোকদের বজ্জাতির মুখোশ খুলে দিত, আশ্চর্য কৌশলে সেই পার্টিতেই সেঁধিয়ে গিয়েছিল মাধব। সবাই হাততালি দিত। আশ্চর্য ও একদিন টের পেল ও বকুলদার পার্টির লোকজনদের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

এখন মাঝে মাঝেই এসব মনে পড়ে যায় মাধবের। আর তখনই কেমন শ্লথ হয়ে যায় ওর সবকিছু। কাজ করতে করতে চুপচাপ হয়ে ভাবে এসব, আর পথ চলার সময় মনে পড়লে নির্জীবের মত এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে আর ফ্যাকাশে চোখে আশপাশটা দেখে নেয়। মাধবকে এ অঞ্চলে কেউ-ই চেনে না বলতে গেলে। মধ্য কলকাতা ছেড়ে ও আজ সাত-আট বছর হল পুঁটিয়ারীতে বাসা করেছে। বন্ডেলরোডের একটা কারখানায় কাজও জুটিয়ে নিযেছে বছর সাত হল। কামাই না হলে শ'চারেক টাকা মাইনে পায়। আর ওভার টাইম থাকলে বাড়তি রোজগার হয় ত্রিশ-চল্লিশ টাকা। খাটুনি খুব। তবে ইজ্জত আছে। মেধো গুণ্ডাকে এ অঞ্চলে কেউ-ই চেনে না। ছেলে স্কুলে পড়ছে। বউ লতার মধ্যে এখন সুখী সুখী ভাব। গায়ে গতরে বেশ শাঁসালো হয়েছে, জর্দা পান খাওয়ার অভ্যেস করে ফেলেছে ও। বেশ লাগে পানের রসে টসটসে ঠোঁট দুটো দেখতে লতার।

বড় রাস্তায় এসেই ও একটা ট্রাম পেয়ে যায়। সেকেন্ডক্লাসের একটা সিটে বসে মাধব বড় করে হাই তোলে। জানালা দিয়ে চোখ বের করে দেখে ঘন কুয়াশায় ছেয়ে আছে চারদিক। মনে পড়ে এরকম আবহাওয়ায় আগের দিন হলে চুল্লু খেয়ে শরীরের ঝিমোন রক্তকে চনমনে করে তুলতো। পেটো নিয়ে হ্যা হ্যা তেড়ে যেত। দশ বারো জনকে তো ও জন্মের মত শেষ করে ছেড়েছে। তখন এসবের কোন দোষ ছিল না। ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করা কী সহজ ব্যাপার। বকুলদারাও কিছু বলতো না, বরং একটু প্রশ্রয়ই দিত। টাকা কড়ি চাইলে না করতো না কেউ। বকুলদার কথা স্পষ্ট

শুনতে পেল এ সময়। বকুলদা বলতো কাপুরুষের মত লেজ গুটিয়ে থাকলে ওরা দিন দিন আমাদের জীবন, মা-বোনের ইজ্জত, সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন করে তুলবে। গর্জে উঠুন। দিকে দিকে শ্রমিক-কৃষক ঐক্য ছড়িয়ে পড়ুক। সাধারণ মানুষকে বোঝানোর সময় হয়েছে। ওদের বোঝাতে হবে, ওরা বিচ্ছিন্ন নয়, আমরাও ওদের পেছনে আছি।

কন্ডাক্টর টিকিট চাইতেই চটকা ভাঙল মাধবের। উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের পকেট থেকে খুচরো পয়সা বের করে কন্ডাক্টরকে দিয়ে ফের চুপ করে বসে থাকে।

সকাল বলেই বুঝি হু-হু করে এগিয়ে যাচ্ছে ট্রামটা। বড় করে শ্বাস নিয়ে চুপচাপ যেমন ছিল বসে রইল। কিন্তু কী হল, অনেককাল পর পেছনের একটা দিনের কথা মনে পড়ে গেল ওর।

বকুলদা ইলেকশানে জিতেছে বহু ভোটে। কী বিশাল মিছিলই না বেরিয়েছিল সেদিন বকুলদাকে নিয়ে। ওর পাশেই দাঁড়িয়েছিল মাধব। খোলা জিপে দাঁড়িয়ে বকুলদা সকলকে হাত জোড় করে নমস্কার করছিল। ভিড়ের ভেতর থেকে কত লোক মালা পরিয়ে দিচ্ছিল বকুলদাকে। সেই বকুলদা মিনিস্টার হবে শুনে লোকাল কমিটিতে সে কী উৎসব। উৎসব শেষ হয়ে গেলে মাধব বকুলদাকে বলেছিল, 'বকুলদা, আমার একটা হিল্লে হবে তো?'

'হবে হবে। মন দিয়ে কাজ করে যা, সব হবে'।

মাধব কুণ্ঠিত গলায় বলেছিল, 'গাড়ি বাড়ি কিছুই চাই না, শুধু একটা চাকরি জোগাড় করে দিন।' বকুলদা আড় চোখে মাধবকে লক্ষ করে বলেছিল, 'আমরা তো ওদের মতন নেপোটিজম করতে পারবো না মাধব। তোর নামে লোকাল কমিটিতে অনেক অ্যালিগেশান আছে।'

'কী আছে?' উৎসুক চোখে মাধব কথা ক'টি বলে তাকিয়েছিল।

'অ্যালিগেশান। এতদিন পার্টিতে থেকে এও বুঝলি না। তোর নামে অনেক কমপ্লেন আছে। নালিশ বুঝলি, নালিশ।'

'তার মানে?'

বিস্ময়ের গলা করে বলেছিল বকুলদা, 'নালিশ মানে কী তাও কী বুঝিয়ে বলতে হবে?' মাধব হাঁ হয়ে গিয়েছিল। কেননা ও বুঝতেই পারেনি যে, মাধব দত্তের নামে কেউ নালিশ করতে পারে, রাগে মাথা গরম হয়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিয়ে মাধব বলেছিল, বাংলা মাল আমি ছেড়ে দেব; এই আমি আপনার গা ছুঁয়ে বলছি। আর কখনও বেসামাল দেখলে জুতোপেটা করে তাড়িয়ে দেবেন। বয়স বাড়ছে বকুলদা। আর কতদিন মস্তানি করবো। টাকা না হলে, না খেয়ে মরবো বাড়ি শুদ্ধু সব ক'জন।'

বকুলদা ব্যস্ততার সঙ্গে বলেছিল, 'সেসব পরে হবে। এখন তুই যা আমার অনেক কাজ। দুটোয় পার্টি মিটিং আছে; তুইও যাস।' পার্টি মিটিং-এ সাধন মিত্তির প্রথমেই বলল, 'নোংরামি যেমন ওরা করেছে, আমরা সেসব করতে পারি না। সাধারণ মানুষের মধ্যে আমাদের আদর্শ যত বেশি ছড়িয়ে দেয়া যাবে ততই মঙ্গল। তাছাড়াও এখন থেকে পার্টির সবকিছু স্ক্রিনিং করতে হবে। সমাজবিরোধী ওরা পুষতে পারে, আমরা পারি না।'

রমেন ঘোষ বলেছিল, 'তার মানে আমাদের পার্টিতেও সমাজবিরোধী রয়েছে? আমি প্রস্তাব

করছি, ওদের নাম এক্ষুনি কেউ উত্থাপন করুক। তারপর আমরা ঠিকমত সিদ্ধান্তে আসতে পারবো।'

মুরারি সেন যেন ওঁৎ পেতেছিল ওর কথায়। বলেছিল, 'এই নামের লিস্ট আমি আপনাকে দিচ্ছি, পড়ে শোনান।'

রমেন ঘোষ চোখে চশমা এঁটে এক এক করে যে নামগুলো পড়ে গেল, তার মধ্যে মাধবের নামও রয়েছে। মাধবের দিকে তাকিয়ে রমেন ঘোষ বলেছিল, 'এর বিরুদ্ধে আপনার যদি কিছু বক্তব্য থাকে তো জানাতে পারেন।'

মাথা হেঁট করে ছিল মাধব কিছুক্ষণ, উত্তরে বলেছিল, 'আমি যে মাল খাই এটা কিন্তু আপনারা সকলেই জানতেন। আগে এ নিয়ে আলোচনা হয়নি কেন?'

'তার কারণ আমরা তখন নানান ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলাম। এখন আমাদের হাতে মিনিস্ট্রি। এখন আমরা চাই সুস্থ সুন্দর সমাজ গড়তে।' বকুলদা উত্তরে বলেছিল কথাগুলো।

মাধব এতটুকু দ্বিধা না করে উত্তর দিয়েছিল, আমি তো বকুলদাকে বলেছি, 'ওসব আমি আর ছোঁব না। আমার একটা চাকরি না হলেই নয়।'

বুড়োদা বলেছিল, 'তা কী করে সম্ভব মাধব। পুলিশের খাতায় তোমার নামে নানান ধরনের কমপ্লেন আছে। আর্সন, লুটিং, রেপ, মার্ডার'।

মাধব উত্তরে বলেছিল, 'স্বীকার করছি মার্ডার করেছি। সে সবই আপনারা জানতেন। রেপ যদি করে থাকি তো আমি বেজন্মার বাচ্চা। বুঝেছি আপনারা আমাকে পার্টি থেকে তাড়াচ্ছেন, বলেই উঠে দাঁড়িয়ে সক্রোধ ঘৃণায় সকলের দিকে চেয়ে ফের বলেছিল মাধব, 'কাজ ফুরিয়েছে, আর আমি শালা মাধব দত্ত সমাজবিরোধী হয়ে গেলাম। বাঃ বকুলদা, বাঃ। বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল মাধব।

কিন্তু বেরোতে গিয়েই টের পেয়েছিল ওকে ঘিরে ফেলেছে অনেক সাদা পোশাকের পুলিশ। মুক্তি নেই জেনে বিনা প্রতিরোধে ধরা দিয়েছিল মাধব সেদিন।

চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল মাধবের। আশ্চর্য হল আরও বেশি, যখন শুনলো, ও যাদের বিরুদ্ধে এতদিন নির্মম ছিল, সেই পার্টিরই গুণ্ডা সাজিয়ে ওকে ধরা হয়েছে। এবং দীর্ঘ কয়েক বছরের খুন, জখম, রাহাজানির ব্যাপারে ওকেই জড়ান হয়েছিল বেশি করে। আর কী। পুরো তিনটে বছর স্রেফ গ্যারেজ করেছিল বকুলদা এ্যান্ড পার্টি।

গতরাতে ভাল ঘুম হয়নি, ছেলেটা ক'দিন ধরে জ্বরে কাতরাচ্ছে। লতার শরীরও ভাল যাচ্ছে না। সুভাষ ডাক্তারের কৃপায় তবু যা হোক ওষুধ পড়ছে। মানুষটা ভাল। দয়া মায়ার শরীর। রোজগারপাতির খোঁজ খবর করে ফ্রি ওষুধও দিয়ে দেয়। ভাবা যায় না। এমন হারামি সময়ে সুভাষ ডাক্তারের মত লোক এখনও আছে, এ প্রায় ভাবাই যায় না। ট্রামটা একটা স্টপে দাঁড়াতেই হুড়মুড় করে বেশ কিছু লোক উঠে পড়ে। লোকগুলোর দিকে এক পলকে চোখ বুলিয়ে নিতে গিয়েই হঠাৎ সারা শরীরের রক্ত হিম হয়ে যায় মাধবের। বুকের মাঝে হাঁপড়ের টান অনুভব করে। গলা

শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় মুহূর্তে। টের পায় নাট্‌কাও এ-ট্রামে উঠেছে। ওর এককালের টপ রাইভাল। নাটকার দাড়ি গোঁফে ঢাকা মুখটা আর কেউ না হোক মাধব চিনেছে ঠিকই। ওর টুনি বাঘের মত চোখ ঢ্যাং ঢ্যাংয়ে চেহারাটা অনেকটা কুঁজো হয়ে গেছে বলে মনে হল মাধবের। জামা কাপড় নোংরা। চেহারাতে সেই জৌলুস নেই। কী মনে করে প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাল মাধব। লাইন ছাড়লে কী হবে টিপছুরি এখনও সঙ্গে রাখে। কতজন যে এখনও চটে আছে, কত শত্রু যে এখনও ঘাপটি মেরে রয়েছে কে জানে। সাবধানের মার নেই ভেবেই ছুরি রাখে মাধব। মানুষ খুন করার কথা বলতো না নাটকা। বলতো মুরগী জবাই। এটা হচ্ছে, কাউকে পাড়া থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে খাঁ খাঁ মাঠের মধ্যে নিয়ে ধারাল ছুরি দিয়ে গলা কেটে ফেলে রাখা। ভোম্‌লাটাকে ও-ই খুন করেছিল। এটা সকলেই জানতো। জানতো না শুধু পুলিশ। সব শেষ হয়ে গেলে পুলিশের গাড়ি স্পটে গিয়ে হাজির হত। তারপর লোক দেখান কত ঢং-য়ে গোয়েন্দাগিরি, দু'চার দিন একে-ওকে ধরে বেধড়ক পিটিয়ে ছেলেগুলোর বাপ-মার কাছ থেকে মোটা দাঁও মারত পুলিশ।

গলা উচিয়ে নাট্‌কাকে দেখল মাধব। হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ নিরীহ মানুষের মত। আর কেউ না জানুক, মাধব জানে, নাট্‌কা কী ফেরোসাস। সাধে কী আর বুকের রক্ত হিম হয়ে যায় মাধবের এখনও। ও দেখলো, নাট্‌কা জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। হেঁপো রুগীর মত দেখাচ্ছে ওকে।

কী মনে করে মাধব উঠে গিয়ে ভিড় ঠেলে নাট্‌কার গা ঘেঁষে দাঁড়াল, নাট্‌কা টেরও পেল না। নাট্‌কার আপাদমস্তক এক মুহূর্তে দেখে নিয়ে, মাধব বুঝলো, নাট্‌কা অসুস্থ। ধীর গলায় আর কেউ শুনতে না পায় এমন ভঙ্গিতে নাট্‌কার নাম ধরে ডাকল মাধব।

ফ্যাকাশে চোখে চাইল নাট্‌কা। মাধবকে দেখে হেসে ফেলল। বলল, 'তুই!'

মাধব দেখে, নাট্‌কা দুটো হাত দিয়েই হ্যান্ডেল ধরে আছে। সুতরাং নিজেও সহজ হয়ে গেল মুহূর্তে। বলে, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'হাসপাতাল।'

'কেন?'

খুক খুক করে কাশল নাট্‌কা। বলে, 'হাসপাতালে কেন যায় জানিস না?'

'জানব না কেন? তোর অসুখ না অন্য কারও?' মাধব জিজ্ঞেস করল।

ম্লান হাসল নাট্‌কা। বলে, 'সে শুনে তোর কী হবে?'

মাধব কিছু বলল না। স্থির চোখে ওর মুখের দিয়ে চেয়ে রইল।

টুনি বাঘের মত চোখ দুটো অনেককাল পর জ্বলে উঠলো নাট্‌কার। বলে, 'পুঁটিয়ারিতে ঠেক গড়েছিস জানি। বিয়ে করেছিস। বউ-বাচ্চা নিয়ে ভালই আছিস, সব জানি।'

ভীষণ শীত করে উঠল মাধবের, অবাক হয়ে ভাবল, এসব জানল কী করে নাট্‌কা। আর জানলই যদি তো ফয়সালা করতে চায়নি কেন এতদিন? কেমন ধাঁধায় পড়ে গেল মাধব।

আগের মত গলা করেই মাধব বলে, 'অনেকদিন হল তাই না রে নাট্‌কা!'

'হ্যাঁ, তা প্রায় দশ বছর।'

দশ বছর কত তাড়াতাড়ি পার হয়ে গেল। মাধব আরও অবাক হয়ে ভাবল, সময়ের হিসেবটা ও একদমই করেনি বলে। আর কী আশ্চর্য নাট্‌কা সময় গুনে গেছে ঠিক ঠিক।

মাধবের গলা ভীষণ ভারী হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'বললি না তো কার অসুখ?'

'আমার।'

ঠিক সে সময় একজন লোক ওদের দুজনকে ঠেলে জায়গা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মাধব তিরিক্ষি মেজাজে বলে উঠল, 'অসুস্থ লোক দেখতে পাচ্ছেন না?'

'অসুস্থ? সে কী মশাই?' লোকটার গলায় ব্যঙ্গ।

নাট্‌কা কী বুঝে মাধবের হাত চেপে ধরে চাপা গলায় বলল, 'চেপে যা মেধো।' বলেই হাঁপাতে লাগল।

মেধো ডাকটা অনেককাল পর শুনলো ও। বুকেব ভেতরের ঝিমোন রক্ত ফের কী টগবগ করে উঠবে নাকি? পাইপগান আর পেটো নিয়ে যেমন এক কালে পাড়াকে পাড়া অস্থির করে তুলতো, সে রকম চেহারা দেখতে ইচ্ছে হলেও টের পেল মাধব, আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল অনেক বেরিয়ে গেছে। আর যা যায় তা যায়ই। একে ঠেকিয়ে রাখার সাধ্য এখন আর ওদের নেই। এককালের টগবগে আরবী ঘোড়াই এখন হাড় গিলগিলে টাট্টু হয়ে গেছে, সপাং সপাং করে পড়ছে গাড়োয়ানের চাবুক। এপাশ-ওপাশ করে মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বের করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। বুকের ভেতরে চাপ ব্যথা টের পেল মাধব।

নাট্‌কার কথা মতন নিজেকে সামলে নিয়ে মাধব বলল, 'আজ আর কাজে যাব না। তোর সঙ্গে হাসপাতাল যাব।'

চোখ দুটো ভীষণ উজ্জ্বল হয়ে উঠল নাট্‌কার। বলল, 'সত্যি যাবি?'

'কেন? যেতে পারি না নাকি? আমরা কী শালা বকুলদা, প্রীতমদার মত? মুখোশ এঁটে সব সময় দু'নম্বরী কাজ করে। নেমে আয় নাট্‌কা। তোকে আমি সুভাষ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। দেখবি, এখনও দু'চারজন খাঁটি মানুষ আছে। হাসপাতালগুলো শ্মশানের থেকেও খারাপ। ডাক্তারগুলো হয়েছে টাকা রোজগারের মেশিন। দয়ামায়ার লেশমাত্র নেই।' একটানা কথাগুলো বলল মাধব।

কোন আপত্তি করলো না নাট্‌কা। কেমন যেন ভাল লাগার নেশায় পেয়ে বসলো ওকে। রাস্তায় নেমেই মাধব জিজ্ঞেস করলো, 'চা খাবি তো?' মুখ চেপে হেসে পলিথিনে মোড়া টিফিন বাক্সটা দেখিয়ে বলল, 'আজ তুই আমার বউয়ের করা রুটি আর আলুভাজা খাবি।'

সে কথায় না হেসে পারে না নাট্‌কা। বলে, 'বড্ড বউ দেখাচ্ছিস! তোর কপাল ভাল বউ জুটেছে। আমার মাইরী তোর মতন কোন পিছুটান নেই। কেউই ভাবে না আমাকে। আমিই বা কার জন্য ভাবব। অসুখ না করলে আর এক রাউন্ড লড়ে যেতাম। শিবে দত্ত এখন পাত্তাই দেয় না। তেঁয়েটে খচ্চর। মুখে বড়কা বড়কা বুলি। ক্ষমতায় ছিল যখন তখন এধার-ওধার লুটে পুটে খেয়েছে। যা কামাই করেছে তাতে তিন পুরুষ স্রেফ মাল খেয়ে আর মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি করতে পারবে। দু'দুবার ও শালার লাইফ সেভ করেছি। এখন আমাকে দেখলেই 'দিল্লি থেকে ফিরে আসি তারপর হবে' এমন সব কথা কপচায়।

ওর সব কথা মাধবের কানে ঠিক ঠিক পৌঁছুচ্ছিল না। নাট্কাকে দেখে ভয় পাওয়ার কথা মনে হতেই শব্দ করে না হেসে পারল না।

নাট্কা জিজ্ঞেস করলো, 'কী রে হাসছিস কেন?'

হাসি থামতে চায় না মাধবের। নাট্কার একটা হাত চেপে ধরে হাসতে হাসতে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে ঢোকে। দু'একজন লোক এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। সেয়ানা চোখে সব কিছু দেখে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বসে বলে, 'কেন হাসছি জানিস?'

'কেন হাসছিস বল না।'

'তোকে দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল মাইরী!'

'কেন?'

'তোর আমার এমন দস্তি হবে, তা কী কখনও ভেবেছি। বাগমারীর ঝামেলার কথা তোর মনে আছে? কী বলেছিলি সেদিন?' মাধব জিজ্ঞেস করলো।

নাট্কা সুদুর অতীতে চলে গেল যেন। ভুরু কুঁচকে সামান্য চিন্তা করে নিয়ে হো হো করে হেসে বলে, 'সেসব মনে রেখেছিস নাকি এখনও?'

'মনে রাখিনি। তবে মাঝে মাঝে এসব মনে পড়ে যায়। ভুলতে পারলে ভালই হতো।' মাধব উত্তর দিল।

নাট্কা গম্ভীর হয়ে বলে, 'আমি সব ভুলে গেছি, কী লাভ? তোকে তো জেল খাটাল তোর দলের লোকরাই। সব খবব আছে আমাব। তোর বকুলদার এখন ফুটুনি দেখে কে। অ্যায়সা ভুঁড়ি বাগিয়েছে। ডান হাতে পারমিট, বাঁ-হাতে ক্যাশ ঝাড়ছে। কী খাওয়াবি খাওয়া।' বলেই মাধবের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলে, 'ফুলবাগানে ভাগ্যের জোরে বেঁচে গিয়েছিলাম সেবার। এক চুলের জন্য তোর টিপ ফসকে গিয়েছিল।' বড় করে হাই তুলেই বলে, 'কেন যে ফসকালো।' ছোট্ট ক'টি কথা। বুকের ভেতরে খাঁ খাঁ শূন্যতা মাধবের। নাট্কার কথাগুলো কেমন হাহাকারের মত শোনাল। কষ্ট হলেও মজা করতে ইচ্ছে হল মাধবের। বলে, 'তা ঠিক, না ফসকালে তুই শালা শহীদ হয়ে যেতিস। ফি বছর একটা দিন ধুমধাড়ক্কা করে শহীদ দিবস পালন কবতো তোব দল। সাচ্চা আদমী একটাও নেই। সব দু'নম্বরী।'

নাট্কা এবার মাধবের টিফিন বাক্স খুলে আলুভাজা মুখে দিয়ে বলল, 'ফাস ক্লাস'। বেয়ারা এসে দাঁড়াতেই অমলেট আর চায়ের অর্ডার করলো মাধব।

নাট্কা আলুভাজা চিবোতে চিবোতে বলে, 'তোদের লীডারদের ব্রেন আমাদের থেকে ভাল। নিজেরাই তোরা নিজেদের প্রশেশনে বোমা মেরে সেবার আমাদের পার্টি অফিসে হামলা চালালি। যাক গে, পাড়া আমিও ছেড়েছি। এখন উঠতি রঙবাজে ছেযে গেছে সব পাড়া।' বেয়ারা চা দিয়ে গেল। খাবারে হামলে পড়ল নাট্কা। দেখতে দেখতে প্লেট খালি করে বলে, আমার কী অসুখ জানিস?'

'কী অসুখ?'

'কিডনিটা গেছে। তার ওপর কাশিতে রক্ত ওঠে। টি বি, জানিস মেধো, কাশতে কাশতে যখন

রক্ত বেরোয়, তখন কী বলবো, ভীষণ ভয় হয়, বাংলা খেয়ে কত মুরগী জবাই করেছি। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোত যখন, তখন খুব মজা লাগত। এখন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় প্রায়ই। সেইসব লোকগুলোর চোখ মুখ এক এক করে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ওদের কান্নার শব্দ, গলার আওয়াজ এখনও আমি শুনতে পাই। কী করলাম! কেন যে বেঁচে আছি জানি না। মরতে চলেছি, তবু ভাবি আর কটাদিন বাঁচি না কেন? বউ-বাচ্চা থাকলে তোর মতন আমিও টিফিন নিয়ে কাজে যেতুম। হল না। কিছু হল না মেধো। মাঝখান থেকে নাট্‌কা মাস্তান হয়ে গেলাম। এক সময় ডাক্তারগুলো নেড়ী কুত্তার মত লেজ নাড়তো, আর এখন মুখ খিঁচোয়, গালাগাল দেয়।'

মাধব জিজ্ঞেস করলো, 'শিবে দত্ত জানে তোর হালচাল?'

'বয়ে গেছে ওর আমাদের কথা জানতে। বেঁচে উঠলে এক হাত নেব। এ আমি বলে দিচ্ছি। একটু থেমে করুণ গলা করে বলে, 'আমাকে বাঁচিয়ে তোল মেধো। শেষ বদলাটা আমাকে নিতে দে।'

মাধব গম্ভীর মুখ করে বলে, 'বদলাটা কার ওপর নিবি? ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবি কেন? বাঁচতেই হবে তোকে। মরবি কোন দুঃখে।'

নাট্‌কা ম্লান হেসে উত্তর দেয়, 'মরতে চাই না বলেই তো হাসপাতালে যাচ্ছি। হ্যাঁরে বামাল পকেটে রাখিস কেন এখনও?'

মাধব উত্তর দেয়, 'অভ্যেস বলতে পারিস। মাঝে মাঝে মনে হয়, কেউ না কেউ আমাকে চিনে ফেলেছে। কী জানি কে কখন পেছন থেকে '

কথা শেষ করতে দিল না নাট্‌কা, বলে, 'তা করলেও তো বাঁচতাম'। কী মনে করে বলে, 'তোর ছেলের বয়স কত রে?'

'ছ'য়ে পড়েছে।'

'বাপ বলে?'

হেসে উত্তর দেয় মাধব, 'হাঁ'। বলেই গম্ভীর হয়ে গেল মাধব। বলে, 'তুই আমার বাড়ি চ নাট্‌কা। জানিস মাঝে মাঝে মনে হয় যদি আমাকে কেউ চোরা গোপ্তা খুন করে তো বউটা বিধবা হবে; ছেলেটা ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াবে। বড় ভয় হয়। আমি না থাকলে হয়তো ছেলেটা একদিন আর একটা মেধো হয়ে যাবে।'

নাট্‌কা বুঝল সুতীক্ষ্ণকাঁটার ওপরে ও একাই শুধু নয়, আরও অনেকেই রয়েছে। কে যে কীভাবে ছিটকে পড়েছে কিছুই জানার উৎসাহ ছিল না ওর। আজ মাধবের সঙ্গে দেখা হতেই পরিচিত হারিয়ে যাওয়া মুখগুলো বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। জীবনের জটিল গলিঘুঁজি দিয়ে অনেক কিছুই তো দেখা হয়ে গেল। ভুলে যাবার চেষ্টায় সফল হয়ে পড়েওছিল। কিন্তু আকস্মিকভাবে মাধবের সঙ্গে দেখা হতেই সকলের জন্য কাঙাল হয়ে উঠলো ও। জিজ্ঞেস করলো, 'নোনা, গোবরা, পিন্টু আর ছেনোর কোন খবর জানিস?'

মাধব বলল, 'নাহ্। কিছুই জানি না।'

শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল নাট্‌কা।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে মাধব বলে, 'চ আমার বাড়ি।'

নাট্‌কা হেসে বলে, 'আমার কথা কী বলবি তোর বউকে?'

'গেলেই জানতে পাবি।'

নাট্‌কা বলে, 'হাসপাতালে গেলে বুকের ছবিটা তুলতে পারতাম। না গেলে ফের কবে যে তারিখ পাব জানি না।'

মাধব আকাশের দিকে মুখ করে দেখে, মেঘলা ভাবটা ক্রমশ সরে যাচ্ছে। হিম হাওয়া গায়ে লাগলেও রোদ্দুর এসময় ভালই লাগছিল। বিড়ি ধরিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বের করলো মাধব।

নাট্‌কা বলে, 'কোন নেশা করিনি বল? আর এখন এসব দেখলে ভীষণ ভয় হয়। বাঁচতে বড় ভাল লাগে।' হঠাৎ মাধবের হাত জড়িয়ে ধরে বলে, 'তুই কি ছিলি তোর বউ কী তা জানে? যদি না জানে, জানাসনি। আমার কথা যা ইচ্ছে বলতে পারিস। হ্যাঁরে সুভাষ ডাক্তার সত্যিই কী আমার কোন উপকার করবে?'

'হ্যাঁ রে হ্যাঁ। মানুষটা অন্য ধাতের। গিয়েই দেখনা, লোকটা কেমন।'

নাট্‌কা গম্ভীর হয়ে বলে, 'একটা দিনের কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। একজন ছাপোষা লোককে মানিকতলা ব্রিজের ওপর খুন করেছিলাম। লোকটা বউয়ের জন্য ওষুধ নিয়ে যাচ্ছিল। ভেবেছিলাম, লোকটা খোঁচর পার্টির কেউ। মরার আগে লোকটা বলছিল...

'ভ্যানতারা ছাড়তো', মাধব সরাসরি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে বলে, 'ওসব যত শিগগির ভুলে যাবি তত শিগগিরই ভাল হয়ে উঠবি।'

উল্টো মুখো একটা ট্রামে চেপে মাধব নাট্‌কাকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে এল। মাধব বাড়ির ভেতরে ঢুকেই জোর গলায় বউ আর ছেলের নাম ধরে হাঁক ডাক শুরু করলো।

লতার পরণে আটপৌরে শাড়ি। মুখটা ঢলঢলে। ছেলেকে সঙ্গে করে বাইরে বেরিয়েই অপরিচিত মানুষ দেখেই মাথায় ঘোমট্যা টেনে দিল। চোখে জিজ্ঞাসা, ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসির রেখা।

মাধব বেশ ঋজু ভঙ্গিতেই বলে উঠলো, 'একে তুমি ভাসুরও ভাবতে পার আবার দেওরও ভাবতে পার। ব্যাটা ছুপা রুস্তম। অপিস যাবার পথে ট্রামে দেখা। দিলাম অপিস ছুটি করে।'

লতা সহাস্যে বলে, 'ভালই করেছ।' নাট্‌কার দিকে চেয়ে বলে, 'ভেতরে আসুন'। নাট্‌কাকে ইতস্তত করতে দেখে হেসে ফেলল মাধব। লতার দিকে চেয়ে বলে, 'নাট্‌কা আমাদের হিরো, ইউনিয়নের লীডার ছিল। ওর বউ অকালে মরে গেছে। তাই সন্নেসী হবে ভেবেছিল। আমি বললাম, পুরুষ মানুষের একটা বউ গেছে তো কী হয়েছে। ফের সাতপাক ঘুরে নে না। ওকথা কানেই তুলছে না। তুমি ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘরমুখো করো।' এবার নাট্‌কার দিকে চেয়ে বলে, 'আসল জায়গায় নিয়ে এসেছি, এবার কোথায় যাস দেখি।' ইচ্ছে করেই বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথাগুলো বলল মাধব। নাট্‌কা বিস্ময়াভিভূত হয়ে চেয়ে রইল ওর দিকে। মুখ দিয়ে কোন কথাই সরছিল না। মাধব নাট্‌কার হাত ধরতেই টের পেল, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে নাট্‌কার। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো, চোখদুটো নাট্‌কার টকটকে লাল। আতঙ্কিত হয়ে বলে ফেলল, 'আরেব্বাস্, তোর গা যে পুড়ে যাচ্ছে রে। আয় আয় ভেতরে আয়।'

তক্তোপোষের ওপর শুইয়ে দিয়ে লতাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তুমি একটু দেখ। আমি ডাক্তার ডেকে আনি।'

নাট্‌কা বারণ করে বলে, 'ঝুট ঝামেলার দরকার কী। তুই বোস। একটু পরেই জ্বর নেমে যাবে। এমনটা রোজই হয়।'

মাধব তবুও শুনল না। ও লতাকে বসিয়ে ডাক্তারের উদ্দেশ্যে বাইরে পা বাড়াল।

দুপুরে মৌরলা মাছের চচ্চড়ি আর রুটি খেয়ে একটু সুস্থ বোধ করল নাট্‌কা। পাশের ঘরে লতা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। আলসের ওপর দু চারটে কাক ডাকছিল। দু'একজন ফিরিওলার হাঁকও শুনতে পেল ওরা।

মাধব ঘন ঘন বিড়ি টানছিল। ধোঁয়ার গন্ধ বুক ভরে নিচ্ছিল নাট্‌কা। লোভ হলেও নিজেকে সামলে নিয়ে নাট্‌কা বলে, 'ওসব ছেড়ে দে মেধো। আমি ঠেকে শিখেছি; তাই বলছি ছাড়।' মাধবের ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল নাট্‌কার কথা বলার ভঙ্গি দেখে। কষ্ট হলেও নিজেকে সহজ করে বলল, 'বড্ড বাজে বকিস তুই। এবার একটু ঘুমো তো।'

নাট্‌কা হাসল সামান্য। বলে, 'তখন অতগুলো মিছে কথা বললি কেন? বললেই পারতিস...'

মাধব উত্তর দিল, 'তুই একটা পয়লা নম্বরের ধূর। আমরা কী ছিলাম সেসব বলতে যাব কেন ওদের, সংসার তো করলি না, কি করে জানবি। কিছু কিছু কথা বউকেও বলতে নেই। এই ধর, তুই আমি দু জনেই বেপাড়ায় যেতাম। সেটা আমরা জানি। এসব বউকে বললে চিরটা কাল হাড়ে দুব্বো ঘাস গজিয়ে ছাড়বে।' বলেই অনাবিল হাসল মাধব। নাট্‌কাও হেসে বলে, 'বেড়ে বলেছিস,' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে নাট্‌কা হঠাৎ মাধবের একটা হাত ধরে বলল, 'আমার একটা কথা রাখবি মেধো?'

মাধব অবাক চোখে ওর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। বুঝল নাট্‌কা কোন একটা যন্ত্রণায় ভুগছে।

মাধব বলল, 'বল, কী বলবি?'

নাট্‌কা সামান্য উঠে বসে বলতে থাকে, 'আগে দরজাটা বন্ধ করে দে।'

মাধব দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে নাট্‌কার পাশে বসে বলে, 'বল কী বলবি?'

নাট্‌কা বলতে থাকে, 'আমি আর বেশি দিন নেইরে। এরকম ভাবে বেঁচে থাকার কোন মানেই হয় না।' লম্বা করে শ্বাস ফেলল নাট্‌কা। দূর মনস্কের মত খানিকক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে রইল। ধরা গলায় বলতে থাকে, 'ভোমলার কথা মনে আছে? ওকে তোদের পার্টির টিকটিকি ভেবে আমিই ওকে খুন করেছি। পরে জানতে পেরেছিলাম, ও সাতে পাঁচে ছিলই না। মাঝখান থেকে ওর মা'র কোল খালি করলাম। দ্যাখ জীবনে অনেক খুন করেছি, আর কারও জন্য এতটা কষ্ট হয় না। ভোমলার জন্য হয়। ওর মা সেই থেকে পাগল হয়ে গেল। যদি পারিস ওর মাকে দেখিস। আর পারলে...

কথা শেষ করতে পারল না নাট্‌কা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে, ভোমলার গলা এখনও আমি শুনতে পাই। ও আমার পায়ে পড়ে কেঁদেছিল। মা-র কথা বলছিল। আর আমি, এই হাত দিয়ে ওর গলাটা...'

দু'চোখে জলের প্লাবন নেমে এল নাট্‌কার।

ওকে শান্ত করে মাধব বলে, 'কেন মিছিমিছি ওসব ভাবিস।' নিজের কপালে হাত রেখে বলে, 'এই চার আঙুলে যা লেখা আছে তাতো হবেই। নে ঘুমো।' নাট্‌কা সহজ হয়ে গেল অনেক। বলে, 'এতদিন কাউকে বলতে পারিনি একথা। আজ তোকে বলতে পেরে অনেক হালকা হয়ে গেলাম। যা, তুইও একটু গড়িয়ে নে।'

মাধব আপত্তি করলো না সে কথায়।

নাট্‌কা শুয়ে শুয়ে ভাবল, আর নয়। অনেক হয়েছে। ধুকপুক করে হৃৎপিণ্ডটাই যা চলছে। আর সব অচল হয়ে গেছে। আর মাধব ক্রমশ সচল হয়ে উঠছে। বউ ছেলে নিয়ে মাধব জীবনের বাকী দিনগুলো সুখে থাক। নিজেই এখন নিজের শরীরের পচা দুর্গন্ধ টের পাচ্ছে। ওয়াক ওঠে নিজেরই। কেন মিছিমিছি মাধবের সাজান গুছোন সুখী জীবনে বিষ ঢেলে যাই।

দেখতে দেখতে বেলা বেড়ে যায়, নাট্‌কা টের পায় মাধব ঘুমে বিভোর। এক ফাঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে বেড়াল পায়ে অনেক অনেক দূরে চলে যায় নাট্‌কা।

ঘুম থেকে উঠে মাধব ঘর খালি দেখে বুঝতে পারে, নাট্‌কা সরে পড়েছে। বুকের গভীরে দুঃসহ এক জ্বালা অনুভব করে মাধব।

ওকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে যায় লতা। দেখে, মাধবের দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে নামছে।

লতা মাধবকে বলে, 'ওর জন্য দুঃখ করো না, দেখো ও ঠিক ভাল হয়ে যাবে।' কথাকটি কানে যেতেই মাধব ডুকরে কেঁদে ওঠে।

পুরনো চিঠি ঃ শেষ চিঠি

অনেক বছর আগেকার পোস্টকার্ড। তখনও বাংলাদেশ হয়নি, পাকিস্তান লেখা থাকতো। পোস্টকার্ড-এর রং বিবর্ণ। তাই বুঝি চিঠির পাহাড়ের ভেতর থেকে ওটাকেই প্রথমে টেনে বের করলো চিত্ত। চিঠিটা যে ওকে উদ্দেশ্য করেই লেখা সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই, তবু লেখকের নাম দেখার জন্য কৌতুহলী হয়ে বড় রকমের ধাক্কা খেল। কেন না, শেষটায় লেখা আছে, 'ইতি তোর আব্দুল মজিদ'। পোস্টকার্ডের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইল, লেখাগুলো ক্রমশই স্পষ্ট থেকে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। দু'চোখই জলে ভর্তি। চিঠির ওপর দু'এক ফোঁটা জলও বুঝি পড়ল। মুহূর্তেই সতর্ক হয়ে ও চোখ মুছে নিল বটে কিন্তু বুকের ভেতরের চাপ ব্যথা কেমন যেন খামচে বসে রইল।

একরাশ চিঠি আর আজেবাজে কাগজের ভেতর ওভাবে চিত্তকে বসে থাকতে দেখে মাধবী প্রথমটায় হতচকিত ও পরে মুখ টিপে হাসল। হঠাৎই চিত্ত মুখ তুলে মাধবীকে ওভাবে হাসতে দেখে বলল, 'এ সবই বংশের ধারা। বাবাও এমনি সব কাগজপত্র জমিয়ে রাখতেন। কী থাকতো না ওতে। বাড়ি ভাড়ার রসিদ, ইলেকট্রিক বিল, ক্যাশমেমো, চিঠিপত্তর, আরও অনেক কিছু। মা খুব রাগারাগি করতেন। বাবা ওসব গ্রাহ্যই করতেন না। আমারও ঠিক বাবার রোগ ধরেছে' বলেই সামান্য শব্দ করে হাসল চিত্ত।

মাধবী বুঝল, কথাগুলো চিত্ত যেভাবেই বলুক না কেন, এ সময় ওর সঙ্গে লঘু চালে কথা বলা ঠিক হবে না। ও নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘর থেকে বেরুতেই একদমকা হাওয়া ওর মুখে আছড়ে পড়ল। বড় করে শ্বাস নিল মাধবী। পঁচিশ পেরিয়ে ছাব্বিশ বছরে পড়ল ওদের বিবাহিত জীবন। বড় কম সময় নয়। ছাব্বিশ ইনটু তিনশ পঁয়ষট্টি মাথা গুলিয়ে গেল ওর। সাধ্যাতীত ভেবে ও আর সে অঙ্কে এগোল না। চিত্তর সব কিছুই ওর জানা হয়ে গেছে। এক কাপ চা নিয়ে গেলে কেমন হয়— এমন এক ভাবনা ওকে পেয়ে বসল। দেরি না করে গ্যাস জ্বেলে দু-কাপ চা করে গলা খাঁকারি দিয়ে ঘরে ঢুকে চিত্তর ভাবান্তর ঘটাবার চেষ্টা করলো। শব্দ শুনে চিত্ত চোখ তুলে চাইল।

চায়ের কাপ চোখে পড়তেই চিত্ত হাত বাড়িয়ে বলল, 'বড় বাঁচান বাঁচালে! এ সময় চায়ের খুব প্রয়োজন ছিল।'

ডিস সমেত চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে নিজের পেয়ালা নিয়ে হাত দুই দূরে নিজেও মেঝেতে বসে ছড়ান-ছিটোন কাগজপত্রের দিকে চোখ বুলোতে লাগল।

ঘনঘন কাপে চুমুক দিয়ে চিত্ত ম্লান মুখ করে বলল, 'তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো, না ধন্যবাদ দেবো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

মাধবী মুখে একচিলতে হাসি নিয়ে বলল, 'কী হয়েছে বলো তো? এ ধরনের কথা তো এর আগে আর কখনও বলোনি।'

চিত্ত চা শেষ করে মাধবীকে কাছে টেনে এনে বলল, 'আগে হয়নি বলে যে কোনদিনই হবে না, এমন কি কোন শর্ত আছে।'

মাধবী উত্তর দিল না। স্থির চোখে ওর দিকে চেয়ে কিছু একটা বের করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু চিত্তর মুখ দেখে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। কিন্তু ওর হাতে ধরে থাকা চিঠিটার দিকে নজর গেল। 'কী আছে ওতে?'

চিত্ত উত্তর দিল, 'অমন করে বলো না।' চিঠিটা সামান্য উঁচিয়ে ধরে বলল, 'অমূল্য সম্পদ। বলতে পার, হারানো রত্নভাণ্ডার।'

মাধবী কৌতূহলী হয়ে বলল, 'দেখতে পারি?'

মাধবীর দিকে পোস্টকার্ডটা এগিয়ে দিল চিত্ত।

মন দিয়ে চিঠি পড়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো মাধবী। ছেলেমানুষী হাতের লেখা, বানান ভুলও দু'একটা নজরে গেল ওর।

চিত্ত সোৎসুক ভঙ্গিতে বলল, 'চিঠটা পড়, আমি শুনি।'

মাধবী ধীরে ধীরে পড়তে লাগল—

ভাই চিত্ত,

ঠিক তিনমাস হইল তুই কলিকাতায। অনুমান হয, তুই আমাদের ভুলিতে পারিস নাই। আমি যে তোরে ভুলি নাই, তাহার প্রমাণ এই চিঠি। কলিকাতা মস্ত শহর না? চিড়িয়াখানা, মনুমেন্ট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিযাল দ্যাখছস্ নিশ্চয়। আমাগো কপালে ওই সব নাই। জানি, দুঃখ কইর‌্যা কোন লাভ নাই। মোজাম্মেল মিঞা গত মাসের সাত তারিখে স্কুল থিকা রিটায়ার করছে। নইমুদ্দিন মিঞা ক্যামন যেন হইয়া গ্যাছে। বেশি আর কাউর লগে ঘ্যাসে না। চেহারা দিন দিন ফ্যাকফ্যাকা হইয়া গ্যাছে। তগো জাম্বুরা গাছে এত জাম্বুরা হইছে যে কি কব। ভোলা নাউয়া মইরা গ্যাছে। শোনা কথা অর পরিবার পরিজন নাকি এই দ্যাশ ছাইড়া তগো ভারতবর্ষে গ্যাছে। ব্যাবাক লোক ক্যামন যেন হইয়া যাইতাছে।

আমি সুধইন্যা, আজিজ, তোকাব্বর পেত্যেক দিন মিলা ঝুইলা মাঠে বইয়া থাকি। ব্রজ স্যারের দক্ষিণ দিকের ঘর ঝড়ে পইড়া গ্যাছে। রাজেন খালা আর জহির আলী ব্রজ স্যারের ঘর ম্যারামত কইর‌্যা দিবে কইছে।

কয়টা টকি দেখলি জানতে ইচ্ছা যায। তর বাবার জায়গা খালি হইযাই আছে। তাজউদ্দিন অখন ডাক্তারখানা চালায়। নসিব না হইলে তাজউদ্দিনও চাইর আনা ফিস্ ন্যায়।

চিঠি পাওন মাত্র জবাব দিস। আমাগো মন ম্যাজাজ ভাল না। আব্বা কয়, দ্যাশ আবার জোড়া লাগবো। আল্লা জানে, কি হইব। গুরুজনদের আমার সেলাম দিস।   ইতি

তোর আব্দুল মজিদ।

মাধবী অনেক কষ্টে চিঠি পড়ে চিত্তর দিকে চেয়ে রইল। তেলতেলে দেখাচ্ছিল ওর মুখ। সম্ভবত

ঘামছিল। তাই শাড়ির আঁচল দিয়ে ভাল করে মুখ মুছে বলল, 'জাম্বুরা, ব্যাবাক, নাউয়া মানে কি?'

হেসে ফেলল চিত্ত। বলল, 'ওসব পরে শুনো। আগে দেখ তো চিঠির তারিখটা?'

মাধবী পোস্টকার্ড উল্টেধরলো এবং অস্পষ্ট হলেও পড়া যাচ্ছে। বলল, '৭-৬-১৯৪৮। বুঝেছি, এই সেই তোমার সাঘাটার বন্ধু। তাই না? বিয়ের প্রথম প্রথম তুমি অনেক বলতে এদের কথা। এখন আর একবারও ওদের নাম উচ্চারণ কর না।'

চিত্ত ম্লান মুখ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। কর গুনে বছরের হিসেব করে বলল, 'মনে হয় সেদিনের কথা। এরই মাঝে বিয়াল্লিশটা বছর কেটে গেল। সময়ের মত শয়তান বুঝি আর কেউ নয়।'

মাধবী নিজের চা শেষ করলো এতক্ষণে। বলল, 'তাই যদি বল, এই তো সেদিন আমাদের বিয়ে হল। খোকন হল, মুন্নি হল। ওরাও এখন যুবক যুবতী। আমরাই মাঝখান থেকে বুড়ো-বুড়ি হয়ে গেলাম।'

ওর কথায় চিত্ত না হেসে পারল না। বলল, 'সেজেগুজে বেরোলে, এখনও লক্ষ করেছি, তোমাকে অনেক পুরুষই আড়চোখে দেখে। আর আমাকে সক্কলে বলে দাদু।'

মাধবী সহাস্যে উত্তর দিল, 'দাদু তো তুমি হতেই পার। মুন্নির বিয়ে এখন দিয়ে দিলেই বছর দুয়েকের মধ্যে ওই দাদু ডাকটা মিথ্যে হবে না।' বলেই শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে হাসি চাপবার চেষ্টা করলো।

চিত্ত-ও সরস ভঙ্গিতে উত্তর দিল, 'ছেলেমেয়ের ব্যাপারে বেশি নাক না গলানোই ভাল। যা দিনকাল। খোকনকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো বলবে, 'আমার জন্য ভেব না। ওসব আমিই ঠিক করবো। আর মুন্নি হয়তো ভাবেভঙ্গিতে জানিয়ে দেবে, ওর-ও একজন আছে।' বলেই হো হো করে হাসল।

মাধবী প্রত্যুত্তরে বলল, 'ও সবে আমার কোন আপত্তি নেই। যার যারটা সেই বুঝে নিক, এটা একরকম ভালই। দিন পাল্টাচ্ছে। আমরাও পাল্টাচ্ছি।' কথাগুলো ঠিক কি- জানার জন্য কৌতূহলী চোখে চেয়ে রইল চিত্তর দিকে।

চিত্ত তার উত্তরে বলল, 'ছেলে-মেয়ে যাচ্ছেতাই কিছু করুক এটা মানতে পারবো না। এখানে প্রাচীন-উদারের কোন ব্যাপার নেই। আসলে, একটা দুঃখ বুঝি সকলেরই থেকে যায়। শয়তান সময়কে যদি হাতের মুঠোয় রাখতে পারতাম, তো ফের জীবনটাকে নতুন করে দেখার সুযোগ পেতাম। সাঘাটায় যেতাম, বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে বাতাবিলেবু দিয়ে ফুটবল খেলতাম, সকলে সুখে স্বচ্ছন্দে আছে দেখে সুখী হতে পারতাম। ভোলাকে দিয়ে চুল দাড়ি কাটতাম। সেটা আর হল না।'

প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য মাধবী বলল, 'কোথায় তোমার ছেলেবেলার কথা হচ্ছিল, মাঝখান থেকে হঠাৎ আমরা আমাদের নিয়ে বিব্রত হয়ে গেলাম।'

চিত্ত যেন সম্বিত ফিরে পেল। বলল, 'ঠিকই বলেছ। জাম্বুরা, ব্যাবাক, নাউয়া শব্দের অর্থ বুঝতে পেরেছ তো।'

সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মাধবী। বলল, 'বাতাবিলেবু দিয়ে ফুটবল খেলতে তোমরা? পায়ে লাগত না?'

'তখনকার কথা তো বলতে পারবো না, তবে এখন ওটা ভাবতেই ভয় হয়।' চিত্ত উত্তর দিল।

মাধবী উৎসাহী ভঙ্গিতে বলে বসলো, 'পাসপোর্ট করে কত লোক তো বাংলাদেশ যাচ্ছে। একবার চেষ্টা করে দেখই না, ওখানে যাওয়া যায় কিনা। আমারও খুব দেখতে ইচ্ছে করে বাংলাদেশ।'

চিত্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ইচ্ছে হলেও ভরসা পাই না। খোকন আর মুন্নিকে রেখে যাই কী করে বলো? বিশেষ করে ওদের যা বয়স। তাছাড়া পাসপোর্ট পেলেও 'ভিসা' পেতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। কোন আত্মীয়স্বজনও নেই ওখানে। আমাদের হয়ে কে স্পনসর করবে বলো?'

মাধবী ও-কথার অত গুরুত্বই দিল না। সহজভাবেই বলে ফেলল, 'কেন, মজিদ? তুমি মজিদকে লিখলেই পার। ও নিশ্চয়ই এখনো তোমাকে মনে রেখেছে।'

চিত্তর-র মুখ মুহূর্তেই বিবর্ণ হয়ে গেল। ফ্যাসফেসে গলায় বলল, 'মানুষের জীবনের তো কোন স্থিরতা নেই। ধরো, ও মরে গেছে। তখন? ওর ছেলেমেয়েরা তো আমাকে চেনে না, জানে না। কি দায় পড়েছে ওদের আমাদের জন্য মাথা ঘামাবার।'

মাধবী উত্তর দিল, 'ধরো এটা তুমি না ভেবে ওরাই ভাবছে। তখন তুমি কী করতে?' চিত্ত খোলা জানালার দিকে মুখ রেখে বেশ কিছুক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে রইল। বণিকদের বাড়ির পামগাছ আর নারকোল গাছের পাতাগুলো সির সির করে দুলছে দেখতে পেল। বেশ কয়েকটা কাক উড়তে উড়তে এসে বসলো ওই গাছগুলোর ডালে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'এটা বাংলার কি মাস গো?'

'ফাল্গুন', মাধবী উত্তর দিল।

চিত্তর মুখ পাথরের মত হয়ে গেল মুহূর্তে। বলল, 'একেই তো মধুমাস বলে অথচ, একটা কোকিলের ডাকও শুনতে পাই না। সামনের বাড়িতে আগে বেশ কিছু পায়রা ছিল। সকালে ওদের বক্‌বকম্ ডাক শুনতে পেতাম। ওগুলোও সব সাফ হয়ে গেছে। শুনেছি, পাড়ার ছেলেরা পায়রাগুলোকে ধরে হাতিবাগানে বিক্রি করে দিয়েছে। সকালে ঘুম ভাঙে কাকের কা কা কর্কশ ডাকে। কোকিল, বুলবুলি, লেজঝোলা, শালিখ এখনও আছে নিশ্চয়ই সাঘাটায়। ওরা সব থাক, আগের মতই থাক। এ আমি মনেপ্রাণে কামনা করি।'

মাধবী বলল, 'শুধু যে আমাদেরই সব কিছু পালটেছে, তাই বা বলো কি করে? সারা পৃথিবীতেই তো পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। তোমার সেই সাঘাটাও হয়তো রঙ-রূপ সব পাল্টে ফেলেছে।'

চিত্ত সে কথার সমর্থন জানিয়ে বলল, 'বাংলাদেশে এখনও যাদের যাতায়াত আছে, তারা সকলেই এই কথা বলে। রতনের ছোটভাই এখনও ভিটে আঁকড়ে পড়ে আছে। রতনরা বছর দুই অন্তর যায় ওখানে। বোর্ড অফিসে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ও কোনদিন আমাকে সাঘাটায় যাওয়ার কথা বলেনি। কেউ-ই চায় না উটকো ঝামেলা ঘাড়ে নিতে।'

সব শুনে মাধবী এবার বলল, 'ট্যুরিস্ট হিসেবে যাওয়ার অধিকার তো তোমার আছে?'

চিত্ত সম্মতি জানিয়ে বলল, 'সে তো পৃথিবীর যে কোন জায়গাতেই যাওয়া যায়। কিন্তু ফরেন এক্সচেঞ্জের গেরো যে কী তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানে।' এ পর্যন্ত বলেই হঠাৎ চিত্তর খেয়াল গেল

মজিদ ছাড়াও আরও অনেকেই চিঠি দিয়েছিল। চিঠিগুলো নিশ্চযই ওইসব স্তূপ করা কাগজের মধ্যে রয়েছে ভেবে বলল, 'আরও অনেকেই চিঠি লিখেছিল, দেখি ওগুলো খুঁজে পাই কিনা।'

মাধবী দেয়াল ঘড়িতে চোখ রেখে প্রায় আঁতকে উঠে বলল, 'এই রে। কথায় কথায় বেলা বেড়ে গেল, কী হবে।'

ওকে আশ্বস্ত করে চিত্ত উত্তর দিল, 'ভয় নেই। আজ আমার ছুটি। ধীরে-সুস্থে করলেই চলবে।'

মাধবীকে বেশ নিশ্চিন্ত দেখাল। শাড়ির আঁচলে মুখ মোছা ওর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। চিত্তকে একটু তাতানোর উদ্দেশ্যেই যেন বলে উঠলো, 'এ জন্যই তো মাস্টাররা সকলের চক্ষুশূল। বছরে ছ'মাস ছুটি আর স্কুল হচ্ছে এনার্জি স্টোরের জায়গা। ছুটির ঘন্টা বাজতে না বাজতেই লক্ষ্মীপুজোয় বেরিয়ে পড় তোমরা। ফেরো রাত ন'টা সাড়ে ন'টায়।' বলেই ঠোঁট টিপে হাসল।

চিত্ত সে কথায় সায় দিয়ে বলল, 'তোমার কথা সবটা না হলেও অর্ধসত্য তো বটেই।' সামান্য সময় চুপ করে থেকে বলল, 'এসব ছেড়ে এখন আর উঠতে পারবো না। আজ তুমি তোমার মনপছন্দ রান্না করো তো।' কথা শেষ করেই নিজের মত করে গাইল, 'ফেলে আসা দিনগুলি মোর, মনে পড়ে গো। আজও মনে পড়ে গো।'

মাধবী হাসতে হাসতে বলল, 'পারও বটে'। রান্নাঘর মুখো এগোতে গিয়েই শুনতে পেল, 'ভাগ্যিস এসব এতদিন যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। তুমি এসব পরিষ্কার করতে অনেকদিন ধরেই বলছিলে। আজ তাই করতে গিয়েই না এসব পেয়ে যাচ্ছি।'

মাধবী দূর থেকেই ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'বেশ বেশ। অত কৃতজ্ঞতা না জানালেও চলবে। আরও কী রত্নভাণ্ডার খুঁজে পাও দেখো।'

বংশীর কথা ভুলেই গিয়েছিল চিত্ত। ওইসব স্তূপ করা কাগজের ভেতর থেকে বংশীর চিঠি চোখে পড়তেই স্মৃতির ভ্রমর উড়তে শুরু করলো।

বাজবংশী পাড়ার বংশী মালী। ওর বাবা জটাধর মালী ডাকাতি করতো এককালে। জটাধরের বয়স যে কত তা টেরও পাওয়া যেত না। শক্ত-পোক্ত চেহারা। বুকে-পিঠে লোমে ভর্তি। কাঁচা-পাকা লম্বা চুল ও দাড়ি। প্রথম দেখলে ভয় না পেয়ে উপায় নেই। অনেক নিরীহ মানুষ খুন করে যথাসর্বস্ব কেড়ে নিত। কিন্তু একদিন নিঃসম্বল একজনকে খুন করে ও নিজেই ধরা দিয়েছিল। পাগল প্রমাণ হওয়ায় জেল হয়েছিল দু'বছর। জেল ফেরত ও একেবারে অন্য মানুষ। সারাদিন এর-ওর বাড়ি কাঠ কেটে দিত, গতরে খাটত। জাতপাতের কোনই ভয় ছিল না। সকলের বাড়িতে ও অবাধে যেত, মানকচুর পাতা ধুয়ে ভাত-ডাল হাপুস-হুপুর করে খেয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতো।

সেই জটাধরের ছেলে বংশী যখন স্কুলে পড়তে এলো, তখন অনেকেই বাদ সাধলো। কিন্তু লতিফ মিঞা আর রজনী স্যারের চেষ্টায় পড়বার সুযোগ পেল বংশী। বংশীর মুখভর্তি বসন্তের দাগ। ডান চোখটা ওই সর্বনাশা রোগে নষ্ট হয়ে যায়। ও লাস্ট বেঞ্চে বসতো। কোনদিনই ঠিকমত পড়া করতে পারতো না। ক্লাসের বেশিরভাগ ছেলেই ওর সঙ্গে মিশতো না। কিন্তু কী আশ্চর্য, ওর সঙ্গে ভাব হয়েছিল, চিত্ত, তোকাব্বর আর মজিদের।

বংশীর লেখা চিঠিটা উল্টে পাল্টে দেখল চিত্ত। তারিখ-টারিখ কিছু নেই। পোস্টাল স্ট্যাম্পটাও বেশ আবছা হয়ে গেছে। চিঠির সারবস্তু পড়ে ও স্তম্ভিত হয়ে গেল। রজনী স্যারের ছোট মেয়ে নির্মলাদিকে নিয়ে পালিয়েছিল আফজল। ওসমান শেখের দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে। চোখে সুর্মা দিত, ধবধপে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে ঘোড়ায় চেপে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াত। সিগারেট খেত অফুরন্ত। পয়সাওলা ঘরের ছেলে হলে যা হয়, তাই ছিল আফজল। বগুড়ার এক হোটেল থেকে পুলিশ আফজল আর নির্মলাদিকে খুঁজে বের করে নির্মলাদিকে রজনীস্যারের জিম্মায় রেখে এসেছিল। যেদিন এ ঘটনা ঘটলো তার পরের দিনই রজনীস্যার গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। বংশীর চিঠির শেষ লাইন কটা ছিল এরকম ঃ 'বাবা পেত্যেক সোমবার থানায় যাইয়া হাজিরা দ্যায়। নির্মলাদির খোঁজ-পাত্তা কিছু নাই। তরা ভাল আছিস জানলে সুখী হব। আমার ইহকাল-পরকাল বইল্যা কিচ্ছু নাই। খুনীর রক্ত আছে এই শরীলে। মনে হয়, হক্কলেরে খুন কইর‍্যা ফালাই। কিন্তু পারি না। তগো কথা বড় মনে পড়ে। এহানে একখান হাসপাতাল হইছে। ওই হাসপাতালে হারুন শেখ আর সুধীর বর্মণ আমার চাকরি কইরা দিছে। চিকিচ্ছা যা হয় তা মা কালীই জানে। মাছ-টাছ সব ডাক্তার কম্পাউণ্ডার ভাগ কইরা নেয়। ছিটাফোটা দুই একজনের কপালে জোটে। ভাতের ফ্যান মিশাইয়া ডাইল ঘন করে। এইসব শুইনা তরই কী হাত-পা গুটাইয়া বইস্যা থাকতে ইচ্ছা যায়? মন কয়, চোক্ষে দ্যাখলে তুই-ও খুন করতে চাইতি। বাবায় অ্যাখন সারাদিন বিড়বিড় কইরা কি সব কয়। মনে হয়, মাথাডা ওয়ার গ্যাছে। নইমুদ্দিন স্যার কয়, বড় নচ্ছার সময় এইডা।

তোকাব্বর রাজশাহীতে অর কাকার কাছে থাইক্যা লিখাপড়া করতাছে। মজিদ জলপানি পাইয়া ঢাকায় চইল্যা গ্যাছে। তর খবর জানাইস।

বংশী

পুনঃচুরি-ডাকাতি মুইও কোনদিন কইর‍্যা বসবো। তখন ঘিন্না করিস না।

বুকের ভেতরে চাপ ব্যথা অনুভব করলো চিত্ত। দু'চোখ জ্বালা করতে থাকে। পাথরের মত মুখ করে বসে রইল।

মাধবীকে কি এই চিঠিটা দেখাবে! মনে মনে ভাবল, না দেখানর কিছু নেই। ওর কাছে বাংলাদেশ আর দশটা বিদেশী রাষ্ট্রের মতই। কেন না, ওখানকার জল-বাতাসের সঙ্গে ওর বিন্দুমাত্র পরিচয় নেই। সুতরাং এ সব চিঠির মধ্যে যা সে খুঁজে পাচ্ছে, তা মাধবী নেহাত ওর বউ বলে যৎসামান্য গুরুত্ব দিচ্ছে। কিন্তু আবেগ বা অনুভূতি কিছু আছে বলে মনে হয় না। মনে হল চিত্তর, বাংলাদেশে যাওয়া ঠিক গোয়া কিংবা দক্ষিণ ভারতে ঘুরে বেড়াবার মতই ব্যাপার মাধবীর কাছে। মনে পড়লো চিত্তর, বিয়ের মাস দুয়েক পর ও মাধবীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিল ট্যাক্সি করে। কি একটা গণ্ডগোল হওয়ায় ট্যাক্সিচালক হাজরা হয়ে সরু গলির ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। একসময় হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে মাধবী বলেছিল,। 'এটা হচ্ছে চন্দ্র মণ্ডল লেন। এখানের এই সরু গলিটার একটা বাড়িতে আমরা থাকতাম।'

চিত্ত খুব উদাসীন ভঙ্গিতে উত্তর দিয়েছিল, 'তাই বুঝি।'

চিত্তর সে কথার গুরুত্ব না দিয়ে মাধবী বলেছিল ট্যাক্সিচালককে, 'ভাই এখানে একটু দাঁড়াবেন?'

ট্যাক্সি থেমে গিয়েছিল।

মাধবী ট্যাক্সি থেকে নামতে নামতে বলেছিল, 'এই, এসো না।'

চিত্ত বেরিয়েছিল বটে কিন্তু গলায় ক্ষোভ রেখে বলেছিল, 'কী আছে এখানে? আর দশটা এঁদো গলির মতই এটা।'

মাধবী উত্তরে বলেছিল, 'পশ্চিম পুঁটিয়ারীতে চলে যাবার পর এ পাড়ায় আসিইনি। ভাবতাম, যে কোনদিন গেলেই চলবে। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। আজ এ জায়গা দিয়ে ট্যাক্সি যাচ্ছে ভেবে ছেলেবেলার অনেক কথা মনে পড়ে গেল।'

চিত্ত কি বুঝেছিল কে জানে, ও আর কথা বাড়ায়নি। মিনিট পাঁচেক এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে মাধবীকে নিয়ে ফের ট্যাক্সিতে বসেছিল। ট্যাক্সি ফের চলতে শুরু করলে মাধবী গাঢ় শ্বাস ফেলে বলেছিল, 'মাত্র ক'বছরে এত পাল্টে গেছে যে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না। মিছিমিছি সময় নষ্ট আর ওয়েটিং চার্জ গুনতে হবে।'

চিত্ত ওর কথার উত্তর না দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলেছিল, 'এরকমই হয়।'

মাধবীকে দেওয়া নিজের উত্তরটা বর্শার ফলার মত আজ ওর বুকেই বিঁধে গেল যেন। বংশীর চিঠিটা যত্ন করে একপাশে সরিয়ে রেখেও ফের চিঠি খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ভীষণ তৃষ্ণায় বুক-গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। সুতরাং ওখান থেকেই গলা চড়িয়ে মাধবীকে বলল, 'আর একটু চা হলে ভাল হত।'

'এত বেলায় ফের চা খাবে?'

চিত্ত উত্তর দিল, 'আজকে এই ছাইপাশগুলোকে বিদেয় করে তবে নিশ্চিন্ত হব। কী হবে এসব যত্ন করে গুছিয়ে রেখে।'

মাধবী রান্নাঘর থেকেই বলল, 'দশ মিনিট পর পাবে, বুঝলে।'

'ঠিক আছে, তাই সই।'

একটা লাল সুতো দিয়ে দুখানা চিঠি বাঁধা আছে। ওগুলোও যে সাঘাটার তা বুঝতে অসুবিধে হল না। ও সন্তর্পণে সুতো খুলে চিঠি দুটোকে চোখের সামনে তুলে ধরলো। ওর মধ্যে একটা তোকাব্বরের আর একটা মজিদের। প্রথমে তোকাব্বরের চিঠিটা খুলে ফেলল। কি সুন্দর হাতের লেখা— যেন মুক্তো ছড়ান। চিঠিটা নাকের কাছে এনে গন্ধ নিল। পুরনো কাগজের গন্ধ নয়, কেমন এক মন খারাপ করা গন্ধ ওর নাকে এসে লাগল। তোকাব্বর লিখেছিল :

প্রিয় চিত্ত,

বচ্ছরখানেক হইল তুই কইলকাতায়। কইলকাতা হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত। উহাই কি গঙ্গা নদী বলিয়া পরিচিত? সঠিক খবর দিস। মজার কথা হইল এই যে, আজিজর একদিন বিড়ি খাইয়াছিল। তাহা ওয়ার আব্বাজানকে জানাইয়া দিয়াছিলাম। কি রকম শাস্তি পাইয়াছিল আজিজর তাহা জানা মাত্রই তুই না হাইস্যা পারবি না। অর আব্বাজান আজিজররে ডাইক্যা জিগাইছিল, ও বিড়ি খাইছে কিনা। আজিজর মিছা কথা কয় নাই। শুনা মাত্রই অর আব্বাজান ধমক-ধামক কিছুই

দ্যান নাই, ক্যাবল আদেশ করলেন, নিজের কান জোর কইর‍্যা টান। আর আল্লার কিরা কর, আর এই ধরনের অপকর্ম করবা না'। আজিজর অ্যাত জোরে কান টানছিল যে কি কব। অর দুই চক্ষু দিয়া পানি ঝরাইতে ঝরাইতে কইছিল, কিরা, কিরা, কিরা। বুঝলি তো শাসনের বহরটা। অর আব্বাজান মাইর ধইর ভালবাসে না, তা তুই ভাল মতনই জানস। কিন্তু ব্যাবাক ব্যাপারটায় আজিজর ক্যামন পাল্টাইয়া গেল। লিখাপড়ায় মন দিল, বিড়িটিড়ি একদমই ছোয় না। হ ভাল কথা। আজিজরগো নোনা গাছে অনেকগুলো নোনা হইছে। দুইটা পাইক্যা ফাইটা গেছিল। আজিজর নোনা পাইরা কাইন্দা কাইন্দা তর কথা কইতেছিল। একবার তুই নাকি নোনা চুরি করতে গিয়া অর আব্বাজানের হাতে ধরা পড়ছিলি? আজিজর ওইসব আমাগো বিলাইয়া দিছিল। ও এক কোয়াও মুখে দ্যায় নাই।

তগো কইলকাতায় অনেক কিছুই দ্যাখনের আছে। সব কি দেইখ্যা ওঠতে পারছস? যা যা দ্যাখছস সব চিঠিতে লিখ্যা জানাবি। তর বাবা-মায়েরে আমার কথা কইস। তর বাবার ওষুধে শরীলটা সাইর‍্যা ওঠছিল। অখন মাঝে মাঝে কম্প দিয়া জ্বর হয়। সালাম ডাক্তার বড়লোকগো জইন্য জন্মাইছে। আমগো দ্যাখনের কেডা আছে ক? গত সপ্তাহে হরেন বর্ডার পার হইয়া দ্যাশ ছাড়ছে। অনেকেই ছাড়তাছে। হায় আল্লা, ইডা কি হইল। চিঠি পাওন মাত্তর জবাব দিস। কইলকাতার বাবু হইয়া মোগো ভোললে তোরে একদিন জুতা পেটা করবো।

ইতি

তোর তোকাব্বর মল্লিক।

চিঠি শেষ করে মজা অনুভব করলেও চোখ দুটো ফের বুঝি ঝাপসা হয়ে এল চিত্তর। এসময় বড় বাঁচান বাঁচাল মাধবী। গনগনে আঁচে মাধবীর মুখ রক্তিমাভ। বিজ বিজ করছে ঘাম সারা মুখে। চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে আঁচল দিয়ে মুখ মুছে বলল, 'নতুন কিছু পেলে?'

'হ্যাঁ'। দু-দুটো চিঠি মাধবীর চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, 'এটা তোকাব্বরের। ভেরি ইন্টারেস্টিং। ও আমাকে জুতো পেটা করবে লিখেছিল, উত্তর দিয়েছিলাম কিনা মনে নেই। মনে হয় দিইনি। কেন না, ওই 'জুতো পেটা' শব্দই আমাকে ভীষণ অভিমানী করেছিল সেদিন। রেগেও গিয়েছিলাম হয় তো বা । এরপর তোকাব্বর আর কোন চিঠি লেখেনি আমাকে। বড় খারাপ লাগছে, বড় কষ্ট হচ্ছে মাধবী।' বলেই জলভরা চোখ লুকোলেও ওয়ে দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে কাঁদছে তা বুঝতে অসুবিধে হল না মাধবীর।

প্রথমটায় মাধবী হতবাক হয়ে গেলেও নিজে কিন্তু ভেঙে পড়লো না। বরং একটু ঋজু ভঙ্গিতে বলল, 'কী ছেলেমানুষী করছো। চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। খেয়ে নাও।'

বাস্তবে ফিরে এল চিত্ত। কষ্ট হলেও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'চিঠি ছিল বলেই বুঝি ওর কথা মনে পড়ে গেল। তোকাব্বর কি আমাকে একেবারেই ভুলে গেছে?'

মাধবী বলল, 'সেটাই তো স্বাভাবিক।'

চিত্ত চায়ের কাপে ঘনঘন চুমুক দিল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে মাধবীকে বলল, 'আর এই চিঠিটা সম্ভবত মজিদের। কি লিখেছিল মনে নেই। আমার পড়তে কেমন ভয় করছে। চিঠিটা তুমিই পড় না?'

মাধবী সহাস্যে বলল, 'তোমাদের ওই ভাষা আমি ঠিকমতন উচ্চারণ করতে পারবো না। তুমি মনে মনে রেগে যাবে আমার ওপর। ও সম্পত্তি তোমার। তুমিই পড়।'

চিত্ত কী বুঝলো কে জানে। বলল 'রাগ করবো কেন? জান তো, এই বয়স বড় খাবাপ। তার মানে ইমোশনাল হওয়ার বয়স। কথার মোড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'খোকন আর মুন্নি কখন ফিরবে?'

মাধবী আরও বেশি অবাক চোখে ওর দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'শুধু ইমোশনালই হওনি, ভুলোও হয়ে যাচ্ছ। আজকে তো খোকনের ইন্টারভিউ। আর মুন্নি তো গেছে মায়াপুর বেড়াতে। ফিরবে আটটা নাগাদ।'

চিত্ত মাধবীকে কাছে টেনে এনে বলল, 'তোমাদের তুলনা নেই। যত কিছুই হোক না কেন, ঘরের প্রতি নজর ঠিকই রাখ তোমরা। কী করে পার এসব? আমরা কেন পাবি না বলতে পার?'

মাধবী অত তলিয়ে দেখল না প্রশ্নটা। স্বাভাবিক গলা করে বলল, 'ওসব ভাবাব সময় নেই আমার। এখন অনেক কাজ! খোকনের ইন্টারভিউ ভাল হলেই বাঁচি। চান সেবে নিই গে। তুমি তোমার অতীত নিয়ে মেতে থাক। চোখের জলকে অত সস্তা কব কেন?' কথা আর না বাড়িয়ে আলনা থেকে জামা কাপড় নিয়ে বাথরুমমুখো হল। যেতে যেতে বলল, 'ওই চিঠি পড়া শেয কবে আজেবাজে কাগজগুলোকে ওই পলিথিনের ব্যাগে বোঝাই কবে রেখে দিও। সময়মতো ওগুলোকে বিদেয় করবো। যত্ত সব আপদ।'

চিত্ত করুণ মুখ করে বলল, 'আর যাই ভাব, আপদ ভেব না এগুলোকে।'

শ্যাম্পুর শিশি হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল মাধবী। ইচ্ছে ছিল, ওকে দু-একটা কথা শোনায। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হল না। কেননা, চিত্ত তখন বাঁ-হাতে মজিদের চিঠিটা নিয়ে ডান হাত দিযে আরও কিছু পায় কিনা সে সবই খুঁজে বেড়াচ্ছিল। বহুকাল পব ওর এমন আত্মমগ্ন চেহারা চোখে পড়ল মাধবীর। ঠিক সেই মুখ, সেই চেহারাই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠলো ওর চোখে। খোকনের অন্নপ্রাশনেব অনেকগুলো ছবি তুলেছিল সজল ঠাকুবপো। তখন সংসাব আলাদা হয়নি। শ্বশুর-শাশুড়ি ননদ-দেওর নিয়ে জমজমাট সংসার। ওদের বিয়ের দু'বছর পর শ্বশুরমশাই রিটায়ার করলেন। চিত্তর সামান্য টাকার স্কুলের চাকরি, জয়া তখন সেভেনে পড়ছে আর সজল দিনে শর্টহ্যান্ড শিখে রাতে কলেজ কবতো। সজল বাড়িতে হইচই বাধিয়ে দিল। গোপনে গোপনে ও-দু-তিনটে ছেলে পড়াত। জিনিসপত্রের দাম তখন এত বাড়েনি। ধুমধামের ব্যাপারটা সজল আর শ্বশুরমশাইয়ের উদ্যোগেই হল। আত্মীয়স্বজন ছাড়াও বেশ কিছু বন্ধু-বান্ধব নিমন্ত্রিত হয়েছিল। তখন বাজারে রঙিন ছবির চল হলেও, সাধ্যে কুলোত না। ছবিগুলো প্রিন্ট হয়ে এলো। সে সব ছবি দেখার কী ধুম। দেখতে দেখতে জয়াও বড় হয়ে গেল, চিত্তর বন্ধুর ভাইপোর সঙ্গে জয়ার বিয়ে হল। সজলও কাউকে জানান না দিয়ে একদিন সরাসরি বউ নিয়ে বাড়ি এল রেজিস্ট্রি করে। সুখের অন্ত রইল না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সংসার ভাগ হল। শ্বশুরমশাই মরে গেলেন। শাশুড়িকে নিয়ে সজল বাগুইহাটিতে চলে গেল। আনন্দ-উজ্জ্বল পরিবারটায় হঠাৎই অন্ধকার নেমে এল। তবে মাস খানেকও নয়, আবার সব কেমন স্বাভাবিক হয়ে গেল।

একদিন ঠিক আজকের ভঙ্গিতেই অ্যালবামের পাতা খুলে খোকনের অন্নপ্রাশনের ছবি, বাবা মার ছবি, সজলের ছবি মনোযোগী হয়ে দেখছিল। মুখটা চিত্তর সেদিনও আজকের মত এমনি থমথমে হয়েছিল। পার্থক্য কি কিছুই ছিল না সেদিনের সঙ্গে আজকের? নিশ্চয়ই ছিল। কেন যেন মাধবীর চোখও ঝাপসা হয়ে গেল আর সে জন্যই বুঝি পার্থক্যটা এমন তীব্রভাবে নজর পড়েনি। মাধবী নিজেকে সামলে নিল। বাথরুমে গিয়েও স্বস্তি পাচ্ছিল না। পুরোনো অ্যালবাম ও খুলে দেখে না। ইচ্ছেই হয় না। ওর মনে হয়, ওদের দাম্পত্য-জীবনে সজল-জয়া-শ্বশুর-শাশুড়ি ভীষণ অর্থহীন, কেন না, চিত্তর জীবনের সুমধুর দিনগুলো তো ওদের জন্য নষ্ট হয়েছে; ওরা সকলে একযোগে গোপনে গোপনে শত্রুতা করেছে। আজ ওর এই ছেলেবেলার চিঠিগুলোও যেন মাধবীর সঙ্গে প্রচণ্ড শত্রুতার কাজে লেগে পড়েছে। পুরনো দিন নিয়ে এই বাড়াবাড়ি দেখে সারা শরীর মনে জ্বালা ধরে গেল মাধবীর। মাথা ঠিক রাখতে পারল না। ও প্রায় ছুটতে ছুটতে চিত্তর সামনে দাঁড়িয়ে কর্কশ গলায় বলল, 'অতীতকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কর, এ আমি পছন্দ করি না। দাও তো চিঠিগুলো। এগুলোকে আমি এক্ষুনি পুড়িয়ে ছাই করে দেবো।'

মাধবীর আচরণে হতভম্ব হয়ে গেল চিত্ত। কী বলবে, ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারছিল না।

মাধবী ঝাঁঝাল গলায় বলল, 'কী বললাম শুনতে পাওনি? এগুলো যে তোমার সঙ্গে ছলনা করছে, এটা বোঝাবার মত বুদ্ধিও কী তোমার নেই?'

চিত্ত বিমূঢ়। মাধবীর এই আশ্চর্য মারমুখো ঝাঁজ দেখে আর কথা বাড়াল না। চিঠিগুলো মাধবীর হাতে দিয়ে করুণ গলা করে বলল, 'মজিদের এ চিঠিটা এখনও পড়তে পারিনি। একবার পড়ে নি। তারপর তোমার যা ইচ্ছে করো।'

গাছের হলদে মরা পাতার মত চিঠিগুলো মাধবীর শিথিল হাতের মুঠো থেকে খসে ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। অবাক হয়ে চিত্ত মুখ তুলে তাকালো ওর মুখের দিকে। মনে হল মাধবী কেমন বিবর্ণ পাথর হয়ে গেছে। নিষ্পলক চোখে সে তাকিয়ে আছে কিন্তু চোখের তারা স্থির, যেন দৃষ্টি নেই, মুখ ফ্যাকাশে। আচমকা বিদ্যুতের শক খেলে যেমন হয়।

মাধবী কিন্তু ওকে দেখছিল না, চিঠিগুলিকেও না। চিত্তর কথাটা ওকে আচমকা একটা বড় রকমের ধাক্কা দিয়েছে এই মাত্র। ওর সারা শরীর থরথর করে কাঁপছিল। একটা দৃশ্যই এখন ওর চোখের সামনে ভাসছিল। এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই ওর চোখে জল ছিল না। কিন্তু জলে ভরা ঝাপসা দৃষ্টিতেই সে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে ছিল আগুনে ঝলসে যাওয়া মুখ বন্ধ খামের চিঠিটার দিকে। চিঠিটা দেখতে দেখতে কালো কার্বনে রূপান্তরিত হয়ে গেল গনগনে আগুনের মধ্যে।

দূর মফস্বলের সেই মহকুমা শহরের বাড়িটা, সেই রক্ষণশীল বাড়িটা এখনও তার বুকের ভেতর পাথরের খাঁচার মত ভারী হয়ে আছে। সে যেন আর এক যুগের কথা, আর এক জন্মের কথা। ওর কাতর আর্তি সেদিন কেউ শোনেনি। 'দোহাই তোমার, চিঠিটা এখনও আমি পড়তে পারিনি। তোমাদের পয়ে পড়ি, একবারটি, একটি বার আমাকে পড়তে দাও। তারপর যা ইচ্ছে করো।'

মিথ্যেই। প্রাইভেট টিউটর মোহিতদার শেষ চিঠিটা আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল।

স্বপ্নের নারী

সাবর্ণীকে আজ দেখলাম শ্রীগোপাল জুয়েলারিতে। সঙ্গে ওর মেয়ে ছিল। সাবর্ণীর এখনও চোখ-ধাঁধানো রূপ। আমার বয়সী যারা তাঁরা তো বটেই ছেলে-ছোকরাদেরই মাথা ঘুরে যায়। ভূমিকম্প কী তা বইয়ে পড়েছি, কিন্তু আজ আমার মনে হল, ও আমার মাঝে ছোটখাটো ভূমিকম্প শুরু করেছিল। কপাল ভাল, মাথা ঘুরে গিয়ে কোন সীন করিনি রাস্তার মাঝে। সাবর্ণী আমাকে দেখেছে কী? দেখে যদি থাকে তো, ও কেন এত ধীর, স্থির, নিষ্কম্প থাকল?

সাবর্ণী আমাকে মূর্খ বলেছিল। আজ বুঝি সেটা বর্ণে বর্ণে খেটে গেল। মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে পারে কি কোন মা চটুল হতে? পরক্ষণেই মনে হয় এ সবই বাজে ভাবনা। বিশেষ পরিচিত জনের সঙ্গে সামান্য আলাপ করলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়। মেয়ে কি মা-কে সন্দেহ করতে পারে কখনও। সন্দেহ তো দূরের কথা, আমি হলফ করে বলতে পারি, মেয়ে খুশী না হয়ে পারে না মায়ের কুমারী জীবনের বন্ধুদের দেখে।

আমি শ্রীগোপাল জুয়েলারির আশেপাশেই ঘুর ঘুর করছিলাম। সাবর্ণীর অমোঘ আকর্ষণই বোধ হয়, আমাকে এমন করতে বাধ্য করেছে। আমার আশৈশব বন্ধু রুণু শুনলে বলবে, তোর স্বভাবটা যাবে না এ জন্মেও। ভাবি, রুণুর গাল শোনার কী দরকার সাবর্ণীর কথা বলে।

আমি জানি, স্বভাব পাল্টানো বড়ো কঠিন। যারা পারে তারা নমস্য। যাক্‌গে সে সব কথা। ষোল থেকে আঠারো বছর যেমন দুবেলা সাবর্ণীর বাড়ির আশেপাশে ঘুরতাম আবার শুরু হ'ক না কেন পঞ্চাশ বছর বয়সে। মাঝের বত্রিশটা বছর কত ঘাটেরই জল খেলাম। স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে নিয়ে যাকে বলে সুখী পরিবারের কর্তা আমি; সেই আমি-ই ষোল-আঠারোতে চলে যেতে চাইছি। আমার স্ত্রী মল্লিকার কাছ থেকে স্বামী হিসেবে যা যা পাবার সবই পেয়েছি। ছেলে প্রীতিশ সাকসেসফুল ইয়াংম্যান, মেয়ে পাপা এক কথায় চার্মিং।

আমার কিছুই ছিল না, এখন অনেক কিছুই হয়েছে। বাড়ি, গাড়ি, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স সবকিছু। প্রীতিশ অবহেলাভরে কলেজের চাকরি করছে না, ব্যাঙ্ক-ফ্যাঙ্কের এঁদো কেরানি তো নয়ই, ওর স্বপ্ন ফরেন সার্ভিসে। পাপার সঙ্গে এ নিয়ে প্রীতিশের তুমুল বচসা হয়।

পাপা বলে, তোর দেশাত্মবোধ নেই এতটুকু। ছিঃ।

প্রীতিশ বলে, আহাম্মক নাহলে এ কথা কেউ বলে। ফরেন সার্ভিসে গেলেই দেশাত্মবোধ চলে যায় নাকি। ও চাকরির চার্মই আলাদা, বদ্ধ কুয়োয় থাকতে হয় না, ছেলে-মেয়ে পড়ানোর মাঝে কোন থ্রিল নেই। বড়ই একঘেয়ে।

দূর থেকে এসবই আমি আর মল্লিকা শুনেছি।

মল্লিকা অপূর্ব ভ্রূভঙ্গি করে বলে, এ রিয়্যাল অ্যামবিশাস ইয়াংম্যান। মল্লিকাকে জানি তো, তাই যৎপরোনাস্তি মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাতে জানাতে বলি, উই আর প্রাউড অফ হিম। বলেই ভেবেছি, পাপার জন্য আমার কি তা হলে কোন গর্ব নেই। সি ইজ বিউটিফুল অ্যান্ড এক্সট্রিমলি অ্যাডোরাস।

শ্রীগোপাল জুয়েলারির আশেপাশে ঘুরতে ঘুরতে এসব কথা আমার মনে আসে। নিজেই ভাবি, এসব ভাবনার সঙ্গে তো বর্তমানের আমির কোন যোগ নেই। ভাবি, আমার কি সাবর্ণীকে দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেল। ও রকম মেয়ের জন্য মাথা খারাপ হলে, মনোরোগ বিশেষজ্ঞেরা দোষ দেবে না সম্ভবত, কিন্তু মল্লিকা শুনলে নাক সিঁটকে বলবে, ভিমরুতি।

ওই শব্দটা বাহাত্তুরেদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আমার এ বয়সে খাটেই না। সাবর্ণী আমার স্বপ্ন দেখার সময়ের নারী, ও আমার সব কাজের গোপন প্রেরণা। সফল মানুষ বলতে যা বোঝায়, আমি তাই। তবু আমি ভিখিরি এবং এর জন্য দায়ী ওই সাবর্ণী।

সাবর্ণী দোকান থেকে বেরুতেই আমি ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ি।

সাবর্ণী মৃদু হেসে পাশ কেটে চলে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, আরে। কালাচাঁদ যে।

ওর মেয়ে নামটা শুনেই রুমালচাপা দিয়ে হাসি চাপে।

আমি বলি, কালাচাঁদ। সে আবার কে? আমি তো মানিক সোম। এত শিগ্‌গির নামটাই ভুলে গেলে।

সাবর্ণী মুখ চোখের চেহারা এমন করল যা দেখে আমি বুঝতে পারি ও দুঃখিত। এবং দেখতে পাই, ওর মেয়ে গম্ভীর মুখে সাবর্ণীর দিকে চেয়ে আছে। বেশ মজা লাগছিল আমার। তাই বুঝি বলি, তোমার মেয়ে নিশ্চয়ই, রূপে তোমাকে হারিয়ে দিয়েছে। মেয়েটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আর ততোধিক কালচে হয়ে গেল সাবর্ণীর। সুতরাং দুঃখ আমাকেও ছুঁয়ে গেল। মজা করতে গিয়ে কেন এমন করলাম। বললাম, মিছিমিছি মুখ কালচে করে আছ। দু'জনার বয়সের ফারাক কত তা একবার ভেবে দেখ। আমার ছেলে প্রীতিশ ফরেন সার্ভিসে জয়েন করবে মাসখানেকের মধ্যে, মেয়ে পাপা ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছে। জানি না, প্রীতিশের কোন অ্যাফেয়ার আছে কিনা, না থাকলে তোমার মেয়েটিকে আমি বুক করে রাখলাম। বলেই মেয়েটিকে এক ঝলক দেখে নি, সাবর্ণীকেও।

সাবর্ণী দুঃখ ভুলে গেল বুঝি। ও তৎক্ষণাৎ আমাকে সস্ত্রীক চায়ের নেমন্তন্ন করে বসে আজ বিকেলেই।

মেয়েটিও বলে, না করবেন না, আসতেই হবে।

সুতরাং ও প্রসঙ্গে না গিয়ে আমি ধাতস্থ হয়ে বলি, কালাচাঁদ নামটা তুমি কোত্থেকে পেলে?

সাবর্ণী লজ্জাবনত ভঙ্গিমায় বলে, সব পুরুষ মানুষকেই আমার কালাচাঁদ বলে মনে হয়। আমার স্বামীকেও। অবশ্য তুমি এখন ব্যতিক্রম, তুমি কালাচাঁদ নও, আমার কাছে কালোসোনা, মানে মানিক। বলেই উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে হাসে।

সত্যি বলতে কী, সাবর্ণীর মেয়ে ওর ধারে কাছে নেই। না চেহারায়, না রঙে। সম্ভবত মেয়েটি ওর বাবার চেহারা পেয়েছে। তবু মেয়েটিকে উপেক্ষা করা চলে না। যৌবনের জোয়ারে টলমল করে ফুটছে আবার শিশিরসিক্ত প্রভাতের ফুল বলেও মনে হয়। প্রীতিশের সঙ্গে বেমানান হবে না বরং প্রীতিশ এমন স্ত্রী পেলে বুক চিতিয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে। বয়সটা যে মেয়েটির আঠারো-উনিশ এটা ভুলে গিয়ে বাপ-মায়ের কোলে থাকা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যেমন করে কথা বলে, আমিও ঠিক তেমনি ঢং-এ জিজ্ঞেস করি, কী নাম তোমার?

মেয়েটি সলজ্জ ভঙ্গিতে বলে, শর্বরী। শর্বরী চট্টোপাধ্যায়।

নামটা ঠিকই শুনি। তবু আমার মনে হয়, শবরী। শ্রীরামচন্দ্রের দেখা পাওয়ার জন্য শবরীর প্রতীক্ষা—রবি বর্মার আঁকা রামায়ণের সুন্দর একটি ছবি আমার চোখে মুহূর্তের জন্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রীতিশ কি তবে ওর কাছে রামচন্দ্র! মুহূর্তের ভাবনায় আমি কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যাই। আমি নির্নিমেষে মেয়েটিকে দেখি আর এসব ভাবি।

সাবর্ণী বলে, কী অত ভাবছ মানিক?

ও যে আমার সঙ্গে সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলছে, তাতেই আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে যাই। বলি, না কিছু ভাবছি না। সৃষ্টি সুখ বলে যদি কিছু থাকে তো তোমরা—তুমি আর...

ওর নাম তোমার মনে নেই। পরিমল।

শর্বরী বলে, এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কতক্ষণ কথা বলবেন। তার চেয়ে চলুন না, আমাদের বাড়ি।

হ্যাঁ সেই ভাল। সাবর্ণীও ওর কথায় সায় দেয়।

এ টান ভীষণ টান। ভয়ানক আর সর্বনাশাও বটে। সবই বুঝি। তবু এত সহজে প্রীতিশের বাপ হয়ে হালকা হওয়াটা বোধ হয় প্রীতিশকে ছোট করবে ভেবে বলি, ঠিকানাটা দাও সস্ত্রীক না পারি, একাই যাব। আজ জয় মঙ্গলের পুজো হবে, মল্লিকা ওতেই হয় তো ব্যস্ত থাকবে।

আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, মা-মেয়ে ও কথায় কেমন চোখাচোখি করে। তাচ্ছিল্যের, উপেক্ষার না সম্ভ্রমের এসব বোঝার মত জ্ঞানবুদ্ধি আমার লোপ পায়। কেননা, সাবর্ণীর গায়ের গন্ধ আমি টের পাই। একটু ছোঁয়া যদি পাই তো পঞ্চাশেও আমি হয়তো চোখের জল আটকাতে পারব না। আমি ভিখিরির মত শুধু সাবর্ণীর দিকে চেয়ে থাকি।

সাবর্ণী সম্ভবত সব বোঝে। বলে, তোমার ঠিকানাটা আমাদের দাও। তুমি তো আর আমাদের যেতে সাধবে না। আমি আর পরিমল না হয় হ্যাংলার মত তোমার বাড়ি যাব। শর্বরী মৃদু ধমক দিয়ে বলে, খোঁচা দিয়ে কথা বল কেন? উনি কি একবারও আমাদের না যেতে বলেছেন।

ওর কথা শোনা মাত্রই আমার সারা শরীরে ঝরনার জল এসে লাগে। শরীর মন শীতল হয়ে যায়। অতি সতর্ক হয়ে পকেট হাতড়ে ছাপানো কার্ড বের করে শর্বরীর হাতে দিয়ে বলি, এ সবই প্রীতিশের কাণ্ড। আমার নামের কার্ড ও-ই ছাপিয়ে এনেছে।

মা-মেয়ে কার্ডে চোখ বুলিয়ে কেমন চুপসে যায়। ওদের ওই চুপসোনো চেহারা আমাকে ভীষণ গর্বিত আর উত্তেজিত করে তোলে। কিন্তু সে সব প্রকাশ না করে আমি বলি, এ ধরনের অফিসের

ম্যানেজিং ডিরেক্টর মানে খুব যে একটা দরের তা মনে করো না, মোটামুটি ডাল-ভাত জোটানো সংসার বলতে পার।

সাবর্ণীর মুখের মেকআপ গলতে শুরু করলেও ও নিজেকে যথেষ্ট সংযমী করেই বলে, বিনয় তোমার আগের মতই আছে দেখছি।

হাতঘড়িতে সময় দেখে একটু ব্যস্ত ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলে বলি, ঠিক আছে, পারলে আজই যাব। দাও তোমার ঠিকানা। বলেই সাবর্ণীর দিকে হাত প্রসারিত করে দি। ও-ও নিঃসংকোচে আমার হাতে হাত মিলিয়ে ঠিকানা গড়গড় করে বলে যায়।

আমি যেন আমাতে থাকি না। কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ি। এই ছোঁয়াটুকুর জন্যই কত না আকুলতা ছিল আমার।

প্রীতিশের বাবা আমি। ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দেখা ঠিক নয়। যে কাজে আমি বেড়িয়েছিলাম, সব ভণ্ডুল হয়ে যায়। মল্লিকাকে বাড়ি এসে কিছুই বলি না। নাকের কাছে ডানহাতটা নিয়েই টের পাই একরাশ চাঁপা ফুলের গন্ধ। বুঝি, এ গন্ধ প্রীতিশ এনেছে। অমন ছেলের বাপ হওয়া যে কী গর্ব তা যেন এই প্রথম টের পেলাম। প্রত্যাখ্যাত, অপমানিত আমি একরাশ সুগন্ধি ফুলের মাঝে বসে আছি। জামা খুলি না, পাখাও চালাই না। ঘেমো শরীরে এ সবই আমি ভাবি; আর ভাবতে আমার বড় সুখ হয়।

মল্লিকা এসে জানতে চায়, এমন করে আমি গরম ঘরে বসে আছি কী করে। কী করে ওকে বলি, আনন্দ আর সুখের স্রোতে ভাসছি আমি; আরো দু'দণ্ড চাঁপা ফুলের সুঘ্রাণ নিতে দাও। মনে মনে বলি, তুমি তো জান না, এতকাল আমি ভিখিরি ছিলাম, এখন আমি পৃথিবীর সব থেকে সেরা সুখী মানুষ। কিন্তু মুখে বলি, অনিয়মেরও একটা ছন্দ আছে, এতদিন তা জানতাম না, আজ জানলাম। মল্লিকা কী বোঝে জানি না, ও কথা না বাড়িয়ে পাখার সুইচ অন করে দিয়ে বলে, ঠিক আছে তুমি তোমার অনিয়মের আনন্দেই থাক। আমার অনেক কাজ বলেই চলে যায়।

ঝাঁক ঝাঁক স্মৃতির ভ্রমর গুঞ্জন তোলে। আমি বিভোর হয়ে গুনগুন গুঞ্জন শুনি। গভীর দিঘিতে যেমন সাঁতারুরা ডুব দেয়, আমিও সাবর্ণী দিঘিতে ডুবে যাই। এই মন-অবগাহন আমার সমস্ত সত্তাকে উজ্জীবিত করে। তন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষের মত আমি অনেক কিছুই ভেবে চলি।

প্রাক্ বিবাহ জীবনের কথা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গোপন থাকা ঠিক নয় মনে করেই আমি বহুবারই মল্লিকাকে সব বলতে চেয়েও বলতে পারিনি। মল্লিকাও যে খুব উৎসাহ দেখিয়েছে তা নয়, এই করে করে বাইশটা বছর পার করে দিয়েছি। এখন এতদিন পরে ওকে কি এসব বলা চলে? আমারই পঞ্চাশ পার হতে চলেছে, মল্লিকার সাতচল্লিশ। দু' ছেলে-মেয়ের বাবা-মা আমরা। সুখী, আশ্চর্য রকমের সুখী। শরীরের আকর্ষণ এখন আমাদের নেই-ই বলতে গেলে। এখন আমরা সঙ্গী, বন্ধু, সহমর্মী, বাইশ বছরের মধ্যে সাবর্ণীকে কি আমার মনে পড়েনি। পড়েছে, নিশ্চয়ই পড়েছে। মন তো আর জড় বস্তু নয় যে ওকে এক জায়গায় থামিয়ে রাখা যাবে। অনেকদিনই বিনিদ্র রাতে সাবর্ণীকে মনে পড়ত। মনে মনে ওকে নিয়ে কত সংলাপ চালাচালি করেছি, স্বপ্নও দেখেছি কত। সমুদ্র সৈকতে হাত ধরাধরি করে হেসে হেসে গড়িয়ে পড়েছি, বালির সৌধ নির্মাণ করে লুকোচুরি

খেলেছি তাব ইয়ত্তা নেই। ভয় পেয়েছি কত; মল্লিকা কিছু টের পেযেছে কি না। কিন্তু না, ওকে বিভোর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকতে দেখে রিমঝিম বর্ষার নূপুর বেজে উঠেছে আমার মনে। কোনদিনই নিজেকে প্রতারক বলে মনে হয়নি, আজ কেন যেন প্রতারকদের মুখ কেমন দেখতে হয়, জানার ভীষণ কৌতুহল হল। কিন্তু ভয় আমার বুকে খামচে বসে থাকে। কেননা, নিজের মুখে সবকিছুই যদি আমার কাছে অপরিচিত মনে হয তখন? এই ভয়েই আয়নার সামনে দাঁড়াতে পারি না।

মল্লিকা আবার ঘরে ঢোকে। কপালে ভাঁজ ফেলে আপাদমস্তক আমাকে দেখে বলে, কী হয়েছে বল তো তোমার?

ওর কথায় আমি ঘর কাঁপিয়ে হাসি। বলি, তুমি কি আমাব মাঝে নতুন কিছু দেখতে পেলে?

মল্লিকা অতশত বোঝে না, বলে, এর আগে কোনদিনই তোমাকে অনিয়মেব ছন্দে পায়নি।

তার মানে আমি কি মল্লিকার কাছে ধরা পড়ে গেছি। সাকসেসফুল ইয়াংম্যান প্রীতিশের বাবা হয়ে আমার তো এরকম কাজ সাজে না। আমি বাস্তবে ফিরে এসে বলি প্রীতিশের বিয়ে দিলে কেমন হয়? মল্লিকা হেসে অল্পবয়সী মেয়েব মত আচরণ করে আমাব গায়ে গড়িয়ে পড়ে। বাব্বা। তোমাকে নিয়ে আর পারি না, বলে মল্লিকা।

মল্লিকার এ হাসি আমি বিয়েব প্রথম প্রথম লক্ষ করেছি। আজ বিহ্বল হয়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাই।

মল্লিকা বড় বড় চোখ করে বলে, তোমাব কাণ্ডজ্ঞান কবে যে হবে? ওরা ভাগ্যিস দেখেনি। দেখলে কী লজ্জাই না হত।

আমিও বলি, দেখলে কী হত? ওরা তো আব দুধের বাচ্চা নয়, তা ছাড়া এ বয়সে নতুন করে যৌবন আসে শুনেছি। আজ সেটা সত্য প্রমাণিত হল। বলি বটে কিন্তু আমাব মনের পটে সাবর্ণীর মুখ ফুটে ওঠে। ভাবি, প্রীতিশের ব্যাপারটা জানার আগে পর্যন্ত সাবর্ণী আমাকে মূর্খ মনে করেছে। তাই অকপটে শর্বরীর সামনে আমাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতেও বাধেনি ওর। আমি সত্যি গাড়লের মত, মূর্খের মত ওব সঙ্গে লেগে থাকতাম। এক এক করে ও আমাকে সকলের সামনে হাস্যাস্পদ করেছে। মোটামুটি ভাল ছাত্র বলে, সাবর্ণী আমাকে গাড়ল জেনেও পাত্তা দিত। আর আমি সর্বস্ব উজাড় করে দিতাম ওকে। কিন্তু ওদের মত মেয়েবা পাবে না এমন জিনিস নেই। খেলার ছলে হয়তো খুনও করে ফেলতে পাবে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমি। আমি যখন ওকে নিয়ে বিভোর, সে সময় ও নিজের প্রতিষ্ঠাব দিকে এগিয়ে গিয়েছে। ফলে সাবর্ণীর থেকে আমাব দূরত্ব এত বেশি হয়েছিল যে লজ্জায় ওর সমুখেও আসতে পারিনি। পরে জেনেছিলাম, আমাকে নিয়ে ও মজা করেছে। একজনের মজা যে আর একজনের রক্তক্ষরণের কারণ হতে পারে, সেটা বোধহয় ওর ভাবনাতেও আসেনি। আমি আড়ালে চলে গিয়েছি, আর সাবর্ণী নিজেকে পল্লবিত করেছিল অসাধারণ হওয়ার কাজে। এসব কাহিনী যদি মল্লিকা জানতে পারে, আমার স্থির বিশ্বাস, ও নির্দ্বিধায় বলবে, ও তোমাকে হাসির খোরাক করে সকলের কাছে ছোট করেছে, এখন ওকে তুমি কাঁদিয়ে ছাড়ো, নাকানি-চোবানি খাওয়াও।

শুনেছি, মেয়েরা হিংস্র হলে রক্ষে থাকে না। বলি, সাবর্ণী বলে একজন মেয়ে আমার সঙ্গে

পড়তো। পরমা সুন্দরী। অনেকদিন পর ওর সঙ্গে দেখা হল, সঙ্গে ওর মেয়েও ছিল। মেয়েটি কিন্তু ফ্যালনা নয়। ও আমাকে আজই তোমাকে সঙ্গে নিয়ে চায়ের নেমন্তন্ন করেছে। না করতে পারিনি। কেননা, ও ছিল আমার স্বপ্নের নারী।

মল্লিকা জ্বলে উঠলো না বরং স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই বলল, যেতেও পারি। দেখি, তুমি তোমার স্বপ্নের নারীকে নিয়ে কী কর। চায়ের নেমন্তন্নটা উপলক্ষ, প্রীতিশের ঘাড় মটকাবার ফন্দি করছে ও।

ওর কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মাঝে বিজয়শঙ্খ বেজে ওঠে বুঝি। বলি, কথাটা হয়তো ঠিকই বলেছ, জান তো, প্রীতিশের জন্য ফুলের মালা নিয়ে অপেক্ষা করছে পৃথিবীর সেরা সুন্দরীরা। ওকে আমরা জীবনের সবক্ষেত্রেই সাকসেসফুল দেখতে চাই। সন্তান তো অনেকেরই হয়, কিন্তু আমার বলতে দ্বিধা নেই তুমি রত্নগর্ভা। মল্লিকা আমার স্তুতিতে আরও বিবশ হয়ে যায়। বলে, প্রীতিশকে আমি কিন্তু আড়ালেই রাখতে চাই। কী নাম ওর স্বামীর? কেমন দেখতে সে সব কিছু জান কি?

মুখটা আমার সম্ভবত লম্বা হয়ে ঝুলে পড়ে। ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে পাবি না চট করে। ভ্যাবলা মুখে বসে থাকি। মল্লিকার চোখে চোখ যেতেই দেখতে পাই, ওর সারা মুখ বিজবিজে ঘামে ভবা; কুচো চুল ঘাড়ে লেপটে আছে। আমার মনে হয়, আমার নাম মানিক না হয়ে রণজয় হলে ভাল হত। দুম করে প্রশ্ন করি, নামটা এফিডেবিট করে পাল্টালে কেমন হয়? ভাবছি মানিক পাল্টে রণজয় করবো।

মল্লিকা খিলখিল করে হেসে বলে, ছিঃ তুমি রণজয় হতে যাবে কেন? তুমি আমার সোনা মানিক। কী এমন যুদ্ধ জয় করেছ যে, ও নামটাই তোমার পছন্দ হল? কোনদিন হয়তো আমাব নাম পাল্টে ম্যাডোনা করতে বলবে।

আমি আঁতকে উঠি ওর কথায়। বলি, না, না, সে হয় না। আবেগ বশে গেয়ে উঠি, 'আমাব মল্লিকাবনে যখন প্রথম ধরেছে কলি...'

মল্লিকা আমার এ পরিচয় জানতো না। বাইশ বছরের বিবাহিত জীবনে কোনদিন আবেগবশত গান গাইনি; মল্লিকার বেসুরো গলার গান শুনে রাগ করা তো দূরের কথা, বাঃ বাঃ বলে তারিফ করেছি, সেই মল্লিকা আমাকে যেন নতুন করে দেখে। বলে, আশ্চর্য! এত সুন্দর গলা তোমার। কী করে পেরেছ, স্বর্গীয় সুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতে?

একবার বাজারে একজন চোরকে আমি দেখেছিলাম। ওকে পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছিল। অনেকেই ভিড় করে ওকে দেখছিল। লোকটা মুখ না নামিয়ে সকলকেই লক্ষ করছিল। আমি কিন্তু সেরকম পারলাম না। মুখে কোন কথা না বলে বলি, বাঙালি মেয়েরা স্বামীদের দেবতার আসনে বসায়। প্রীতিশের মা হয়ে তোমার কিন্তু এমন ভুল হওয়ার কথা নয়।

কথার জালে মল্লিকাকে কুপোকাত করেছি। ও আমার কথাকে ধ্রুব সত্য মনে করেও বলে, হয়তো ঠিকই বলেছ, কিন্তু তবুও বলছি, তোমার সুরজ্ঞান আছে।

সাবর্ণীর কাছে আমি মূর্খ গাড়ল কিন্তু মল্লিকার কাছে আমি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা আদায়ে একশোভাগ

সক্ষম ভেবে নিজেকে গর্বিত মনে করি। কিছু না হোক; আমি একটা কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর তো বটেই। ওই ডেজিগনেশনটাই তো মল্লিকা কেন, ছেলে-মেয়ের কাছেও গর্বের কারণ। আত্মীয়স্বজনেরাও আমাকে নিয়ে কিছুটা তো আত্মতৃপ্তি লাভ করেই এবং তা করে বলেই না ওরা কেউ-ই আমার একটা ডাককেও অস্বীকার করতে পারে না। পারি না পারি, সকলেই আমার কাছে কিছু না কিছু প্রত্যাশা নিয়ে আসে। এক একজনকে তো স্বপ্নের স্বর্ণশিখরে তুলে দিয়ে নির্বিকার চিত্তে ওদের দেখি আর মজা পাই। জানি, আমার এমন ব্যবহার প্রীতিশ সুনজরে দেখে না। প্রকাশ্যে কিছু না বললেও, আমি ওর মনোভাব টের পাই।

এসব ভাবনায় এখন আমি ডুবে থাকি। মল্লিকা দুম করে জিজ্ঞেস করে, তোমার গান গাওয়ার ব্যাপারটা কি সাবর্ণী জানে?

জানে। নিশ্চয়ই জানে। সাবর্ণী আমার স্বপ্নের নারী, ওকে করায়ত্ত করতে সর্ববিধ গুণের পরিচয় আমাকে তো দিতে হয়েছেই। সাবর্ণীর প্রশংসায় আমিও কী কম আত্মহারা হয়েছি। কিন্তু মল্লিকাকে এসবই গোপন করি। এসব ব্যাপারে আমার মাথা এতই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, নিজেই নিজের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলি, শাবাস মানিক; শাবাস।

সুতরাং নাম পাল্টানোর প্রশ্নটা যখন অতি সহজেই অস্বীকার করতে পারে মল্লিকা তখন ও নিয়ে বেশি মাথা ঘামাই না। আমি যে গোপনে গোপনে সুবিনয় রায়ের কাছ থেকে সুর, তাল, লয়ের জ্ঞান অর্জন করে চলেছি, তা অপ্রকাশ্যই রেখে যাই। বরং উল্টো চাল দিয়ে বলি, সাবর্ণীর গলায় না আছে সুর, না আছে তাল। কিন্তু সুন্দর মুখের জয় সর্বত্রই একথা তো তোমার অজানা নয়।

মল্লিকা দু'হাতে তালি বাজিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে, এক ফাঁকে ওকে গান গাইবার অনুরোধ করবো, কী বলো?

আমি জানি, মানুষকে দুঃখ দেওয়ার মাঝে এক ধরনের সুখ আছে। সে সুখকে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তবুও আমার কেন যেন মনে হয়, সাবর্ণীকে দুঃখ দিলে, সেই দুঃখটা ফিরে আমাকেই বিঁধবে। এ সত্য আমি পারি না মল্লিকাকে বলতে। অসহায় মানুষের মত মুখ করে জিজ্ঞেস করি, ছোঁ মেরে সাবর্ণীর স্বামী যদি বলে, গান উনি গাইবেন, তখন তুমি কি না করতে পারবে কিংবা এ-ও তো হতে পারে, সাবর্ণী উল্টো চাল দিয়ে আমাকে জালে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করবে। ও যা বুদ্ধিমতী তা তো অস্বীকার করতে পারব না। তখন? তখন কী হবে?

মল্লিকা মোটেই ঘাবড়ায় না। ও খুব স্মার্ট ভঙ্গিতে বলে, তখন আমি তোমার সেভিয়ারের ভূমিকা নেব। তাছাড়া তোমার গানের গলাও ভাল। ওদের কুপোকাত করতে আমাদের এতটুকু অসুবিধে হবে না। ঘরোয়া আসরে আমি মোটেই ঘাবড়াই না এটা মানবে নিশ্চয়ই।

পেছনের বাইশটা বছর যেন ধাঁ করে চাক্ষুষ করতে পারি। ফুলশয্যার রাতে মল্লিকা যে গান গেয়েছিল, তা আমি স্পষ্ট শুনতে পাই। 'পূর্ণ চাঁদের মায়ায়' গেয়েছিল মল্লিকা। সেদিন ওর সুর আর ওই গানের ভাষায় আমার মনে হয়েছিল, বিশ্বচরাচর চন্দ্রালোকে প্লাবিত হচ্ছিল আর চন্দ্রাতপে শীতল থেকে শীতলতর হয়ে যাচ্ছিল আমার দেহ-মন।

ওদিনকার কথা আমি রুণুকে বলেছিলাম। রুণু সব শুনে জ্যাঠামশাইয়ের মত মুখ করে

বলেছিল, কোন পুরুষই মেয়েদেব সামনে তোর মত ছোঁচামি করে না। ভাল লাগলেও হৃৎপিণ্ডেব অনেক নিচে বেখে দেয়, বুঝলি।

আমিও হো হো কবে হেসে বলেছিলাম, সাধে কি আর তোকে জ্যাঠামশাই বলি। ওরে গর্দভ, নাবীব মন পাওয়াব জন্য সাচ্চা প্রেমিক ঠা-ঠা রোদ্দুরেও শীতের কাঁপন টের পায়, যদি না পায় তো বুঝবি, ও প্রেমে ভেজাল আছে।

কণু 'ধ্যাত' করে আমাকে অবহেলা কবে চলে গিয়েছিল।

তবু মল্লিকাকে বোঝাবার জন্য বলি, প্রীতিশের জন্মের পর থেকে গান আব তুমি গাওই না। ও সব চর্চা ও সাধনার জিনিস। যদি হঠাৎ গলা বসে যায় কিংবা গানের কলি ভুলে যাও। তখন?

মল্লিকা অভয় দিয়ে বলে, তোমার স্ত্রী, প্রীতিশের মা আমি। ব্যাগের ভেতরে গীতবিতানের এক খণ্ড ঠিকই নিয়ে যাব দেখো। মানলাম, সাবর্ণী খুবই বুদ্ধিমতী কিন্তু ওর স্বামী সে তো হাবলা-গোবলাও হতে পারে।

মনে পড়ে সাবর্ণী ওব বিয়েতে আমাকে নেমন্তন্ন করেনি। অথচ, ওর বিয়ের খবরটা জেনেছিলাম যাদের মুখ থেকে, তারা কিন্তু সাবর্ণীর প্রিয়জনের তালিকাভুক্ত ছিল না মোটেই। ওরা সব ক'জনই ছিল ধেড়ে ছুঁচো। সান্ত্বনা দেবার ছলে সুঁচ বিঁধিয়ে বলেছিল, সাবর্ণী খুব হিসেবি তো, তাই বুঝি তোর উপহাব দিতে কষ্ট হবে জেনেই তোব বাড়িমুখো হয়নি। হয়তো দেখবি, অষ্টমঙ্গলা করতে এসে ও ছুতো কবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে তোর সঙ্গে দেখা করে যাবেই। বলেই মুখ টিপে হেসেছিল ওরা।

আমার সেসব এখনও মনে আছে। ওই ছুঁচোগুলোর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। ওদেব কদর্য মুখগুলো আমি খুব সহজেই ভুলে গেছি, কিন্তু সাবর্ণীকে ভুলতে পারিনি। ওর দেওয়া অদৃশ্য আঘাত আমাকে বলিষ্ঠ কবেছে, শানিত করেছে। সুতরাং সাবর্ণীর কাছে আমি ঋণীও কম নই। আজ আমি যা, তার নব্বুই ভাগের জন্যই দায়ী সাবর্ণী। এটা কোনদিনই ও জানতে পারবে না, বুঝতেও পারবে না। আমাব এসব ভাবনা এত দ্রুত ঘটে যায় যে, মল্লিকা তা ধরতে পারে না। তাই চট করে মল্লিকার শেষ কথাটা আমার মনকে বেদনায় ভরে দিলেও হেসে বলি, না, না; ওর মতন মেয়ের স্বামী কি হাবলা-গোবলা হতে পারে?

সে সবের জন্য মল্লিকা অত ভাবে না। বলে, প্রীতিশের বিয়ের ব্যাপারটা হঠাৎ যদি প্রস্তাব দিয়ে বসে তো কী করবে তখন?

পুত্র গর্বে গর্বিতা মল্লিকার মুখ ভরাট দিঘির মত দেখতে পাই। বলি, ছেলে আমাদের ঠিকই কিন্তু প্রীতিশেরও ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে কথা আছে। সুতরাং প্রীতিশের মন না জানা পর্যন্ত, আমরা যে মত দিতে অপারগ এ কথাটা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেই হবে। আর শোন, ওর বাড়িতে যাবার আগে পাপাকে বলে রেখো ঠিক কুড়ি মিনিট পরে ও যেন আমাকে ফোন করে। যা বলার আমিই বলবো। কেননা, আমার মত মানুষ যে সব সময়ই ব্যস্ত এটা বোঝাতে হবে তো সাবর্ণীকে।

মল্লিকার একটা গুণ আমি প্রশংসা না করে পারি না। ও কখনো আমার কোন বিষয়ে অত বেশি মাথা ঘামায় না। ও বোঝে, আমার কৃপা লাভেচ্ছু মানুষের সংখ্যা খুব কম নয়। আর আমার মত

মানুষের দায়িত্ব যে সংসারের খুঁটিনাটি কাজের থেকে অনেক বেশি সেটা ও ভাল মতই জেনে গেছে। মল্লিকা ঘরের কাজে চলে যেতেই আমি সুখের ভেলায় গা ভাসিয়ে দি। ভেলাটা ভাসতে ভাসতে এক সময় হঠাৎই শ্রীগোপাল জুয়েলারিতে ধাক্কা খেয়ে থমকে যায়। এতক্ষণ পর হঠাৎই আমার মনে পড়ে, সাবর্ণী ওর মেয়েকে নিয়ে জুয়েলারিতে গিয়েছিল কেন? গয়না বাঁধা দিতে নয়তো? নাকি একটু একটু করে মেয়ের বিয়ের গয়না গড়িয়ে রাখছে? দুই-ই হতে পারে। কিন্তু আমার মনে বিদঘুটে একখণ্ড মেঘ মনকে বিষণ্ন করে দেয়। সত্যিই যদি অর্থাভাবে পড়ে সাবর্ণী সোনাদানা বাঁধা দিতে যায় তাহলে, এক্ষেত্রে আমার কী করণীয় ভাবতে গিয়ে বুঝি মাথাটা আমার ভার। অসম্ভব দুশ্চিন্তায় আমার রগের শিরা দপদপ করতে থাকে। গলা-বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, অজস্র কাঁটার আঘাত ক্রমশ আমাকে রক্তাক্ত করে দিতে থাকে, মনে মনে যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেলেও প্রীতিশ, পাপা বা মল্লিকা সে সব টের পায় না।

প্রীতিশ বয়স্ক মানুষের মত মুখ করে বলে, বাপি, পাঁচ-বছরের বন্ড দিয়ে কুয়েত গেলে মন্দ হয় না। ও ক' বছরেই যা রোজগার করবো, তাতে মনে হয় দুটো পুরুষও শেষ করতে পারবে না।

আমি হা-মুখ করে প্রীতিশের দিকে চেয়ে থাকি। যার অত ব্রাইট কেরিয়ার, তাকে এখন থেকেই অর্থ চিন্তায় মসগুল দেখে আমার খুব কষ্ট হয়। টাকার চিন্তা ওর মাথায় এল কেন? ওকে পরিপূর্ণ করার জন্য আমি তো সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছি। আমার যা যা খামতি তা ওর মাঝে পূর্ণ হোক এটাই তো আমি চেয়েছি। ফরেন সার্ভিসে যোগ দিয়ে বদ্ধকূপ থেকে বৃহত্তর জগতে যাবার যার স্বপ্ন, তার হঠাৎ এ মতিভ্রম কেন?

আমাকে কোন উত্তর দিতে না দেখে প্রীতিশ কেমন যেন হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, আমি কি অসুস্থ? অসুস্থ তো বটেই। সাবর্ণী আমাকে অসুস্থ করেছিল. প্রীতিশের সাফল্যে সুস্থতা ফিরে পাচ্ছিলাম। কিন্তু সেই প্রীতিশই আমাকে অসুস্থ করে দিচ্ছে। আমি হ্যাঁ-না কোন উত্তর না দিয়ে থমথমে মুখে একটার পর একটা সিগারেট শেষ করি।

প্রীতিশ-পাপা-মল্লিকা আমার ঘরেও ঢোকে না। আর ঢোকে না বলেই বুঝি আরও বেশি দুঃখ আমাকে স্পর্শ করে না, কেননা, মানুষের জীবনে এক একসময় একাকীত্বের ভীষণ মূল্য আছে।

মল্লিকা গান গাইছে শুনতে পাই। বোধ হয়, সাবর্ণীর বাড়িতে গিয়ে না ঠকতে হয়, তারই আপ্রাণ চেষ্টা। ফলে আমি কিছুটা ধাতস্থ হই। অন্তত সাবর্ণীর দেওয়া দুঃখ যে আমাকে এতকাল পীড়িত করেছে, অপমানিত করেছে, সেটা যে মল্লিকা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে, এই ভাবনা আবার আমাকে কিছুটা সুস্থ করে তোলে। আর ঠিক তখনই সাবর্ণীর সঙ্গে আমার সংলাপ চালাচালি শুরু হয়। বলি, তুমি তোমার বিয়েতে আমাকে নেমন্তন্ন করনি কেন?

সাবর্ণী হেসে বলে, জান তো স্টেশানের কাছের লোকরাই ট্রেন ফেল করে। তোমার নাম আমি সকলের আগে লিখেছিলাম। ভেবেছিলাম, দূরের যারা তাদের আগে ও পাট সেরেনি। তারপর তোমাকে নিরালায় সব জানাব। মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে মানিক, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

আমার দু'চোখ দিয়ে কি জলের স্রোত নামছে এখন? নাকি আমি বিজয় উল্লাসে মেতে উঠছি। আসলে এসব কিছুই হয় না। ক্রমশই আমি আরো জটিল জালে জড়িয়ে পড়ি।

যেমন করে সাবর্ণীর দেওয়া অপমান ও জ্বালাকে দূরে সরিয়ে নিজেকে ধারালো করার চেষ্টা করেছি, এখন আবার আমার সে রকম মনের অবস্থা হতে চলল। ভাবি, প্রীতিশের ব্যাপারে আমার দুঃখ না পাওয়াই উচিত ছিল। নদীর গতিপথ যেমন পরিবর্তিত হয়, তেমনি মানুষের জীবনের চলার ছন্দও তো পাল্টাতে পারে। বিশেষ করে, আমি তো ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তবে কেন ছেলে-মেয়ে-স্ত্রীর আচরণে আমি স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারছি না। এর উত্তরও আমার মাথায় ধাঁ করে এসে পড়ে। তা হচ্ছে সংস্কার। আজন্ম সংস্কারকে উপেক্ষা করার সাধ্য কারোরই থাকে না। যাদের থাকে তাদের ব্যতিক্রমী বলা যায়। প্রীতিশের পিতৃত্ববোধই আমাকে সংস্কারের গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলেছে।

হঠাৎ পাপা এসে আমার সবকিছুকে কেমন নাড়িয়ে দিয়ে বলে, আজ এ বাড়ির কী হল বলো তো? তুমি নিউজ পেপারে চোখ বোলালে না, এরই মাঝে দু'তিনবার চা খাও, তাও খেলে না, দাদার মুখ ভার, মা গান গাইছে, এ সবের মানে কী?

পাপার এসব প্রশ্ন তো নয় যেন ফুরফুরে একমুঠো দখিনা হাওয়ায় ভরে যায় ঘরটা। আমি এই প্রথম যেন লক্ষ করি, পাপা সুন্দরী, অতীব সুন্দরী। তার ওপর সু-সংস্কৃতির ছাপ ওর সর্বাঙ্গে। উজ্জ্বল এক জোড়া চোখ; ধনুকের মত এক জোড়া ভুরুর মাঝে মেরুন রঙা টিপ। শালোয়ার কামিজ পরা সুঠাম সুন্দর দেহ। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে আমি সাময়িক বাক্‌হারা হয়ে যাই। পাপার প্রশ্নে সজীব হয়ে উঠি। বলি, বাড়িটা আজ অনিয়মের ছন্দে ভরা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলি, পাপা মানুষের সুখ কিসে?

পাপা বলে, নিজস্বতার মাঝেই সুখ। কেন জান, বিকেলে বেথুন কলেজের ফুটপাথে একদিন সব হারানো মানুষ-মানুষীকে সাংসারিক কাজে ব্যস্ত দেখি। ইটপাতা উনোনে, কেউ মাছ ভাজছে, কেউ ভাত ফুটোচ্ছে। আবার কারো সাজগোজের শেষ নেই। বুকের ওপর সন্তান নিয়ে কেউ কেউ আদরে সোহাগে টইটুম্বুর। অথচ, কী আছে ওদের বলো? মনে হয় ওদের সুখ নেই- বিশেষ করে আমরা যাকে সুখ মনে করি। প্রকৃতির সঙ্গে লুকোচুরি খেলে ওরা। রোদ-ঝড়-জলকে তোয়াক্কাই করে না। অথচ আমরা? তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারে, মনের মাঝে মেঘ জমিয়ে তুলি। সুতরাং বুঝতেই পারছ, সুখ কথাটা ছোট হলেও ওর ব্যাপ্তি অনেক। একটানা কথা বলে যায় পাপা প্রায় মুখস্থের মত। তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে, তোমার দুঃখ কী তা জান?

আমি সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলতে চেষ্টা করি, আমার কোন দুঃখই নেই পাপা।

পাপা ঘর কাঁপিয়ে হাসে। বলে, তুমি কি মানুষ নও নাকি যে দুঃখ থাকবে না?

ওর হাসি শুনে মল্লিকা আর প্রীতিশও ছুটে আসে।

এমন মজার কথা পাপা এর আগে যেন শোনেইনি। প্রবল বাতাসে গাছ-গাছালিরা যেমন দুলতে থাকে ঠিক তেমনি দোল খাওয়া ভঙ্গিতে ও সকলকে শুনি য় শুনিয়ে বলে, বাপির নাকি কোন দুঃখ নেই। রক্ত-মাংসের মানুষের সুখও থাকে, দুঃখ থাকে। তাই না মা, তাই না দাদা?

মল্লিকার মুখের সর্বক্ষণের আলগা হাসি এখন আর চোখেই পড়ে না। প্রীতিশ কোন উত্তর না দিয়ে চলে যায়। মল্লিকাও পাপাকে ইশারায় ঘর থেকে চলে যেতে ব'লে, আমার গায়ে গা ঘেঁষিয়ে

বসে বলে, ওদের ব্যবহারে তুমি ক্ষুণ্ণ হয়ো না। মল্লিকার আদর পেতে আমার খুব ভালই লাগে। অনেকদিন পর ও এমন করে আমার কাছে বসল। মনে হল, ওর সারা শরীর থেকে চাঁপা ফুলের গন্ধ ঝরছে। যে গন্ধ আমি সাবর্ণীর কাছে পেয়েছি, ঠিক সেই গন্ধ।

সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েছে বুঝি। মল্লিকা উঠে গিয়ে চা এনে আমার মুখোমুখি বসল। কী কারণে ও হঠাৎ রুণুর প্রসঙ্গ তুলল।

চায়ে চুমুক দিয়ে স্বাভাবিক গলা করে বলি, ও এখন কোথায় কিছুই জানি না। হয়তো এখনও আগের মতই আছে। এলোমেলো গলিতে এখনও বুঝি ঘুরে বেড়ায়। অকিঞ্চিৎকর বস্তুর মাঝে ও এমন কিছু খুঁজে পায় যে, সে সবই স্কেচ করে রাখছে। নির্বান্ধব হয়েই রইল রুণু। একাকিত্বের সঙ্গে ওর গভীর প্রণয়।

মল্লিকা অতশত বোঝে না। নেহাতই কথার কথা বলেছে, নয় তো আমার মন বুঝে নিল। তাই ও আর রুণুর প্রসঙ্গে কথা না বাড়িয়ে বলে, যাবে নাকি সাবর্ণীর কাছে? ওকে যে কথা দিয়েছিলে? মেয়েটাকেও না হয় একবার চোখের দেখা দেখে আসি।

মল্লিকাকে এখন খুবই রহস্যময়ী বলে মনে হয়। সাবর্ণী আমাকে দুঃখ দিয়েছিল, অপমান করেছিল, এসবই ও যেন বুঝতে পেরেই কি সাবর্ণীর বাড়ি যাবার জন্য উৎসাহ দেখাচ্ছে? নিজেকে সাবর্ণীর সঙ্গে তুলনা করার জন্যই কী? জানতে চায় কি, ওর মাঝে এমন কী সম্পদ আছে যা মল্লিকার নেই? পাপা ঠিকই বলেছে, মানুষ বড়ই স্বেচ্ছাচারী। মানুষ নিজের সুখ-দুঃখ নিজেই আনে। যখন কোনটারই কুল-কিনারা পায় না, তখনই দোষের ভাগী করে তোলে অন্যকে। এই ভাবনা আমাকে মেঘমু্ক্ত করে। আবারও একটা মজার খেলায় আমি চেপে বসি। আর একটু বাজিয়ে দেখি না কেন মল্লিকাকে। বলি, তোমার কি মনে হয় সাবর্ণীর সঙ্গে রোজই আমার দেখা হয়?

মল্লিকা অষ্টাদশীর মত ভঙ্গি করে বলে, তুমি মিছিমিছি সময় নষ্ট করছো। ওর বাড়ি যাব আর সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব। আমি কিন্তু তৈরি হয়ে নিচ্ছি, বলেই মল্লিকা চলে যায়। আমার তো কিছুই করার নেই। মল্লিকার হাতের পুতুল এখন আমি। জানি, ওর সাজগোজ করতে সময় লাগবে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে, প্রীতিশের মত সফল সন্তানের পিতা হয়ে, আমি কি পারি সাধারণের মত পোশাক আশাক করে বেরুতে। নিজেকে যথাসম্ভব সাজিয়ে গুরুগম্ভীর একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে সামান্য ফরেন সেন্ট গায়ে স্প্রে করি। ব্যাকব্রাশ করা চুলে হেয়ার স্প্রে-ও লাগাই। ড্রয়ার খুলে দামী ফরেন সিগারেটের প্যাকেট বের করে লাইটার নিতেও ভুলি না। যাই হই না কেন, সারা জীবন যে নারী আমাকে ভিখিরি করে রেখেছে তার কাছে সাধারণের মত যাওয়া যায় না। নিজেকে ঠিকঠাক করে নিয়ে আমি মল্লিকাকে ডাকি।

মল্লিকা আটপৌরে শাড়ি পরে অতি সাধারণ মহিলার মত এসে বলে, দ্যাখতো, ঠিক সাজ হয়েছে কিনা?

কী বলবো, আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে মল্লিকাকে লক্ষ করি। ওকে এ মর্ত্যের মানবী বলে মনেই হয় না। আমি নেশাগ্রস্ত মানুষের মত ওর দিকে চেয়ে থাকি শুধু। মল্লিকা কিন্তু একবারও আমাকে 'এত সাজ সেজেছি কেন' এমন প্রশ্ন করে না।

নিচে নামতেই ড্রাইভার সেলাম ঠুকে দাঁড়ায়।

ওকে বলি, আজ ওর ছুটি।

ড্রাইভার চলে যেতেই মল্লিকা খুশীর গলায় বলে, ও কথা ড্রাইভারকে আমিই বলতাম। তুমি কী করে আমার মনের খবর পেলে?

গাড়ি তো নয় যেন সেই ভেলাটা আমার সামনে এখনও টলটলে জলের ওপরে দোল খাচ্ছে।

বিহ্বল ভঙ্গিতে বলি নদী, জলস্রোত, ভেলা এসব কি তুমি দেখতে পাচ্ছ?

মল্লিকা সহাস্যে বলে, তোমার সঙ্গে আছি, এসব কী না দেখে পারি।

প্রীতিশ দেখে? পাপা?

মল্লিকা ঠিক আগের মত ভঙ্গি করে বলে, নিশ্চয়ই দেখে। আমাদেরই সৃষ্টি তো ওরা।

প্রীতিশ তবে কেন টাকার স্বপ্ন দেখে? পাপার কেন বয়ফ্রেন্ড নেই?

মল্লিকা ও সবের কোন উত্তরই দেয় না। বলে, আর দেরি করো না। চলো, আজ কিন্তু আমি গাড়ি ড্রাইভ করবো।

মল্লিকা ক্রমশই আমার মুগ্ধতার জগৎকে বাড়িয়ে দেয়। ওকে বাধা দেব এ সাধ্য আমার থাকেই না। মল্লিকা গাড়ি চালাতে শুরু করে। আমি চোখ বুজে ওর গায়ের ঘ্রাণ নি।

হঠাৎ ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করায় মল্লিকা। বলে, কতদিন পরে গঙ্গার তীরে এলাম।

তাই তো। জলের গন্ধ নাকে আসে। ছলাত-ছলাত শব্দও শুনতে পাই। আলোর মালায় সেজে আছে গঙ্গা।

মল্লিকা বলে, সাবর্ণী কি এর থেকেও সুন্দরী?

বলি, যাঃ, কী যে বল না।

এখনও সময় আছে, যাবে নাকি সাবর্ণীর বাড়ি? মল্লিকা প্রশ্ন করে।

বলি, না মল্লিকা না।

মল্লিকা বলে, ও তোমার স্বপ্নের নারী হয়েই থাক।

কোন উত্তর দিই না। কথা বললেই ছন্দপতন ঘটবে এই ভয়ে মল্লিকার চোখের দিকে চেয়ে দেখি, স্বপ্নের নারী এ দুটো চোখের মাঝেও আছে। বড় সুখ, বড় সুখ।

খারাপ হাওয়া পেরিয়ে

বসিরহাটে আর কোনদিন ফিরবে না, ফিরতে পারবে না বৃন্দাবন। পিছুটান বলতে ওর আর কিছুই নেই। বাচ্চা বউটাকে নিয়ে দিন এনে দিন খেটে বেশ চলছিল। তাও বছর দেড়েক হ'ল শেষ হয়েছে। স্যাঁতস্যাঁতে মেঝেয় শুয়ে দিন কয়েক ভুগে পদ্মরাণী বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চলে গেল। ধার কর্জ করে মাথার চুল বিকিয়ে গিয়েছিল, এবার শেষ সম্বল ভিটে না ছেড়ে উপায় রইল না। ওতে বৃন্দাবনেব খুব যে একটা লোকসান হল, বলা চলে না। ঋণ শোধ কবেও হাতে করকরে শ' খানেকের মতো টাকা পেল। টাকাগুলো ওর হাতে দিতে দিতে হাবান পাল বলেছিল, 'ছেলেবেলা থেইকে চিনি তোকে। এ্যামন করতি পানে বড় ব্যতা পাই। আমাব সব কটা ছেইলে খচ্চরের বাপ হইয়েছে। গদাই লস্করি চাল মেরে ঘুইরে বেড়ায়, এ-বেড়ে ও-বেড়ে যায়, মাগী নাচায়, রাইত কাটায়। বাপ হয্যে ছেইলেদেব বড় ডরাই । কোনদিন শোরেব বাচ্চাবা গলাব নলি কেট্যে খেল খতম কইরে দেবে। বেন্দা, দুঃখ করিস না। কথায় বলে না, দুষ্টু গরুব চাইয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। বেশ আছিস তুই। তো'র সত্তুব ক্যাবল যম। খেলে যা ওনার সঙ্গে বং মিলুন্তি আর আমার শত্তুর যম আব ব্যাটারা। তিন তাসের খেলা চলছে তো চলছে। কেউ শালা শো দিচ্ছে না। সব কটা খেঁকুড়ে খচ্চর— আমি, যম আর ব্যাটারা। বলি কী, এই ক' ট্যাকায় কী-ই বা কববি। টেশানে গিযে পান বিড়ি ব্যাচ। প্যাটও চইলবে, মাথার ওপবে ছাউনিও থাইকবে। শ্যালদায় গেলি নিচ্চয, তোর সঙ্গে দেখা কইরবো।'

মরা মাছের মতো ফ্যাকাশে চোখে হাবান পালের সব কথা শুনছিল বৃন্দাবন। অবাক হ'ল এই ভেবে যে, যে দোষের কথা ছেলেদের ওপব চাপিয়েছে হারান, সে সব দোষই ওর আছে। বিয়ে করা বউ ছাড়াও দু'দুটো রক্ষিতা রেখেছে হারান, একটাকে রেখেছে বারাসাত আব একটাকে রেখেছে বারুইপুরে। এছাড়াও কলকাতাব নামী পাড়ায যাতাযাত আছে ওর। কিছুই গুছিয়ে ঠিকঠাক বলতে পারে না বৃন্দাবন। ঠোঁট দুটো শুধু বিড়বিড় কবে, ভাষা বেবোয় না।

ধূর্ত চোখে তাকিয়ে হারান বলেছিল 'কী য্যান বলবি বলবি করতিছিস। শেষ ব্যালায় মনের কথা বল্যে যা বেন্দা'।

বৃন্দাবন তবুও কিছু বলেনি।

হারান কি মনে করে বৃন্দাবনের হাতে আরও গোটা কুড়ি টাকা দিযে বলেছে, 'এটা রেখ্যে দে বেন্দা। ওই খচ্চরগুলোকে বলিস না।' আর দাঁড়ায় নি হারান। বিশ পঁচিশ পা এগিয়েই ফের ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিল. 'সময় পালি মাঝে মাঝে চল্যে আসিস। বাল্যকালের সবাই তো সটকে পড়ছে।

বাকী তুই আর মেধো। তা শালা, মেধোর জন্য কোন দুঃখ নেই আমার। ও হারামি বউ পেটায়, আর বছর বছর এট্টা এট্টা জন্ম দ্যায়। নিষ্ঠুর। লম্বা শ্বাস ফেলে বড় বড় পা ফেলে উধাও হয়ে' যায় হারান।

কড়া রোদ ওঠার আগেই বৃন্দাবন বসিরহাট ছাড়ে। ট্রেনে উঠে ও শেষবারের মতো বসিরহাটের হাওয়া গায়ে লাগায়। দু'একটা পাখির ডাক ওর কানে আসে। গাছের পাতাগুলো ঝিরঝিরে বাতাসে দোল খায়। মনে পড়ে এরকম সময়েই তো বিষ্টুচরণ গান গেয়ে বেড়ায় পাড়ায় পাড়ায় ছেলের হাত ধরে। রোজই ওর বাড়ির দাওয়ায় বসে দু'চারটে কথা বলে চলে যায়। আজ বিষ্টুচরণ কি আসবে ওর বাড়ি? নাকি ও- ও টের পেয়েছে বৃন্দাবনের সব কথা?

ট্রেন এসে থামে শেয়ালদায়। একটা পোঁটলা বগলদাবা করে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছায় একটা গাড়ি-বারান্দার নিচে। ট্যাকে গোঁজা টাকাগুলোকে অনুভবে টেব পায ও। খিদেয় পেট মোচড়াচ্ছে। একটা দোকান থেকে পাউরুটি কেনে। কলাইকরা বাটিতে ফুটপাথের চায়ের দোকান থেকে চা নিয়ে রুটি ডুবিয়ে খায়। খাওয়া শেষে একটা বিড়ি ধরায় বৃন্দাবন। বিড়িতে দু' তিনটে টান দিয়েছে, ঠিক সে সময় ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে একজন মেয়েছেলে ওর দিকে এগিয়ে এসে দাঁড়ায়। নিম্নাঙ্গটা ধনুকের মত বাঁকা, কিন্তু শরীরে যৌবন আছে টের পায় বৃন্দাবন। ঝামা কালো গায়ের রং, চুলগুলো উড়কো-ঝুড়কো।

মেয়েছেলেটা চিল-চিৎকার গলায় তুলে বলে, 'এ জায়গা আমার। তিন বছর ধইরে রইয়েছি। যা যা সরে পড়।' বলেই বাঁকা পা দিয়ে বৃন্দাবনের পোঁটলায় লাথি মারে।

বৃন্দাবনও ক্ষ্যাপা মোষের মতো রেগে যায়। বলে, 'তোর বাপের জায়গা। তিন বছর ধইরে রইয়েছিস তো কি হইয়েছে? ক' টাকায় কিনিছিস জায়গাটা!'

মেয়েটা আরও গলা চড়িয়ে জোর দিয়ে বলে, 'হ্যাঁরে মুখপোড়া, এ্যাটা আমার বাপের সম্পত্তি। যা ভাগ। ব্যাটাছেইলে হয়ে হাত পাততি নজ্জা করে না? গতর খাটা, গতর খাটা। যা ভাগ।'

বৃন্দাবনও যাবে না আর ও-ও ওকে থাকতে দেবে না ওখানে। টানাটানি, হ্যাঁচড়া-হ্যাঁচাড়িতে লোক জমে যায়। সবাই খুব মজা দেখে। কেউই কিছু বলে না। মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে যে যার চলে যায়।

বৃন্দাবন বোঝে, ধনুকের মতো বাঁকানো পা হলে কি হবে, ছিলার মতো টানটান মজবুত ওর মন। গায়ে জোর খুব। তার চেয়ে গলার জোর বেশি।

বৃন্দাবন শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে, 'আমি এক পাশে পইড়ে থাকব তো তোর কি?'

মেয়েটা বলে, 'আমি মেইয়েছেলে, আমার ইজ্জত আছে। তুই যেখেনে খুশী যা, তা আমার কি?'

বৃন্দাবন ফের একটা বিড়ি ধরিয়ে পোঁটলা বগলে নিয়ে বলে, 'আমি থাকলি তোর কী খেতি?'

'খেতি অনেক। ও তুই বুঝবি না।' মেয়েটা সরোষে উত্তর দেয়।

হে হে করে হেসে বৃন্দাবন বলে, 'কোথায় ছিল তোর বাড়ি?'

'বসিরহাট। আর তোর?'

আবারও হেসে উত্তর দেয় বৃন্দাবন, 'আমারও তো বসিরহাট।'

মেয়েটি বলে, 'আমার নাম নক্ষ্মীমণি।'

বৃন্দাবন উত্তর দেয়, 'আমার বউ-এর নাম ছিল পদ্মরাণী।'

'বউ সট্‌কেছে বুঝি নাগরের সঙ্গে?'

হে হে করে হেসে ফেলে বৃন্দাবন। বলে, 'ও নাগর তোরও একদিন জুটবে।'

'দুর হ' বেজন্মার ব্যাটা। পুরুষ মানুষেব মুখে এই নাথি।' বলেই বাঁকানো একটা পা আকাশের দিকে তুলে লাথি মারতে থাকে।

আরও মজা পায় বৃন্দাবন। বলে, 'সে নাগর নয়, সে নাগর নয়।'

'পুরুষই তো নাগর হয়।' লক্ষ্মীমণির চোখে জিজ্ঞাসা।

আগের মতোই হে হে করে হেসে বৃন্দাবন উত্তর দেয়, 'এ নাগরের কাছে তোকে আমাকে দু'জনাকেই একদিন যাতি হবে।' সামান্য সময় থেমে বৃন্দাবন বলে, 'বড়হারামি নাগব রে ও শালা।'

নারী বুদ্ধিতে অত শত কুল পায় না লক্ষ্মীমণি। বলে, 'থাকতি পারো কিন্তু' ... কিছুক্ষণ কি ভেবে লক্ষ্মীমণি শান্ত গলায় বলে, 'রেইতে কাছে ঘেঁষিছ কি থান ইট মেরে মাথা ভেঙে দুবো।'

পোঁটিলা খুলে একখানা ছোট আযনা বের করে বৃন্দাবন বলে, 'এই চ্যায়রায় এত দেমাক কিসেব। দ্যাখ দ্যাখ, ভাল কইরে শবীলটা দেখ্যে নে।'

লক্ষ্মীমণি দুঃখীর মতো গলা করে বলে, 'জানি। শ্যালেও ছোঁয় না।'

'জানিস যখন তখন অত ফ্যাচর ফ্যাচর করিস ক্যান?'

'জানি না।' বলেই ছেঁড়া কাপড়ের আঁচলে মুখ ঢেকে চুপ করে বসে থাকে লক্ষ্মীমণি।

রাত বাড়তেই অন্য আর দখলদারেরা এক এক করে এসে জড়ো হতে থাকে গাড়ি বারান্দার নিচে। চট, ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে জায়গা পরিষ্কার করে গামছা কিংবা ছেঁড়া ধুতি শাড়ি পেতে একে একে শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে এর ওর সঙ্গে কথা বলে। মেয়ে পুরুষ সকলেই বিড়ি ফোঁকে। অধিকাংশ পুরুষদেরই খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কাঁচায় পাকায় মেশান। হাড্ডি সার চেহাবা। বিভিন্ন বয়সের । বৃন্দাবন লক্ষ করে, ওদের প্রত্যেকের সঙ্গেই রয়েছে একজন করে মেয়েমানুষ। যেমন পুরুষগুলোর চেহারা, তেমনি মেয়েদেরও। এতক্ষণ চামসে গন্ধ ছিল না; ক্রমশই জায়গাটা ভরে যায় চামসে গন্ধে। গা বমি বমি করে ওঠে বৃন্দাবনের। ও আরও লক্ষ করল, কেউই লক্ষ্মীমণির সঙ্গে কথা বলল না। ওদের সব কথাই শুনতে পাচ্ছিল। সব কথাই হচ্ছে খাওয়ার। বৃন্দাবন জানে, কোন কোন মাসে লগনসার ধুম।

নকুল নামে একজন খেঁকুড়ে গলায় বলে, 'নেংড়ি অ্যাদ্দিনে পুরুষ জুটাইছেরে পালান।' বলেই ফিচেল হাসি হাসে।

পালান উত্তর দেয়, 'তাই তো দেখতিছি; পুরুষ না থাকলি কি মেইয়া ছেইলের চলে?'

লক্ষ্মীমণির গলা অমনি উপচে ওঠে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ সব বেত্তান্ত জানি। সব তো সতী নক্ষ্মী নিয়ে আছিস। ঢ্যামনার ব্যাটারা কতা কোস কোন মুয়ে?'

বৃন্দাবন অবাক হল এই দেখে যে, ওদের তরফ থেকে কোন প্রতিবাদ হল না। কেমন নির্জীবের

মতো বসে বসে বিড়ি ফোঁকে, নয় তো শুয়ে পড়ে। বৃন্দাবন আকাশের দিকে মুখ করে চেয়ে থাকে কিছু সময়। দেখে, আকাশে মেঘের লেশমাত্র নেই। কি মনে করে লক্ষ্মীমণিকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, 'বিষ্টি হবেনি য্যাখন ত্যাখন এট্টু দূরেই শুয়ে পড়ি। কি বলিস?'

লক্ষ্মমণি উত্তর দেয়, 'ক্যান? শুনলি না ওয়াদের কতা? পুরুষ হইয়ে মেইয়ে ছেইলে ছাইরে থাইকবি কি কইরে?' বলেই খিলখিল করে হাসে লক্ষ্মীমণি। কিছুটা সময় চুপচাপ কেটে যাবার পর ফের লক্ষ্মীমণি বলে, ঘ্যাঁষাঘেঁষি কইরে শোব আয়' বলেই লক্ষ্মীমণি বৃন্দাবনের বিছানাটা টেনে নিজের বিছানার সঙ্গে জোড়া লাগায়।

ওরা আর কিছু বলে না। একজন শুয়ে শুয়ে গান ধরে, সাধের লাউ বানাইল মোরে বৈরাগী; সাধের লাউ......আর একজন মুখ দিয়ে পকম্ পকম্ আওয়াজ বের করে।

খেঁকুড়ে নকুল বলে, 'ভরা প্যাটে নেমন্তন্ন খেইতে আসে শালারা। এটা খুইটে মুয়ে দ্যায়, ওটা খুইটে মুয়ে দ্যায়, কিচ্ছু খায় না। শালাদের ঢং-ই আলাদা। কিছু না খেইয়ে চবর চবব পান চিবোয়, সিগ্রেট ফোঁকে।'

গান থামিয়ে ছেলেটা এবার বলে, 'খেইলে পর আমাদের হাল কি হইত ভেইবেছ?' কলা পাতা চিবোইতে হ'ত।'

'হ্যাঁ, তা যা বইলেছিস।' বলেই পা নাচাতে নাচাতে বলে, 'আইজ চাইরটে মাছ পেইয়েছি, মাংসও পেইয়েছি, চাইর টুকরো। নুচি চোদ্দখানা। কাইলকের ভাবনা আব কইরতে হবে না।'

'নক্ষ্মীমণিকে দাও না ওর থেনে। ও মাগীর তো ভিক্ষেতে জাত যায়।' একজন লক্ষ্মীমণির হয়ে কথা বলে।

লক্ষ্মীমণি মুখ খিঁচিয়ে বলে, 'ও খাওয়ায় আমি মুতে দি।'

নকুল বলে, 'মাগীর নাজনজ্জা কিছু নাই বে। ঢ্যামনা সাপের তেজ।'

অনেকক্ষণ পর পালান বলে, 'মিনসেটা এরই মধ্যে ঘুমিয়েছে দ্যাখ। ক্যামন নাক ডাকতিছে!'

নকুল বলে, 'বাঞ্চোতের নাক ডাকানির ঠ্যালায় ঘুমতি পারব না আমরা। ওরে ও নক্ষ্মী, ওয়াক নাক ডাকিতে বারণ কর'।

লক্ষ্মীমণি সে কথায় কোন সাড়া দেয় না। মনে মনে খুশিই হয। কেমন যেন মনে জোরও পেয়ে যায়। আড় চোখে বৃন্দাবনের দিকে তাকিয়ে দেখে মানুষটা ঘুমিয়ে অসাড় হয়ে গেছে।

ভোর না হতেই ওরা এখানে ওখানে প্রাতঃকৃত্য সেরে নেয়। পুরুষদের অত ঝক্কি ঝমেলা নেই। কাছের বাজাবে সেঁধিয়ে যায় গুটিগুটি। মেয়েদেরই যত ঝামেলা।

লক্ষ্মীমণি ওর কলাই করা গেলাস নিয়ে চায়ের দোকানে এসে দাঁড়ায়। রোজকার খদ্দের। দু'কাপ চা নিয়ে আঁচলে বাঁধা পয়সা বের করে লক্ষ্মীমণি।

ওরই ভিক্ষে করার সুযোগ ছিল বেশি কিন্তু ও তা করে নি। ধনুকের মতো বাঁকানো পা দুটো দেখিয়েই ও সহজে রোজগার করতে পারত। কিন্তু কেন যে ও সে পথে গেল না কে জানে। ও আশপাশের বাড়িতে দুবেলা বাসন মাজে, ঘর নিকোয়, তাতেই যা রোজগার হয়, একটা পেটেব স্বচ্ছন্দে চলে যায়। যে যে বাড়িতে ও কাজ করে, সে সব বাড়ির লোকজনও ওর সঙ্গে খারাপ

ব্যবহার করে না। বোধ হয় ভাবে, আহারে! মেয়েটা বড় দুঃখী। এই যে গতর খেটে খায় তার জন্যেই বুঝি ও সকলের কাছ থেকে সমীহ আদায় করে। ওকে ভাল না বেসে পারে না। ওই সব বাড়ির বউরা ওদের পুরনো শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ দেয়, ভাল মন্দ রান্না হলে ওর জন্য সামান্য রেখেও দেয়। লক্ষ্মীমণি সে সব না নিয়ে পারে না। ভালবাসার দানকে মাথা পেতে নিতে লজ্জা কি!

চায়ের গেলাস শাড়ির আঁচলে ভাল করে ধরে ফিরে আসে আস্তানায়। বৃন্দাবন তখনও ঘুমোয়। ওর গায়ে বেশ কয়েকবার ঠেলা মেরে মুখ খিঁচিয়ে বলে, 'মরার মতো এ্যাত্ত বেলা পজ্জন্ত ঘুমুচ্ছিস যে! উঠি পর। চা খা।'

বড় করে হাই তোলে বৃন্দাবন। চোখ মেলে দেখে বেলা বেশ বেড়ে গেছে। লক্ষ্মীমণিকে দেখে হেসে বলে, 'পদ্মরাণীও তোর মতন ঘুম ভাঙাইত। গরম চা মুখের সামনে তুইলে ধইরতো।' বলেই খুশী খুশী ভাব করে লক্ষ্মীমণির দিকে চেয়ে রইল।

অনেকেই তখনো ঘুমোচ্ছিল। কেউ কেউ এরই মধ্যে গতরাতে সংগ্রহ করা খাবার ভাগ করে খেতে শুরু করেছে। বড় সুন্দর গন্ধ টের পেল বৃন্দাবন। কিন্তু এত সকালে ওদের এমন হা-ভাতের মতো খেতে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারল না। চাপা গলায় লক্ষ্মীমণিকে বলল, 'ওগুলোর প্যাটে রাক্ষস সেঁইধে আছে, তাই না রে?'

লক্ষ্মীমণি বলে, 'তাতে তোর কী?'

তা ঠিক। আমার কী! বলেই হিন্ডালিয়ামের গেলাস বের করে বলে, 'চা দে।'

লক্ষ্মীমণি চা ভাগ করে খেতে যাবে ঠিক সেই সময় বৃন্দাবন বলে, 'দাঁড়া। রুটি আছে। চা দিয়ে ভিজিয়ে খা।' গতকালের কেনা পাঁউরুটির দু-তিন টুকরো তখনো ছিল। তার থেকে লক্ষ্মীমণিকে দিয়ে বলে, নে, খা।'

লক্ষ্মীমণি হাত বাড়িযে রুটি নিয়ে একমনে চায়ে ডুবিযে খেতে খেতে বলে, 'কাজে যেইতে হবে। তুই তালি থাক।'

'কী কাজ তোব?' বৃন্দাবন জিজ্ঞেস করে।'

লক্ষ্মীমণি স্পষ্ট উত্তর দেয়, 'ঠিকা কাজ। ও তুই বুঝবি না।'

'বুইজবোনা কেনে?'

হাসে লক্ষ্মীমণি। বলে, 'কালই তো এখেনে এয়িছিস। কত কাজ আছে। এট্টা জুটিযে নিতে পারলি ভাবনা কী!'

বৃন্দাবন ঠিক ধরতে পারে না লক্ষ্মীমণিব কথা। অবুঝ চোখে চেয়ে থেকে বলে, 'কিছুই বুঝতে পারি না তোর কতা।'

'বুঝবি, বুঝবি। দু-দিন ঘুমো, জিরো। তারপর বুঝবি।' বলেই লক্ষ্মীমণি উঠে যাবার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে। বৃন্দাবনকে ইশারায় কাছে ডেকে অন্য আর সকলকে দেখিয়ে বলে, 'ওয়াদের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করতি যাইস না। গ্যাঁজা খায়, তাড়ি খায়, ভিক্ষে করে। সোমত্থ মাগীগুলো গতর ব্যাচে।' আর বেশি না বলে লক্ষ্মীমণি ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ক্রমশ দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।

বৃন্দাবন ভাবে, এ কোন জীবনে এসে পড়ল। চাপা দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে বেরুল। পথচারীরা

কেউ ওর দিকে ভাল করে দেখেও না। দুদিন আগে ওর অনেক ছিল। আজ কিছু নেই। এককালে ওর সামান্য কিছু জমি ছিল, ঘর ছিল, বউ ছিল, আজ আর কিছু নেই। জমি, বাড়ি আর বউ-এর মুখ বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠল ওর চোখের সামনে। চাই কি, পদ্মরাণীর দু'একটা কথাও যেন স্পষ্ট শুনতে পেল এ সময়। বুকের মাঝে হঠাৎই ঝড়ো হাওয়ার শন্ শন্ শব্দ হতে থাকে। এমনটা কি এর আগে টের পেয়েছে বৃন্দাবন কখনো?

রাতের অন্ধকারে যাদের মুখ স্পষ্ট দেখে নি, এখন সকলকেই ও স্পষ্ট দেখতে পেল। এতটুকুন জায়গায় চোদ্দ-পনেরো জন লোক রাত কাটিয়েছে; ভাবতেই অবাক হয়ে গেল। দেখে, অদূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিছু পোড়া ইঁট। কালো দাগে ভরে আছে সে সব। বুঝলো, ওই ইঁটগুলোকে সাজিয়ে কেউ না কেউ রান্না সারে। বাঁশের চ্যাচাড়ি, আখের ছোবড়া স্তূপ হয়ে আছে একদিকে। চোখ সরিয়ে ও দেখতে পায়, ফুলের মালা খোঁপায় জড়িয়ে শুয়ে আছে একটা মেয়ে। টস্ টস্ করছে যৌবন। বৃন্দাবন ধীর পায়ে ওখান থেকে উঠে চাপা কলের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। মুখ হাতে জল দিয়ে ও সামান্য স্বস্তি অনুভব করে। ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি ইতিমধ্যেই ছুটোছুটি শুরু করেছে। পথে লোক এখন অনেক। ফিরে এসে পোঁটলায় হেলান দিযে বিড়ি ধরায় বৃন্দাবন। ভুস ভুস করে ধোঁয়া ছাড়ে।

ওর কানে যায়, ওই মেয়েটা একজনকে ডেকে বলছে, 'মুকুন্দ চা।'

'যাচ্ছি দাঁড়া।' মুকুন্দ উত্তর দেয়।

মেয়েটি অমনি ঝাঁঝিয়ে বলে, 'সিগ্‌গির চা নিয়ে আয়। গা-গতর ম্যাজ ম্যাজ করতিছে।'

মুকুন্দ রাগের গলায় উত্তর দেয়, 'অত ঢলানি তোর কদ্দিন থাকে দ্যাখবো। গা ম্যাজ ম্যাজ করতিছে! জানিস না কেন? তুই কি আমার বে করা বউ যে যা বলবি তাই কত্তি হবে?'

'আর তুই বুঝি আমার ধম্ম সোয়ামী! সারা রাইত নেংটি ইন্দুরের মতো খুট খুট কর্য়ে খুইটেছিস। ঘুমোতি দিয়েছিলি পোড়ামুখো?'

মুকুন্দ রেগে গিয়ে বলে, 'মুখ সামলে কতা ক' বকুল, তুই তো এট্টা এঁটো মেয়েছেলে। অত গরম দেকাস কাকে?'

বকুল ফণা তোলা সাপের মতো হয়ে ওঠে। চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরোয়। খোঁপাটা এক টানে খুলে মালাটা দূরে ছুঁড়ে বলে, 'মরদ হয়িছিস তো মরদের মতো চললি পারিস? সেদিনও দুটো টাকা ধার নিলি। শোধ দে মরদের বাচ্চা।'

মুকুন্দ তেড়ে আসে সে কথা শুনে। বলে, 'ধার নেয় কোন শালা। আমি না থাকলি তো অ্যাদ্দিন শ্যাল-কুকুরে টানাটানি কত্তো। চোপা কত্তি নজ্জা করে না?'

'কিসের নজ্জা রে শোরের বাচ্চা।' বকুলও তেড়ে এসে ওর মুখোমুখি দাঁড়ায়।

রাগ সামলাতে পারে না মুকুন্দ। বকুলের গালে জোরে চড় কষিয়ে অশ্রাব্য গালাগালে বাতাস ভারি করে তোলে।

চড় খেয়ে বকুল ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। অন্য আর কেউ কোন কথা বলে না। কিংবা বকুলের কাছে এগিয়ে এসেও আসে না। হতভম্বের মতো এর ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। বকুল এসে নিজের জায়গায় মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে বসে।

বৃন্দাবন মুকুন্দকে হাতের ইশারায় ডাকে।

বৃন্দাবনের কাছে এগিয়ে এসে শুধোয় মুকুন্দ, 'কি কবা চটপট কইয়ে ফ্যালো।'

বৃন্দাবন চাপা গলায় বলে, 'রাগ কইরো না। এ তুমি ভাল কাজ কর নাই। মেইয়ে ছেইলের গায়ে হাত তুলতি নাই।'

এ কথায় মুকুন্দ অবাক হয় সাময়িক। পরক্ষণেই রাগের আগুন উর্ধমুখী হয়। বলে, 'জাত ধম্ম খাওয়া মেইয়ে ছেইলে, তার সঙ্গে যা কইরেছি বেশ কইরেছি।'

বৃন্দাবন কথা বাড়ায় না। বিড়ি বের করে দু'ঠোঁটের মাঝে গুঁজে দিয়ে ফস্ করে দেশলাই জ্বালে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে তাকিয়ে দেখে মুকুন্দ ধীর পায়ে বকুলের দিকে এগিয়ে আসছে। বকুলের গা ঘেঁষে বসে থাকে কিছুক্ষণ।

মুকুন্দ বলে, 'তোর পাই পয়সা মিটিয়ে দেব বকুল, আমি বাড়ি ফিরি যাব। এ জীবন আর সহ্যি করতি পারি না। শালার মাইনসে ঘেন্না করে; রাস্তার কুকুরও দেখলি ঘেউ ঘেউ করে। আর কান্দিস না। চ, চা খাই, জেলাবি খাই। আয়।'

কী আশ্চর্য, বকুল শান্ত পায়ে মুকুন্দর সঙ্গে উঠে যায়।

বেশ কিছুদূর ওরা এগিয়ে গেলে আর সকলে খ্যা খ্যা করে হাসে। বৃন্দাবন যেন এই প্রথম খুশীর ছোঁয়া অনুভব করে। হাসি অপ্রকাশ্য থাকলেও বুকের ভেতরটা ভরাট ভরাট ঠেকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই যে যার পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে কোথায় বেরিয়ে যায়। বৃন্দাবনের সঙ্গে কেউই কোন কথা বলে না। পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে বৃন্দাবনের। খিদে টের পায় ও। রাগ হয়। ভাবে, রাস্তার মানুষের এত ঘন ঘন খিদে ঠিক নয়। তবুও এখনও পর্যন্ত ট্যাঁকের জোর আছে ভেবেই সামান্য আশ্বস্ত হয়। ও বোঝে, লক্ষ্মীমণি দুপুর নাগাদ একবার না এসে পারবে না।

আজও গতকালের মতো চা আর পাউরুটি কিনে চুপচাপ বসে খেল। বিড়িও ধবাল একটা। গামছা বিছিয়ে পোঁটলাটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ল।

দুপুরের দিকে লক্ষ্মীমণি ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ওর কাছে এসে বলল, 'এ্যাত্ত বেলায় ঘুমোচ্ছিস যে? ওঠ।'

বৃন্দাবন বড় করে হাই তুলে বলল, 'ও তুই।'

'হ্যাঁ। তা কী?'

'বড় খিদে নেগিছে রে। আমার কাছে ট্যাকা আছে। চ' কিছু খেইয়ে নি।'

লক্ষ্মীমণি অবাক চোখে তাকিয়ে বলে, 'তুই মরবি রে বেন্দাবন। ট্যাকা আছে জানতি পারলি শোরের বাচ্চারা তোকে খুন কইরবে। হুঁস হারালি ফক্কা হয়ি যাবি। নে নে, বড়মানুষী করতি হবে না। তোর জন্যে চাড্ডি এনেছি।' বলেই হাসতে থাকে লক্ষ্মীমণি।

বৃন্দাবনও হাসে। অনেক কথাই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় ওর, কিন্তু কিছুই বলতে সাহস হয় না। একমনে খেতে খেতে বলে, 'তুই খেয়েছিস?'

লক্ষ্মীমণি অমনি উত্তর দেয়, 'নিজে না খেইয়ে তোকে খাওয়াতি যাব ক্যান?'

বড় স্পষ্ট কথা বলে লক্ষ্মীমণি। তবু ভাত চিবোতে চিবোতে বলে, 'তোর তো মায়ার শরীল।'

লক্ষ্মীমণি হেসে বলে, 'খুব সোন্দর কথা বলতি পারিস তো। এই কতার জোরে ক'জনারে ঘায়েল করেছিস?'

এ কথায় শব্দ করে হেসে ফেলে বৃন্দাবন। বলে, 'মাত্তর এক জনারে।'

'সেডা কে?'

'দেশে মচ্ছব লেগি গ্যাছে রে, মচ্ছব লেগি গ্যাছে।' গাঁজায় দম দিতে দিতে নকুল খেঁকুড়ে গলায় বলল।

আর অমনি কথাটা লুফে নিল পালান নিজের পেটে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'তা যা বলিস। এ শালার প্যাটের কি মজা। খালি খেয়েই যাচ্ছে, আর খেয়েই যাচ্ছে। কত খাবি খা শালা।'

মুকুন্দ জবাব দেয়, 'ফাইড আইস, ফিস ফেরাই, চপ কত কি করেছিল! অ্যাত্ত সব খায় কি করি বলদিনি?'

বকুল খিল খিল ক'রে হাসে। লক্ষ্মীমণির কানেও কথাটা যায়। কেমন গা গুলোয় ওদের কথা শুনলে। পাশ ফিরে শুয়ে ধমকের সুরে বলে, 'বজরং বজরং ছাড়ি ঘুমোতি দে। পাত চাটার দল কুত্তার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করি খাতি নজ্জা করে না?'

বকুল সে কথায়ও হাসে। হেসে মুকুন্দর গায়ে ঢলে পড়ে।

বৃন্দাবন ভাবে চড় চাপাটি খেয়ে বকুলের বিষ নাবিয়ে দিয়েছে ছোঁড়া। মনে শাবাস না দিয়ে পরে না মুকুন্দকে।

মাঝ রাতে বৃষ্টি এল ঝমঝমিয়ে। এ বৃষ্টির যে শেষ নেই। আদিম হয়ে উঠল প্রকৃতি। তাই বুঝি ঘুম ভেঙে যায় লক্ষ্মীমণির। বৃন্দাবনকে কাছে সরে আসতে ইশারা করে। অনেককাল খরা চলেছে বৃন্দাবনের জীবনে। পদ্মরাণী চলে যাবার পব শরীরে বৃষ্টি নামে নি। লক্ষ্মীমণির ডাকে ঝমঝম বৃষ্টির শব্দ শুনতে পেল। অবলীলায় লক্ষ্মীমণিকে জড়িয়ে শুল বৃন্দাবন। তার পর শরীরের খরা বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়াব পর অকাতবে ঘুমিয়ে পড়ল বৃন্দাবন আর লক্ষ্মীমণি।

একটা একটা করে দিন চলে যেতে যেতে প্রায় মাস ছয়েক পার কবে দিল বৃন্দাবন। সব হারানোর দুঃখ একটু একটু করে কমে যাচ্ছে, ভুলে যাচ্ছে। পোড়াকাঠে লক্ষ্মীমণির শবীরে লাবণ্যেব ঢেউ লেগেছে।

লক্ষ্মীমণি বলল, 'মুকুন্দ বে কইরেবে শুনছি ?'

'কার কাছে শুনিছ?'

'বেন্দাবন বলতিছিল।'

বকুল খিল খিল করে হেসে বলে, 'আমি যে শুনি তোর কতা?'

লক্ষ্মীমণি হেসে গড়িয়ে পড়ে সে কথায়। মুখে কিছুই বলে না। ওরই পরামর্শে বৃন্দাবন ফুটপাথের ওপর ছোট একটা দোকান খুলেছে। ঝালমুড়ির দোকান। বাদাম, কাবলি ছোলাও রেখেছে। দোকানটা চলছে বেশ। যে পয়সা খরচ করে দোকান খুলেছিল তার দ্বিগুণ পয়সা এখন বৃন্দাবনের ট্যাঁকে। এ ছাড়াও দোকানের মালপত্তর তো রয়েছেই। ওর সব মাল লক্ষ্মীমণিই রাখার

ব্যবস্থা করেছে এক বাবুর মোটর গ্যারেজে। ভাগ্যিস গাড়িটা বেচে দিয়েছিল নইলে এই মাল পত্তর রাখা সহজ হত না।

রাত ন'টার পর দোকান বন্ধ করে বৃন্দাবন ফিরে আসে। লক্ষ্মীমণি রাঁধে। দু'জনে একসঙ্গে বসে খায়।

খেতে খেতে বৃন্দাবন বলে, 'এখানে আর কদ্দিন থাইকতে হবে রে।'

'আমি কি জানি। ঘরের ব্যবস্থা করলি পার?'

'চার নম্বর বস্তির একখানা ঘর খালি আছে। যাইট টাকা ভাড়া। বলিস তো নিয়ে নি।' সোৎসুক চোখে লক্ষ্মীমণির দিকে চেয়ে থাকে বৃন্দাবন।

নিথর নিস্তব্ধ দিঘিতে ঢিল ফেললে যেমন আলোড়ন সৃষ্টি হয়, এমনি একটা ঢিল ফেলল বুঝি বৃন্দাবন লক্ষ্মীমণির মনে।

লক্ষ্মীমণি অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে।

'কী এমন দেখিস রে নক্ষ্মী।' বৃন্দাবন শুধায়!

লক্ষ্মীমণির মনের ঠিক ঠিক খোঁজ পায় না বৃন্দাবন। ওকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, 'নকুল পালান আর মুকুন্দরে বিশ্বাস নেই। ওরা ট্যাকার গন্ধ পেইয়েছে। ট্যাকাগুলো দে বাবুর বাড়ি রেখ্যে আসি।'

টাকার বড় মায়া। বৃন্দাবন হাতছাড়া করতে চায় না। বলে, 'ট্যাকা আমি হাতছাড়া কইরবো না নক্ষ্মী। তুই যা।'

লক্ষ্মীমণি অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। বলে, 'ভগবানের দিব্যি আমাকে তুই সন্দ করিস না। আয় তুই আমার সঙ্গে। বাবুর বউ-এর মায়ার শরীল। ওর কাছে রেখি আসি।'

'কষ্টের টাকা মারা গেলি মরে যাব নক্ষ্মী।'

লক্ষ্মীমণি অমনি বলে, 'পদ্মরাণী হলি তো ওর কাছেই ট্যাকা রাখতিস?'

বৃন্দাবন মাথা নেড়ে বলে, 'বউকে বিশ্বেস না কর্যে কি পারা যায়?'

লক্ষ্মীমণি অমনি ওর একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'তা হলি, আমিও তোর বে করা বউ।' শব্দ করে হেসে জোরে বৃন্দাবনের হাত চেপে ধরে বলে, বিশ্বেস কর ওরা লোক ভাল না, গলা টিপে মেইরে ফেইলতে পারে।'

বৃন্দাবন হেসে নিজের শরীর দেখিয়ে বলে, 'এই গতব খানরে তুই অবিশ্বেস করিস। ওরা কি করতি পারে আমার সঙ্গে। এইলে এক থাপ্পরে সব কডারে যমের ঘরে পাঠাইয়ে ছাড়তি পারি আমি।'

আলো অন্ধকারের মাঝে বৃন্দাবনের লোমশ বুকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে লক্ষ্মীমণি, বৃন্দাবনের কথাটাকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারে না। ফ্যাঁসফেসে গলায় বলে, 'তা হলি চল ফিরি যাই।'

ওরা কাছে এগোতেই দেখে, ওদের সব ক'জন নকুলকে ঘিরে রয়েছে। ওরাও ব্যস্ত হয়ে ভিড়ের দিকে এগিয়ে যায়।

লক্ষ্মীমণি জিজ্ঞেস করে, 'কি হইয়েছে রে বকুল?'

'নকুল খুড়োর হাঁপ উঠিছে।' থমথমে গলা বকুলের।

'কি বইলতেছিস যা-তা। একটু আগেই তো গ্যাঁজা ফুঁকছিল।'

সে কথায় কেঁদে ফেলে বকুল। বলে, 'গ্যাঁজলা উঠতিছে। মুকুন্দ বলিছে, এ মরণ টান।'

বৃন্দাবন এগিয়ে গিয়ে বলে, 'মাতার কাছে ভির কইরে রইয়েছ ক্যান। এট্টু হাওয়া-বাতাস লাগাতি দ্যাও।'

সে কথায় জমাট ভিড় মাথার কাছ থেকে সরে যায়। বৃন্দাবন নকুলের মাথাটা কোলের ওপর তুলে নেয়। গ্যাঁজলা সমানে উঠে যাচ্ছে। গলা দিয়ে ঘর্ঘর আওয়াজ বেরুচ্ছে নকুলের। নারকোলের খোলের মতো মাথাটার ভিতর কিছু আছে বলে মনে হল না। শুকিয়ে খট খট করছে।

সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীমণির ওপর রাগ হল বৃন্দাবনের। পাঁজরাগুলো যার এমন ডিগডিগে, মাথাটা যার এমন ঝুনো, তাকেই কিনা লক্ষ্মীমণি সন্দেহ করেছিল। তবুও নিজেকে সহজ করে নিয়ে বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, 'এট্টু জল আন দিনি?'

পালান সঙ্গে সঙ্গে জলের ব্যবস্থা করে উৎসুক চোখে চেয়ে রইল বৃন্দাবনের দিকে। বৃন্দাবনের মুখ ভীষণ কঠিন দেখাচ্ছিল, ও সন্তর্পনে নকুলের মুখের গ্যাঁজলা কাটিয়ে ধীরে ধীরে মুখে জল ঢেলে দিচ্ছিল। বৃন্দাবনের চোখের সামনে পদ্মরাণীর মুখ স্পষ্ট হয়ে উঠল। শেষ সময়ে, পদ্মরাণীর মুখ-চোখের চেহারাও এমনি হয়েছিল। নকুলের যেমন চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, পদ্মরাণীরও ঠিক তেমনি হয়েছিল। ওর বুকের ভেতরে পাথরের বোঝা চেপে বসল যেন। নিজেরও দম নিতে কষ্ট হচ্ছিল খুব। আলো-অন্ধকারের মধ্যেই বৃন্দাবন টের পেল, নকুলের নাকের ডগাটা ভীষণ ঠাণ্ডা। লক্ষণ ভাল নয় মনে করে মুকুন্দকে বলল, 'পায়ের পাতা হাত দিয়ে ঘষতি থাক তো।'

মুকুন্দ নকুলের পায়ে হাত দিয়েই চমকে গেল। ভীষণ ঠাণ্ডা পায়ের পাতা দুটো। গোঙানির মতো গলা দিয়ে বেরিয়ে এল মুকুন্দর, 'এ যে বরফ হয়্যে গ্যাছে গো।'

ও কথায় কোন গুরুত্ব দিল না বৃন্দাবন। আকাশের দিকে মুখ করে দেখে, পরিষ্কার আকাশ। নক্ষত্রগুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। ফুটপাতের ওপর পোঁতা গাছগুলো হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। এক দঙ্গল কুকুরের চিৎকার স্পষ্ট শুনতে পেল সকলে।

ঠিক সে সময় লক্ষ্মীমণি ফুটপাতের ধার ঘেষে ওয়াক তুলছে বমির। মেয়েরা সব ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর চারপাশে। একটা টোকো বমির ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে আর একটা বমি উগরে আসছে। তা দেখে পালানের মাসী ফোকলা দাঁত বের করে শুধু হেসেই যাচ্ছে। ওর হাসির অর্থ কি তা বকুলরা টের পেল না তবে ভীষণ বিরক্ত হল।

বকুল কঠিন গলা করে বলে, 'হাসতি নজ্জা করে না।'

পালানের মাসী এবার আরও জোরে হাসতে থাকে। বলে, 'এ সময় এ'রকম হয়।' কথাটা বুঝতে বাকি থাকে না কারো। ওবাও হি হি করে হাসে। এ ওর গায়ে ধাক্কা দেয়, গায়ে গড়িয়ে পড়ে।

বৃন্দাবন রেগে মুখ খারাপ করে বলে, 'শালার মেইয়ে ছেইলে কি আর সাধে বলে। নকুল খুড়ো মরে, আর ওরা হাসে।'

লক্ষ্মীমণির কানে যায় সে কথা। ও অনেকটা নিজেকে সামলে নিয়েছে। বুক-গলা জ্বলে যাচ্ছে, তবুও সব কিছুকে উপেক্ষা করে বলে, 'আমারে দেখতি হবে না; খুড়োরে দ্যাখ।'

পালানের মাসী আর সব মেয়েদের সরিয়ে দিয়ে বলে, 'প্যাটে যারে সেঁধেইছিস ওর বাপ কেডা?'

বিস্ফোরিত চোখে তাকায় লক্ষ্মীমণি। এ কি শুনছে ও। ধোঁয়াটে ঠেকে সব কিছু। ফের গা গুলিয়ে আসছে। সামান্য জল চাইল মাসীর কাছে।

পালানের মাসী বলে, 'এই থাম ধর্যে বইসে থাক।' বলেই জল আনতে যায়।

লক্ষ্মীমণি টের পায় ওর মাথায় অজস্র ভ্রমরের গুন্ গুন্ আওয়াজ। এতটা বয়স পর্যন্ত এমনটা হয় নি বলেই বুঝি ও কেমন ঘাবড়ে যায়। মাসীর কথা ফের শুনতে পায়, 'ওর বাপ কেডা?' ভাবে তাহলে কি ও....

পালানের মাসী কাছে এসে বলে, 'এক ঢোঁক জল খা। বেশি খাইস না। বেশি খালি বমি হতি পারে।'

লক্ষ্মীমণি বাধ্য মেয়ের মতো মাসীর কথা শোনে।

বকুল ফিরে এসে জিজ্ঞেস করে, 'এখন কেমন বোধ কইরতেছিস?'

মাথা নেড়ে বলে লক্ষীমণি, 'ভাল।'

'বলতিছিস না ক্যান ওর বাপ কেডা?'

মাসী ফের জিজ্ঞেস করে, 'বলতিছিস না ক্যান ওর বাপ কেডা?'

বকুল বলে, 'বাপের কতা ওঠে ক্যানে?'

'সংসারে থাকতি গেলি বাপের কথা লাগে।' মাসী শান্ত ভঙ্গিতে বলল কথা কটি।

খিল খিল করে হাসে বকুল। লক্ষ্মীমণির গায়ে ঠ্যালা মেরে বলে, 'ডুবি ডুবি এত্ত জল খেইয়েছিস যে আমরা কেউ জানতি পারি নাই। ভালই কইরেছিস।'

লক্ষ্মীমণি কোন জবাব দেয় না। শুধু শরীরের মধ্যে আব একটা শরীর বেড়ে উঠছে ভেবে রোমাঞ্চিত হতে থাকে।

মাসীকে বলে, 'তাহলি শোন। ওর বাপ বেন্দাবন।'

'বাঁচালি।' বলেই আশ্বস্ত হয়ে উঠে পড়ে পালানের মাসী।

নকুল খুড়ো এখন একটু সুস্থ বোধ কবছে। ঘর্ঘর আওয়াজটা থেমে গেছে। গ্যাঁজলাও মুখ দিয়ে আর বেরুচ্ছে না।

বৃন্দাবন বলে, 'যাও, এট্টু ঘুমোয়ে নাও সকলে।' এবার লক্ষ্মীমণির কাছে এগিয়ে আসে।

অনেক রাতে লক্ষ্মীমণি বলে, 'শুনতি পাচ্ছ?'

'কি কবা কও।' ঘুম চোখে বলে বৃন্দাবন।

'তোমার বাচ্চা আমার প্যাটে।' লক্ষ্মীমণি উত্তর দেয়।

আচমকা এমন কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না বৃন্দাবন। ধড়মড় করে উঠে বলে, 'কি বলতিছিস নক্ষ্মীমণি?'

'তুমি বাপ, আমি মা। আজ বমি হয়েলো।'

বৃন্দাবন ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলে, 'সত্যি?'

'সত্যি'।

বৃন্দাবন বলে নকুল খুড়ো সকালেই টেস্যে যাবে। মরাব হাওয়া গায়ে লাগলি আমার ছেইলের খেতি হবে। নক্ষ্মী সব ঘুমোয়ে অসাড়। চ পালাই। আমার ব্যাটার গায়ে খারাপ হাওয়া নাগতি দেব না।'

লক্ষ্মীমণি বলে, 'যা কবা, আমি তাতেই রাজি।'

সারা পৃথিবী যখন ঘুমের কোলে নিশ্চিন্ত তখন খারাপ হাওয়া পার হওয়ার জন্য পরিচিত আস্তানা ছেড়ে অপরিচিত আস্তানার দিকে গুটি গুটি পা বাড়াল বৃন্দাবন আর লক্ষ্মীমণি।

রতন ও স্বপ্নের মানুষ

ক্ষুদে চোখে একরাশ বিস্ময় নিয়ে রতন তাকিয়ে দেখতে লাগল বংশীলালের খেলা। ভিড় ঠেলে যে কাছে এগুবে এমন ক্ষমতা রতনেব নেই। ছেলের দল ওকে দেখলেই পেছনে লাগে; 'নুলো রতন হ্যাংলা' বলে বিরক্ত করে মারে। কিন্তু আজ অনেকদিন পর মনে হ'ল রতনের, পাড়ার ছেলেরা নতুন রসে মজেছে । মোহনপুবা অনেকদিন পরে যেন নতুন কিছু পেয়ে চনমনে হয়ে উঠেছে। কিন্তু ছেলেগুলো কেউই ওর দিকে চেয়েও দেখছে না, এটা ভাবতেই রতনের বুকটা ভীষণ হালকা হয়ে যায়। আবার নজবে পড়লে গা-পিত্তি জ্বলতে থাকে। 'শালা রতন কী কারো খায় না পবে? যে নুলো রতন হ্যাংলা বলে ওর পেছনে লাগবে', মনে মনে ভাবে রতন, আসলে ছেলেগুলো এক-একটা শো'রএর বাচ্চা। নইলে কার পাকা ধানে মই দিয়েছে বতন যে, ওকে অমন করে জ্বালাবে। এসব ভাবনা বংশীলালের খেলা দেখার ফাঁকে কেন যে এল ভেবে পায়না রতন। এসব ভাবনা না ভেবে পিচুটি-ভরা ক্ষুদে চোখজোড়ায় বিস্ময় জাগিয়ে তুলে বতন ঘার উঁচু করে দেখতে থাকে বংশীলালের খেলা। বংশীলালের থুতনির কাছে নেমে এসেছে জুলপি, চামড়া-সার রোগা ডিগডিগে চেহারা, লাল চোখ, দেখলে ভয় হয়। এই মানুষটাই এতগুলো ছেলেকে, শুধু ছেলে কেন, ছেলেদের বাপ-মায়েদেরও অভিভূত করে দিয়েছে খেলা দেখিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের ওপর একধরনের ঘৃণা পেঁচিয়ে ধরতে লাগল রতনকে। মনে মনে নিজেকেই গাল পাড়ল সে। আর সে গালাগালটা নিজের কানেই কীরকম বেখাপ্পা ঠেকল ভাল লাগল না রতনের নিজেরই।

অনেক কষ্টে একটা উঁচুমতন ঢিবির ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বংশীলালের খেলা দেখায় মন দিল রতন। হারু মাস্টার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলল, 'রতন তোর তো বেশ বুদ্ধি বে! সবাই কেমন ভিড়ে গুঁতো গুঁতি করছে, আর তুই...বেশ, বেশ, রতনা, বুদ্ধিই হচ্ছে সব; বুদ্ধি নেই তো কিচ্ছু নেই।' আপন মনেই যেন কথাগুলো বলে হারু মাস্টার পাশ কেটে চলে যায়। খেলা দেখা ভুলে গিয়ে হলদেটে দাঁত বের করে হাসে রতন। মনে পড়ে তার, গোপালও ঠিক এই কথাই বলেছিল ওকে একদিন। কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যেতে লাগল রতনের। মাটির ঢিবিটা থেকে অতি সন্তর্পনে নেমে রতন ধীর পায়ে এগুতে লাগল বাড়ির দিকে। মাথার ওপরের আকাশটা ঝক্‌ঝক্ করছে। ঘাড় কাত করে আকাশটাকে দেখবার চেষ্টা করল। বিরাটাকার একটা আয়না যেন কেউ বসিয়ে রেখেছে আকাশটার গায়। ফলে চোখদুটো কেমন যেন ঝলসে গেল। ভাল করে আকাশটা দেখতে পেল না। পেছন থেকে বংশীলালের দলের ঢোল বাজনার শব্দ কানে এল। ডুম-ডুম-ডুম...

আর ভেসে আসছে বংশীলালের রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠ... কলকাত্তাকা বংশীলাল দেখায় দুনিয়ার হালচাল, আও বাবু দেখো, ভানুমতীকা খেল। বংশীলালের খেলা দেখায় মন দিলেও কেন যেন মনটা উড়ু উড়ুকরতে লাগল। মাথার ভেতরে হারু মাস্টারের কথাগুলো বড় বেশি তোলপাড় শুরু করে দিল। আর মনে পড়ল গোপালকে। ছেলেবেলায় বসন্তে একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল গোপালের। সমস্ত মুখ জুড়ে চাকা চাকা দাগ। সেই গোপাল একদিন ওকে বলেছিল, 'বুঝলি রতনা, স্রেফ বুদ্ধি; বুদ্ধিই হচ্ছে সব। এই যে ভগবান আমার চোখ নিল, মুখটা এমন খাবলে খুবলে ছেড়ে দিল, আমি কী শালা তোর মতন পরের পাত চাটি।'

নুলো রতন রাগ করতে পারেনি সে কথায়। কেননা, গোপালের কথাটা শুনতে যতই খারাপ হ'ক, আসলে কথাটা খুব খাঁটি। এমন একটা দিন নেই, যেদিন ওর বাড়ির লোক ওকে গালাগাল না দিয়ে ভাত মুখে দেয়। গত রাতের কথাই মনে পড়ে গেল রতনের। কে বলবে বীরু আর সমু ওর আপন মায়ের পেটের ভাই। রতনের সঙ্গে কোন মিলই নেই ওদের। লেখাপড়া শিখেছে, দামী দামী জামা গায় দেয়, ফর্সা ধবধবে জামা প্যান্ট ময়লা হতে না হতেই বগলদাবা করে নিয়ে চলে যায় লন্ড্রীতে, সিগারেট ফোঁকে। পথ চলতি রতনের সামনে পড়ে গেলেও যেন দেখতে পায় না কিংবা এমন চোখ কুঁচকে দেখে যার অর্থ, রতন বুঝতে পারে। বুকের ভেতরটা অসম্ভব গুমোট একটা অস্বস্তিতে ভরে যেতে থাকে। বীরু আর সমুর সঙ্গে কখনো খেতে বসে না রতন। অথচ, ভীষণ ইচ্ছে করে ওদের সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে বসে বসে খেতে গল্প করতে। অনেক বলে কয়ে বামুনদিদিকে রাজীও করেছিল রতন একদিন। কিন্তু রতনকে আগে থাকতেই পিঁড়িতে বসে থাকতে দেখেই বীরু আর সমু কীরকম যেন মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বামুনদিদিকে বলেছিল, 'রাজপুত্তুরের খাওয়া হোক, তারপর আমাদের ডেকো'। অন্যদিন রতন যা হোক কিছু খায়; কিন্তু সেদিন ওর গলা দিয়ে কোন কিছুই যেন নামছিল না। অনেক কষ্টে ভয়ে ভয়ে চোবের মত নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়েছিল রতন। সকলের ওই ধরণের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য অবজ্ঞা রতন মুখ বুজে সহ্য করতো। দু-চোখ ফেটে জল গড়িয়ে আসতো। অনেক কষ্টে সকলের থেকে দূরে সবে গিয়ে, নদীর পাড়ের ওই বুড়ো বট-গাছটার নিচে নিজেকে আড়াল করে চেখের জল ফেলেছে। যখনই বুকের ভেতরটায় চাপ ব্যথা অনুভব করে তখনই দেখেছে রতন 'মা-মাগো' এই ক'টি কথা বেরিয়ে এসেছে মুখ দিয়ে। প্রচণ্ড দুঃখের মুহূর্তেই ও দেখেছে মা যেন ওর পাশে ছায়া-মূর্তি ধরে হাজির হয়ে যায়। ও বেশ পরিষ্কার অনুভব করে তখন, মা যেন ওর মাথায় শরীরে হাত বুলিয়ে দেয়। আর বিড়-বিড় করে কী যে বলে মা, তা ঠিক ধরতে পারে না রতন। ব্যথায় টসটস করে তাব গলা বুক। চোখদুটো জ্বালা করতে থাকে। সবকিছু তখন তার কাছে স্পষ্ট ভেসে ওঠে।

রতন খুব করুণ গলায় জিজ্ঞেস করেছিল গোপালকে, 'তা আমি কী করবো বল গুপীদা? ভগবান তোমায় গলা দিয়েছে, সেই গলায় তুমি গান গাও, লোকে শোনে, ভাল বলে, পয়সা দেয়। আমার তো তেমন কোন গুণ নাই।'

সেকথা শুনে এক চোখেই যেন আগুন জ্বলে উঠেছিল গোপালের। রাগে সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছিল তার। বলেছিল, 'যারা বলে জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি,' তারা আমার মতে মানুষেরও অধম। বলেই হাঁফাতে থাকে গোপাল।

রতন দ্বিতীয় কোন কথা না বলে চুপ করে বসেছিল।

হঠাৎ কী হ'ল, গোপাল ওর হাতটা শক্ত করে ধরে বলেছিল, 'থেটার দেখেছিস কখনও থেটার'?

ঘার কাত করে উত্তর দিয়েছিল রতন, 'হ্যাঁ'।

শুনে মুগ্ধ হাসিতে ভেসে যাচ্ছিল যেন গোপাল। বলেছিল, 'থেটারের রাজারাণী'. .কথাটা না শেষ করেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে গিয়েছিল মুহূর্তের জন্য। তারপর এক সময় আপন মনেই যেন বলতে থাকে, 'জানিস রতনা এই কানা চোখ দিয়ে যখন জল গড়িয়ে পড়ে তা দেখে লোকে ভাবে, রাধা-কেষ্টর গান গাই, তাই ভাবের ঘোরে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে আমার। কিন্তু কেউ-ই জানে না, আর জানবেই বা কী করে, মনের ব্যথা চোখে উঠে আসে, জল কাটে। তোকে বললাম এসব, তোকে বড্ড ভালবাসিরে রতনা।'

শুনে রতন বলেছিল, 'তুমি আমাকে সঙ্গে নেবে গুপীদা?'

ওর দিকে কঠোর রুক্ষ দৃষ্টি হেনে বলেছিল গোপাল, 'যাও দুটো খেতে দিচ্ছে বীরু আর সমু, তাও বন্ধ হয়ে যাবে। এমন সব্বনেশে কথা কখনো বলিসনি'।

বোকার মত অনেকক্ষণ চেয়েছিল গোপালের দিকে রতন। তারপর কী ভেবে বলেছিল, 'তাহলে সারাজীবন আমি ওদের পাত চেটেই যাবো বলছো?'

সেকথার কোন উত্তর দেয়নি গোপাল।

এর দিনকয়েক পর ফের একদিন রতন গোপালকে বলেছিল, 'কিছুই তো বললে না। আমি কী করবো বলো?'

ধীর শান্ত গলায় গোপাল বলেছিল, 'যেমনটা বলবো, তেমন তেমন পারবি করতে?'

'কী'?

উত্তরে গোপাল হেসে বলেছিল, 'ওই যা বলেছিলাম, থেটার থেটার করতে হবে। মেয়েছেলেদের দেখেই কাঁদো কাঁদো গলায় বলতে হবে, 'মা, মা জননী, তিনদিন খাইনি মা, বড় জ্বালা মা, ঘরে ছোট ছোট ভাই বোনে....পারবি বলতে?'

সব শুনে চুপসে গিয়েছিল রতন। করুণ গলায় উত্তর দিয়েছিল, 'তার চেয়ে তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল'—কেন যে ওরকম কথা বলেছিল রতন, তা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। গোপালের সামনে এলেই কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে যায়। এক-চোখো গোপালেব মুখে যে কী আছে, তা সঠিক না জানলেও, গোপালকে তার বড় আপন বলে মনে হয়।

অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে বংশীলালের গলা। অদ্ভুত এক রহস্যময় জগতের দুয়ার খুলে যায় রতনের কাছে। কী রকম সকলকে বেকুব বানিয়ে বংশীলাল রুমালে বাঁধা আংটি সকলের চোখের সামনে থেকে উধাও কবে দেয়। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের হাত ধরে নাড়া দেয় বংশীলাল আর অমনি জিলিপি ঝড়ে পড়তে থাকে। যারা রতনকে 'নুলো রতন হ্যাংলা' বলে জ্বালায় তার সব চুপসে যায়। মুখ চোখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, তা দেখে আর সকলে হো-হো ক'রে হাসে। আর অমনি দে-দৌড়, দে-দৌড়। পালিয়ে যায় সক্কলে। রতনের মনটা সে সব দেখে খুশীর প্রজাপতিহয়ে ওঠে, ভাবে, বংশীলালের মত যদি কোন কৌশল সেও আয়ত্ত্ব করতে পারতো তবে সেও ওই খচ্চরদের টিট করতে পারতো। একটু এগুতেই লক্ষ করল রতন, দূরে দুটো নেড়ীকুত্তা কিসের ওপর যেন

হুমড়ি খেয়ে রয়েছে। আর ঠিক তারই ওপর বৃত্তাকারে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে ডানা ঝাপটাচ্ছে কাক-শকুনের দল। রতন বুঝতে পারে, পচা-গলা কিছু একটা রয়েছে সেখানে, নুলো হাতটাকে অনেক কষ্টে উপরে তুলে নাক চাপা দিল। রোদ্দুরের ঝাঁঝ আস্তে আস্তে বেড়েই চলেছে। অনেকক্ষণ আগে থেকেই চোখদুটো জ্বালা করছিল—এখন পচা গন্ধের সঙ্গে কাক-শকুনের ওড়ার দৃশ্য চোখে পড়তে, আরও যেন জ্বালা করে উঠল। মনে হ'ল রতনের, ওর দু-চোখের শাদা জমিতে কেউ বুঝিবা শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে। বংশীলালের রোগা হাড় জিরজিরে চেহারাটা স্পষ্ট ভেসে উঠল আর একবার। বংশীলালের রক্তজবা চোখের দিকে চেয়ে কেন যেন মনে মনে হয়েছিল রতনের, লোকটা যতই ভেল্কী দেখাক না কেন, আসলে বংশীলাল একরকম রতনের মতই নুলো, কিংবা ভাগারের গলিত কোন মৃতদেহ, যার ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে ছেলে বুড়ো মেয়েরা, কুত্তা আর কাক-শকুনের দলের মত। মনে মনে একটা খারাপ কথা উচ্চারণ করল। রতনের মাংস খেয়ে খেয়ে ওদের অরুচি ধরেছে, আজ তাই বংশীলালের শরীরটাকে ভুক্ষারের দল চেটে-পুটে খাচ্ছে।

রোজকার মত ও একা একা নিরিবিলিতে নদীর পাড়ে বসে সময় কাটায়। দেখে, পাড়ে বক-শলিকের দল খুঁটে খুঁটে খায় কত কী। উপরের আকাশে বেগুনি শাদা মেঘ মন্থর গতিতে একপাশ থেকে আর একপাশে সরে যায়। সময় যে কীভাবে কেটে যায় রতন জানে না, বুকের মাঝে একরাশ ব্যথার চাপ সে সময় টের পায় না রতন। এভাবে সারারাত যদি এমনি নদীর পাড়ে বসে থাকে, বাড়ি না-ও ফেরে, তবে কেউ-ই তার খোঁজে আসবে না। 'মা-গো'—। একটা দীর্ঘশ্বাস ঠেলে বেরোয় মুখ দিয়ে। চোখদুটো জল-ঝাপসা হয়ে আসে। ভাবনার অদৃশ্য ভেলায় চড়ে ভাসতে থাকে রতন! মনের মাঝে গোপালের কথাগুলো আবার যেন শুনতে পায় ও। 'থেটার করতে হবে, থেটার'। হাসি পায় রতনের। আবার কষ্টও হয়। ওখান থেকে উঠে পড়তে গিয়েই নজরে পড়ে কে যেন হাতকুড়ি দূরে ওরই মত নিঃশব্দে বসে রয়েছে। দীর্ঘদিনের মধ্যে আর কাউকে এই নদীর পাড়ে বসে থাকতে দেখেনি। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও গাঢ় হয়নি। হালকা এক ধরনের আলো তখনও ছড়িয়ে রয়েছে চতুর্দিকে। একটু এগিয়ে গেল রতন। বুঝি বা অকারণেই মুখ ঘোরাল লোকটা। অমনি রতনের বুকের মাঝে মাদলের দ্রিমি দ্রিমি উঠল। সকলের চোখের রহস্যময় মানুষ বংশীলাল বসে রয়েছে সেখানে। অতি উৎসাহে দ্রুত পা বাড়াল রতন।

বংশীলাল ওকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল। ও বংশীলালের সামনে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ অপলকে চেয়ে রইল।

বংশীলাল ধমক দেবার সুরে বলে উঠল, 'যা ভাগ'।

রতন একটু সরে গিয়ে ফের দাঁড়িয়ে রইল। কী মনে করে অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করল, 'তুমি আমাকে ম্যাজিক শেখাবে'।

সেকথায় বংশীলাল হেসে ফেলল। বলে, 'ম্যাজিক! হাঃ হাঃ হাঃ'!

সেই শব্দে চতুর্দিকের নিস্তব্ধতা চুরমার হয়ে গেল। পরে হাতের ইশারায় কাছে ডাকল রতনকে। কোন সংকোচ বা দ্বিধা কিছুই ছিল না রতনের। সে একরকম বংশীলালের গা ঘেঁষে বসে ওর গায়ের স্পর্শ গন্ধ নেবার চেষ্টা করল।

ডান হাতটা রতনের ঘাড়ে তুলে দিয়ে ধীর গলায় বংশীলাল বলে, 'তু লিখাপড়া করিস না'?

রতন ম্লান হাসল সে কথায়। বংশীলালের দিকে চেয়ে প্রশ্ন কবল, 'ভানুমতী তোমাকে খেলা শিখিয়েছে?'

খুব যেন একটা হাসির কথা বলল রতন। হাসতে হাসতে বলল, 'হাঁ হাঁ ভানুমতী'! ভানুমতীর নামটা অদ্ভুত ভাবে উচ্চারণ করল বংশীলাল।

রতন জিজ্ঞেস করল, 'ভানুমতীকে তুমি চেনো? আমাকে চিনিয়ে দেবে?'

বংশীলাল গম্ভীর হয়ে গেল সে কথায়। বললো, 'কো-ই চিনে না ভানুমতীকে। কুনো দিন পারবে ভি না'।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল বংশীলাল। রতনের পিঠে সস্নেহে হাত রেখে ওর নাম জিজ্ঞেস করে বলল, 'যা বাড়ি যা'। বলেই ঋজু পায়ে এগিয়ে গেল বংশীলাল।

রতন বেশ স্পষ্ট দেখতে পেল, রহস্যময় এই মানুষটা ফিকে অন্ধকারের মধ্যে ক্রমশই মিশে যেতে যেতে একেবারেই হারিয়ে গেল। এক সময় নিজেও উঠে পড়ল রতন।

আজকে হাটবার। অনেক চেনা-অচেনা মানুষের ভিড়ে গম্‌গম্‌ করছে মোহনপুরার হাট। হাটে যাবাব জন্য অদ্ভুত অদৃশ্য একটা টান অনুভব করল রতন। ধীর পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল হাটের দিকে। দূব থেকে পথের পাশে বংশীলালের তাঁবু নজরে পড়ল।

আর অমনি বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠল রতনের। মনে পড়ে গেল বংশীলালের খেলা দেখাবার সময়কার কথাগুলো, 'কলকাত্তাকে বংশীলাল, দেখায় দুনিয়ার হালচাল'। আর মানুষজন পরিবেষ্টিত বংশীলালেব খেলা দেখাবার সময়কার বিশেষ ভংঙ্গিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। যেন এ জগতের কেউ নয়, ধরা-ছোঁয়াব বাইরে একজন বহস্যময় মানুষ ও। বাজনার তালে তালে লাল চোখের মণিদুটো থেকে যেন আগুন ঠিকবে বেবোয়! বিশেষ করে বছব আটেকেব ছেলেকে একটা চুবড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে শানিত ছুড়িব ফলা বেব করে উদভ্রান্তের মত যখন বিড়-বিড় করে বংশীলাল, তখন লোকটাকে ভীষণ নিষ্ঠুর মনে হয়। কথা বলতে বলতে অদ্ভুত হাসে বংশীলাল, আর সেই হাসি আবও রহস্যঘন হয় ঢোলেব ডুম ডুম ডুম বাজনাব মধ্যে। এসব ভাবনা ভাবতে ভাবতে পথ চলে বতন-- অকারণেই বুঝি বুকের মাঝখানটা হিম হয়ে আসে। সমস্ত শরীর তখন থির-থির কবে কাঁপে। পা'দুটোকে ভীষণ ভারী মনে হয়। পা-দুটো অসম্ভব ভারী ঠেকলে কী ভেবে রতন বসে পড়ে কিছুক্ষণেব জন্য সেখানে। আস্তে আস্তে ভয়েব মেঘ কেটে যায়। অল্প কিছুক্ষণেব মধ্যে শবীর-মন শক্ত হয়ে গেলে পর তাঁবুর দিকে এগোয় রতন। দেখে তাঁবুর চাব পাশে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে পোড়া কাঠের টুকরো, কয়েকটা ভাঙা মাটিব হাঁড়ি, শুকনো কলাপাতা, আবও কত কী। কয়েকটা রোঁযা ওঠা কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। হঠাৎ নজবে পড়ে রতনেব, তাঁবুব একটু দূবে দড়িব ওপব ঝুলছে বঙিন জামা-কাপড়, এমন কী কয়েকখানা শাড়ীও। তাঁবুর ভেতবে কী কেউ আছে? থাকলে নিশ্চয়ই ওদেব কথাবার্তা কানে আসতো। তবুও ভবসা পেল না ভেতবে ঢুকতে। পর্দা সরিয়ে উঁকি মাবতেই 'কোওন, কোওন হ্যায'--বাজ পড়ার মত গলায কে যেন বলে উঠল কথাগুলো। মুহূর্তে শবীরের রক্ত হিম হয়ে গেল রতনের। গলা শুকিয়ে গেল। ফ্যাসফেসে গলায় উত্তর দেয়, 'আমি রতন দাস'।

--'আ, ভিতর আ'!

ভিতরে গিয়ে দেখল লোকটা বংশীলাল নয়। জবরদস্ত এক বিশাল পুরুষ, আর তার গা ঘেষে এক সুন্দরী মেয়ে। দু-চোখ ভরে দেখতে গিয়ে, সংকোচ হল ভীষণ রতনের। ওকে অমন করে চেয়ে থাকতে দেখে মেয়েটা হেসে উঠল। ফলে মেয়েটার মুখের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণের জন্য তাকিয়ে রইল সেই জবরদস্ত লোকটা। এমন মধুর সুরেলা হাসি কী মানুষ হাসতে পারে? রিন-রিন করে আওয়াজ উঠেছে। মানুষটা ওর সামনেই মেয়েটাকে আদর করল। ঠোঁটের ওপর ঠোঁট বোলাল। সেই লোকটা মেয়েটার দিকে একবার রতনের দিকে আর একবার চেয়ে নিয়ে বলল, 'আঃ তু আমার সব দুখ দূর করিয়ে দিলি, তু হাসলে হামার নেশা হোয়'। পরক্ষণেই রতনের দিকে চেয়ে বলল, 'তু রোজ আসিস ইখানে, আমার পাখিকে তু হাসালি, তু বড় ভালো ছেলে রে...'। বলেই প্রচণ্ড শব্দ করে সমস্ত নিস্তব্ধতাকে চুরমার করে হাসতে লাগল সেই লোকটা।

ভয়ে বিস্ময়ে রতনের বুকটা শুকিয়ে যেতে লাগল। অস্ফুট কণ্ঠে সে শুধোয়, 'বংশীলাল যে খেলা দেখায়, সেই ভানুমতী কী তুমি'?

মেয়েটা সে কথায় হাসতে পারল না। রতন দেখলো, সেই আধো-আলো আধো-অন্ধকারের মধ্যে মেয়েটা কেমন করে যেন মুখটাকে লুকোল।

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই জবরদস্ত মানুষটা শব্দ করে হেসে উঠল। বলল, 'হাঁ-হাঁ-ই হচ্ছে ভানুমতী...আমার পাখি'। কথাকটি বলেই উঠে বসল লোকটা। কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। তারপর হঠাৎ কী হলো, প্রাণখোলা হাসি হাসল লোকটা। মেয়েটার দিকে নজর যেতেই দেখতে পেল মেয়েটার মুখ অসম্ভব রক্তহীন, সমস্ত কপাল জুড়ে বিজবিজ কবছে ঘাম।

ভীষণ রকমের এক ধরণের উত্তেজনা অনুভব করল রতন। শুধোল, 'কিন্তু বংশীলাল যে বলে ভানুমতীকে কেউ-ই চিনতে পারে না'?

'ঠিক, ঠিক বলেছে বংশীলাল'। কথাকটি বলেই কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে গেল লোকটা। পরে মেঘ ডেকে উঠল গলায় তার, 'এ শালা হারামখোর বংশী ইধার আ....।

কথা শেষ হ'তে না হতেই বংশীলাল মাথা গোঁজ করে এসে হাজির হল।

'এই শাল্লা গোর দাবা'? লোকটা হুকুম জারী করল বংশীলালের দিকে চেয়ে।

আর অমনি দেখলো রতন সকালের তেজস্বী বংশীলাল অনুগত ভৃত্যের মত লোকটার পায়ের কাছে বসে, পা টিপতে লেগে গেল।

রতন উঠে দাঁড়ালো। ওকে উঠতে দেখে ওরা কেউ-ই কোন কথা বলল না। তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল রতন। সন্ধে হয়ে আসছে। ভূষোকালির মত চতুর্দিকটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। উপরের আকাশে দু-চারটে পাখি পুব থেকে পশ্চিমে উড়ে যাচ্ছে।

বাইরে দাঁড়িয়ে একবারের জন্য চমকে পেছন ফিরে দেখল রতন। তাঁবুর ভেতর থেকে সেই আগেকার মত চুন্ চুন্ করা হাসির শব্দ কানে এল। গোপালের কথাটা মনে পড়ল ঠিক সেই সময় রতনের। 'থেটার থেটার করতে হবে তোকে।' ভাবল, বংশীলাল পাকা থেটাবের লোক। এখন কেমন পোষমানা সাপের মত জবরদস্ত লোকটার পা টিপে দিচ্ছে। চোখদুটো জ্বালা করে উঠল। নুলো হাতটাকে অনেক কষ্টে, চোখের কাছে টেনে তুলে চোখের ওপর রাখল। কেন যেন অকারণেই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে নামছে রতনের।

সুখের খোঁজে

মেটে রং-এর আকাশটা ক্রমশ ফিকে হয়ে যেতে লাগল। তখনও গঙ্গার দু'পাশের সবকিছু কেমন যেন রহস্যময়ীর মত ঘোমটা টেনে রয়েছে। পাড়ে জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। এই বুঝি পাখ-পাখালির ঘুম ভাঙলো। জ্বালা করছিল চোখ দুটো নিতুর। নিবু নিবু চিতার ধোঁয়া নৃত্যের ভঙ্গিতে পাক খেতে খেতে মিলিয়ে যাচ্ছে। শ্মশানের লোকজনের দিকে চোখ গেল নিতুর; দেখলো সবাই কেমন ক্লান্ত, অবসন্ন। বড় করে হাই তুলল সে। দেখল, এক মনে ঘন্টু বড় একখানা বাঁশ হাতে নিয়ে ছোট্ট হয়ে আসা মা-র শরীরটাকে নিয়ে কী ভীষণ এক খেলায় মেতে উঠেছে। ভাবলেশহীন মুখচোখে ঘন্টুকে প্রেতলোকের অধিবাসী বলে মনে হতে লাগল সে সময় ওর। পোড়া কাঠের টুকরোগুলো গুছিয়ে গুছিয়ে মা-র দেহের অবশিষ্টাংশটা এক জায়গায় জড়ো করে পকেট থেকে বিড়ি বের করল ঘন্টু। জ্বলন্ত কাঠের টুকরো হাতে নিয়ে বিড়িটাকে দু'ঠোঁটের মাঝে রেখে কেমন চোখে তাকাল নিতুর দিকে। ঠিক সেই সময় জ্বলন্ত কাঠের টুকরোটাকে মুখের কাছে এনে বিড়ি ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ধীর মন্থর পায়ে নিতুর কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা সব কোথায় রে নিতু?'

নিতু হাতের ইশারায় চায়ের দোকান দেখিয়ে মাথা হেঁট করে বসে রইল। ঘন্টু চিতার দিকে চোখ রেখে বললে, 'চা খাবি?'

মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল নিতু।

ঘন্টু ওর মুখের দিকে চেয়ে ফ্যাকাশে হাসবার চেষ্টা করল। 'ধুত, তুই কী রে। এটা শেষ হতে এখনও ঘন্টখানেক দেবি। এই নিয়ে আমার আটান্নটা হলো।'

ঘন্টুর কথাগুলো কানে যেতেই শরীরটা কেমন যেন ছমছম করে উঠলো নিতুর। ওর দিকে তাকাতে কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকছিল সে সময়। কেমন ভয় ভয়ও। কিন্তু কিছু বলার আগেই টের পেলো, ঘন্টু ওর একটা হাত ধরে টেনে তুলছে। ঘন্টুর শিরা বের করা ঝিরঝিরে চেহারা দেখে কখনও মনেই হয় না, এত শক্তি ওর ওই হাত দু'খানাতে রয়েছে। হাতটা ব্যথায় টনটন করে উঠলো, নিতু না উঠে পারল না। ওকে দাঁড়াতে দেখেই ঘন্টু বলল, 'দ্যাখ নিতু, তুই এমন ভাব করছিস যে মনে হয়....'

কথা শেষ করতে দিল না নিতু। প্রশ্ন করে, 'কী মনে হয় রে?'

'কী আবার। মা-বাপ চিরকাল কি কারো থাকে রে? চ', চা খাই।' শেষের কথাগুলো পরম মমতায় বলে গেল ঘন্টু।

ঠিক সেই সময় ওরা শুনতে পেলো, শ্মশানের উত্তর দিক থেকে চিৎকার, চেঁচামেচি, দুদ্দাড় দৌড়ের শব্দ। হাতটা ছেড়ে দিয়ে এক লাফে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে গেল ঘন্টু। মুহূর্তকাল স্থির

থেকে চিতার গলগলে ধোঁয়ার দিকে চোখ মেলে তাকাল নিতু। মা-র মুখটা ঠিক সেই সময় সে স্পষ্ট দেখতে পেলো। মা-তার মা। বুকের মাঝে একটা চাপা ব্যথা অনুভব করল ও, ডান হাত দিয়ে বুকের ওপর হাত বোলাতে লাগল কিছুক্ষণ। তারপর একসময় বুঝতে পারল, ব্যথাটা ক্রমশ কমে আসছে। মনে পড়লো, সারারাত এক বিন্দু জলও সে ঠোঁটে ছোঁয়ায়নি। এই যেন প্রথম ওর খেয়াল হল, শ্মশান-বন্ধু যারা এসেছে, তাদের প্রতি যে তার একটা কর্তব্য আছে, তা মনেই পড়েনি। এক জাতীয় গ্লানি সেসময় ওকে পুড়িয়ে খাঁক করে দিতে লাগল। মা-র মুখটা অমন করে বারবার তার চোখের সামনে উঁকি মেরে যাচ্ছে কেন? সেই লাল পেড়ে গরদের শাড়ি পরা, কপালে টক্‌টকে গোলা সিঁদুর, হাতে পদ্মকাটা থালা, তার ওপর প্রসাদী ফুল আর যৎসামান্য সাদা বাতাসা, গুজিয়া, কলা আর পেয়ারার কুচি। ঘরে ঢুকে প্রসাদী ফুল কপালে ছুঁইয়ে মা বলতেন, 'নে পেসাদ নে নিতু।' এই সব কিছু এমন করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে কেন তার কাছে? চোখ দুটো ভীষণ জ্বলতে থাকল। দু'চোখের সাদা জমিতে জল বর্ষাকালীন নদীর মত থই থই করতে লাগল। গলার কাছে, বুকের মাঝে কেমন যেন ঢেউ তোলপাড় করছে। ঠিক সেই সময় ঘন্টু ফিরে এসে ওর চোখে জল দেখে কেমন হতভম্ব হয়ে গেল। মুখে হাসি নিয়ে বলে, 'জানিস নিতু, ওখানে না, মড়াটা টুইস্ট নাচ নাচছিল।'

পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ মুছলো নিতু।

কেমন এক সুখের নেশায়, আত্মতৃপ্তির আনন্দে মশগুল হয়ে গিয়ে ঘন্টু বলে, 'শালার মানুষের কলকব্জাগুলো বড় তাজ্জব রে।'

ঘন্টুর কথা বলার কায়দা যেন সব কিছু ভুলিয়ে দিতে লাগল নিতুকে। ও অপলকে চেয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে।

ঘন্টু হাসতে হাসতে বলে, 'জানলি নিতু, এখানে যারা আসে, সব এক-একটা চিড়িয়া, খাঁচায় পুরে রাখলেই হলো।'

নিতু শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছিল রে ঘন্টু ওখানে?'

ফ্যাচ্‌ করে হেসে ফেলল ঘন্টু ওকথায়। হাসতে হাসতে বলে 'চ', চা খেতে খেতে শুনবি চ'।'

শ্মশানের বাইরে পাতা ছোট্ট বেঞ্চিতে বসে ঘন্টু চায়ের অর্ডার দিল। পকেট থেকে বিড়ি বার করে নিতুর হাতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, 'নে খা।'

হাত বাড়িয়ে বিড়ি নিল নিতু। তারপর এক সময় অপরাধীর মত গলা করে বলে, 'বড্ড ভুল হয়ে গেছে রে ঘন্টু?'

'কী হলো আবার?'

'সারা রাত্তির হীরু ঘোতন আর মদনারা শুকনো মুখে রইল—ওদের কথা আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম।'

'সে ভাবনা তোর ভাবতে হবে না। হীরু ঘোতন আর মদনা—শালারা এক নাম্বারের..-

'হোক গে। তবু আমার তো একটা কর্তব্য আছে?'

'দুস শালা। তোর মা মরেছে, তোর আবার কর্তব্য কী রে। আর তা ছাড়া তুই তো আমাদের মত সেয়ানা খচ্চর হতে পারলি না, ভদ্দরলোক হয়ে রইলি......বলতে বলতে হঠৎ গম্ভীর হয়ে গেল ঘন্টু।

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে আত্মতৃপ্তির শব্দ বের করল ঘন্টু মুখ দিয়ে। ভাঁড়টাকে বেঞ্চের একপাশে রেখে বিড়ি ধরিয়ে বলতে থাকে, 'জানিস নিতু, শ্মশানে আসতে আমার খুব ভাল্লাগে। তোর মা-কে নিয়ে এই আটান্নটা মড়া পোড়ালাম। লোকে বলে শ'খানেক মড়া যে পোড়াতে পারে, তার কপালে অনেক সুখ। জানিস, এই যে তোর মা মরলো, এতে আমার দুঃখ নেই, যেই শুনলাম তোর মা মরেছে, অমনি কী বলবো তোকে, মনটা ভীষণ খুশী হয়ে উঠলো। মাঝে মাঝেই মনে হয়, আমি শালা আগের জন্মে ডোম ছিলাম। বড় ভাল কাজ রে ডোমদের। সাধু-সন্ত-চোর-জোচ্চর সব শালা ওদের হাতে। বল ঠিক বলেছি কী না বল?'

নিতু মাথা নাড়ায় সে কথায়। বলে, 'হ্যাঁরে ঘন্টু তুই কী বাকি জীবনটা এমনি করেই কাটিয়ে দিবি।' নিজের কানেই কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকল কথাগুলো। সে কথায় রাগ করল না ঘন্টু উপরন্তু হো হো করে হেসে উঠল। চায়ের ভাঁড়ে শেষ চুমুক দিয়ে দূরে রেল লাইনের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল ভাঁড়টা।

মাথা গোঁজ করে বসে রইল নিতু। ধরা গলায় আস্তে আস্তে বলে, 'তুই ঠিকই বলেছিস ঘন্টু, শ্মশান একটা তাজ্জব জায়গা।'

সে কথায় হাসল ঘন্টু। কথার মোড় ঘোরাবার জন্য ইচ্ছে করেই কী না কে জানে, বলে, 'ওই দিকে যাদের দেখছিস, ওরা তোর মতন ফাস্ট টাইম এসেছে এখানে। তাই এমন ভয় পেয়ে গিয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছিল।'

'কই, আমার তো কোন ভয় করেনি?'

'করতো, যদি দেখতিস, তোর মা চিতার ওপর উঠে বসেছে কিংবা হাত-পা ওপরের দিকে তুলে দিচ্ছে '। ভীষণ মজার একটা কথা বলল যেন ঘন্টু; এইভাবে খিলখিল করে হাসতে লাগল। হাসলে পর ওর চোখ দুটো, মুখটা ভূতের বইয়ের মলাটের মত হয়ে ওঠে।

নিতু ওর কাঁধে জোরে একটা ঝাঁকুনি দিল। ফলে, কেমন যেন ঘাবড়ে গেল ঘন্টু, ভ্যাবলা চোখে সরাসরি ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

নিতু শান্ত গলায় বলে, 'তুই মরামানুষ নিয়ে অমন করে কথা বলিস কেন ঘন্টু?' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ফের বলতে থাকে নিতু, 'জানিস ঘন্টু, মা বারবার আমার চোখের সামনে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কী যেন বলতে চায়, আমি ঠিক তা ধরতে পারি না'।

ঘন্টু সে-কথার ভেতর না গিয়ে বলে, 'বলছিলাম না, মানুষের কলকব্জাগুলো ভীষণ নড়বড়ে। কোন কোন সময় মরামানুষের শিরেও টান লাগে আর তখন মরামানুষও উঠে বসে হাত-পা ছোঁড়ে। আর আনাড়িরা তা দেখে ভাবে ভূত, ভয় পায়। এই নিয়ে আটান্নটা মড়া পোড়ালাম। আর বাকী বিয়াল্লিশটা। শালার শ'খানেক মড়া পোড়াতে পারলে আর মাত্তর বিয়াল্লিশটা'।

মনে মনে ভাবল নিতু, ঘন্টু তোর মধ্যের মানুষটা মরে গেছে নইলে তুই অমন নিষ্ঠুর উপায়ে সুখের সন্ধান করিস কেন? কিন্তু সে এ সব কিছুই প্রকাশ করতে পারল না; ভেতরে ভেতরে চূড়ান্ত এক অস্বস্তির স্রোত বয়ে যেতে থাকল।

ঘন্টু এবার বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চ ভেতরে যাই?'

'কিন্তু ওদের তো আর দেখছি না। কোথায় গেল বল দেখি?'

'কোথায় আবার! ন্যাংটো সন্নেসীকে ঘিরে গাঁজায় দম দিচ্ছে দেখগে যা। শালার ঘোতন আর মন্টাকে তো চিনলি না'।

ঠিক সেই সময় খান কয়েক রিকশার শব্দে পেছন ফিরে তাকাল ঘন্টু। দেখাদেখি নিতুও ফিরল। দেখল, রিকশাগুলোয় জোড়া জোড়া মেয়েছেলে। তা দেখে ঘন্টু, কেমন অদ্ভুত কায়দায় চোখের

মণি ঘোরাল। মুখ দিয়ে চুকচুক শব্দ বের করে রহস্যময় চোখে তাকিয়ে রইল নিতুর দিকে। ঘন্টুর ও ধরণের আচরণে নিতুর কেমন যেন ঘেন্না করতে লাগল। সেই সময় ঘন্টুর মুখটা কেমন চোঁয়াড়ে অশ্লীল হয়ে উঠল। চোখ সরিয়ে নিল নিতু। এমন সময় ওর কানে এল ঘন্টু আপন মনেই যেন বলছে, 'জানিস, ওরা পাপ ধুতে এল, সারা শরীরের পাপ গঙ্গাকে দিয়ে সতীলক্ষ্মী হয়ে ঘরে ফিরবে।' সে কথায় নিতু কোনই উত্তর করলো না। নির্বাক বসে রইল। সময়ের পা দ্রুত সবে সরে যাচ্ছিল।

অস্ফুট স্বরে নিতুকে ডাকল ঘন্টু, 'ওই দ্যাখ ঘোতন আর মদনার কাণ্ড দ্যাখ'।

প্রচণ্ড অনিচ্ছা সত্ত্বেও না দেখে পারলোনা নিতু। দেখল, ঘোতন হীরু আর মদন ওই রিকশাগুলোর সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ওই মেয়েগুলোর সঙ্গে কি যেন সব বলছে। মেয়েগুলো ওদেব কথায় হাসতে হাসতে ঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মেয়েগুলো অদৃশ্য হয়ে গেলে পর, ওরা দেখলো, ঘোতন ঠোঁটের নিচে আঙুল দিয়ে সাঁই সাঁই শব্দে সিটি বাজাচ্ছে।

ঘন্টু আপন মনেই বলে উঠলো, 'মেযেমানুষ দেখলে শালাদের সব বেভুল হয়ে যায়। শালারা যেখানেই যায় মেয়েমানুষের গন্ধ খুঁজে বেড়ায়'। ওদের উদ্দেশেই কী না কে জানে, থক্ করে একদলা শুকনো থুথু মুখ থেকে উগবে ফেলল ঘন্টু। ওরা আর বেশিক্ষণ সেখানে থাকল না। ধীর পাযে ওবা শ্মশানের ভেতরে ঢুকল।

নিতু আর ঘন্টু ভেতরে এসে দেখল, ওদেব চিতাটা প্রায় নিবু নিবু। তীক্ষ্ণ চোখে চিতা লক্ষ কবতে থাকে ঘন্টু। অদূরে গোল হয়ে বসে থাকা আত্মীয়স্বজনদের দিকে এগিযে গেল নিতু। ওকে চোখ তুলে দেখে, ফেব কথায় ডুবে গেল ওরা। নিতু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনতে লাগল, একজন বলছেন, 'তা শঙ্কর, তোমাব ছেলেটা তো এবাব হায়াব সেকেন্ডারী পাশ করলো। কলেজে পড়াচ্ছ, না চাকরি-বাকরিতে লাগিযে দিয়েছ?

'চাকরি কোথায যে ঢুকিয়ে দেবো'?

'তা ঠিক। আচ্ছা, ভুলু কবরেজেব ছেলে কাশী তো এখন বিড়লানগবে, না হিন্দ মোটরে কাজ করছে; শুনেছি ও নাকি বড় সাহেবেব পি এ। সম্পর্কে ওতো তোমার এক বকমের দাদা হয়--ছেলেকে নিয়ে যাও না একদিন?'

'হ্যাঁ, গিযেছিলাম, ইন্টারভিউ একটা দিয়েছে, খবব আসেনি এখনও'।

'আঃ। খববটা জোগাড় কবার জন্য না হয় একবার গেলে. .'।

'হ্যাঁ, এখান থেকে ফিরে বিশ্রাম-টিশ্রাম কবে বিকেল নাগাদ যাবো ভাবছি '

নিতু সরে এল ওখান থেকে। ঘন্টুব পাশে এসে বসল। ঘন্টু একবাব ওকে দেখে নিয়ে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'ছেলে-বউ, চাকবি-বাকরি এই সব কথাই হচ্ছে না রে? শালাব এখানে যেন কারো কিছুই কবার নেই। নেহাতই দায, তাই আসা। সব শালা সুখ খুঁজছে। আব দ্যাখ, এদিকে যে চিতাটা নিবতে বসেছে, তা বাবুদেব কারুরই খেয়াল নেই। কাব বড়ির বউ কি কবলো, কাব মেয়ে কোথায় ইয়ে করছে, সব ব্যাটাই কেমন ধান্দা বাজিতে মেতে বয়েছে.. কী বলবো তোকে. ঘেন্না ধরে গেছে সব দেখে। ছ্যা ছ্যা।' কথা শেষ করেই ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা প্যাকাটি কুড়োতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ঘন্টু।

তাই দেখে নিতু শুধোয়, 'হ্যাঁ রে, আর কিছু প্যাকাটি নিয়ে আসবো?'

'কেন? ওই শালাদের পুড়িয়ে মারবি নাকি? নাঃ ওদের এখনও টাইম হয় নি।' বলেই হো হো শব্দে হেসে ফেলল ঘন্টু। মুহূর্তকাল, তারপর সব চুপ।

এক মনে পোড়া কয়লাগুলো সরিয়ে দিয়ে ছোট্ট একটা কালো তলতলে মাংসের ডেলা নাকি যেন জ্বলন্ত কাঠের ওপর বাঁশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বসাল। তাব ওপর আরও খান কয়েক জ্বলন্ত কাঠ চাপিয়ে দিয়ে চিতার কোণ ঘেঁষে বসল ঘন্টু। ইশারা কবে পাশে বসিয়ে নিতুকে বলে ঘন্টু 'জানিস নিতু, আমার জ্ঞান হওয়াব আগেই তো মা মরেছিল, নইলে এমনি করে আমাব মাকেও.......'

'আঃ চুপ কর ঘন্টু। ও সব কথা এখন বলতে নেই'।

সে কথায় কেমন ম্লান হাসল ঘন্টু। ধীর গলায় বলতে থাকে, 'ওই যে বলছিলি না, এখন তুই বারবার মা-কে ঘুরে ফিরে কাছে আসতে দেখছিস, কারণ কী জানিস..সে তোর জন্য নয়। ওই যে ঘরে তোর পঙ্গু বাপটা রয়েছে, ওর জন্য......দেখিস তোর বাবাকে না এবার তোর মা কাছে টেনে নেবে'। একটু থেমে হাসতে হাসতে বলল, 'আর সে সময় আমাকে খবর দিতে ভুলিস না'।

কী হলো, নিতু আর নিজেকে স্থিব বাখতে পারল না। রাগে সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। ভীষণ জোরে ঘন্টুর মুখ লক্ষ করে ঘুষি চালাল। কিন্তু সতর্ক, হিসেবী ঘন্টু, সব কিছু আঁচ কবতে পেরে মাথা সরিয়ে নিল। নিতু স্থির শান্ত হলে পর ঘন্টু এগিয়ে এসে নিতুকে বললো, 'খাঁটি কথা বলি তাই কেউ বোঝে না। সব্বাই রাগ করে। তোব চেয়েও তোব মা-র চিন্তা এখন ওই পঙ্গু লোকটার জন্যে। আটান্নটা মড়া পুড়িয়েছি। কম লোক তো আব চোখে পড়ে নি।' কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়াল ঘন্টু। বড় লম্বা বাঁশ দিয়ে চিতাব ছাইগুলো ইতস্তত ছড়াতে ছড়াতে একমুখ হেসে বললো, 'এই দ্যাখ, কত্তটুকুন হয়ে গেছে তোর মা। লোকে বলে, সব্বাই বলে এটা পোড়ে না, মায়ের স্মৃতি নাকি পোড়ান যায় না'।

নিতু শুধোয়, 'তুই কি বিশ্বাস কবিস এসব?'

'কেন, করবো না!' কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সে সময় ঘন্টু। ধীর গলায় যেন আপন মনেই বলে, 'জ্ঞান না হলেও মা-ব কথা '।

নিতু দেখলো, ঘন্টু একমনে সে সময় নিজেব নাভিমূলে হাত বোলাচ্ছে।

ঘন্টু কিছুই বলছিল না। নিতু দেখলো, ঘন্টু এক সময় বাঁশ নিয়ে ছোট্ট হয়ে আসা মা-ব নাভির টুকবো চিতার একপাশে টেনে তুলল। নাভিব টুকবোটা সে সময়ে কেমন যেন দপ্‌দপ্ দপ্‌দপ্ করছিল।

হঠাৎ ঘন্টু জোর গলায় সকলকে লক্ষ করে বললো, 'বাস, এবাব চলে আসুন সকলে। সব শেষ'।

নিতুব আত্মীয়স্বজন এক এক করে এসে ভিড় করলো চিতাব পাশে। ঘোতন হীরু আব মদনও ফিরে এল ঠিক এই সময়।

ঘন্টু একটা সরায় সেই ছোট্ট নাভির টুকবোটা কাদামাটিব মধ্যে ঠেসে দিয়ে আব একটা সরা দিয়ে ঢেকে দিল। নিতুর হাতে দিয়ে বলে, 'দে, জলে ভাসিয়ে দে'।

জোড়া সরা হাতে নিয়ে ধীর পায়ে নিতু এগিয়ে গেল ঘাটের দিকে। মনে হলো নিতুর, মা কে সে চিরকালের জন্য সুখের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

লোকটার ঘরসংসার

লোকটার বউ আর ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার। মানুষটা খুবই সাধারণ। দিন আনে দিন খায় গোছের অবস্থা। বেসরকারী একটি প্রতিষ্ঠানে সামান্য মাইনে পায়। মাইনের টাকা বার দুই তিন গুণে কাপড়ের কোঁচায় বেঁধে পেটের কাছে গুঁজে রাখে। ট্রামে-বাসে না চেপে ধীর পায়ে হেঁটে বাড়ি আসে। চলার সময় মেয়ে-পুরুষ, গাড়ি, ডবল ডেকার, ট্রাম, রিক্সা দেখতে দেখতে লোকটা এগোয়। কাউকে কোনদিন ভাল করে লোকটা দেখে নি। কেননা, চোখে পড়ার মত কিছুই ছিল না লোকটার। উচ্চতায় পাঁচ ফুট দু' ইঞ্চি, হাড় জিরজিরে কঙ্কালসার চেহারা। সপ্তাহে একদিন ও দাড়ি কামায়, একদিন পাল্টায় জামাকাপড়। লোকটার বউ খুব অসুখে ভোগে। অধিকাংশ দিনই ও বাড়ি এসে দেখে, বউটা ব্যথায় কুঁকড়ে শুয়ে আছে। জামা কাপড় ছেড়ে সামান্য সময় ও বউ-এর পাশে বসে গায়ে-মাথায় হাত বুলোয়। বউটা সে সব টের পেলেও কখনো বলেনা ওকে মুখ-হাত ধুয়ে বিশ্রাম নিতে। কেননা, কথা বলার ক্ষমতা প্রায়ই থাকে না বউটার।

ওর বড়ো মেয়েটা এবার বার বছরে পড়েছে। লোকটা কোনদিন বলেনি মেয়েকে সংসারের কাজ-কর্ম করতে। নিজেই বাসন-কোসন মেজে উনুন ধরায়, রাঁধে। সময় পেলে কোন কোন দিন এক কাপ চা করে খায়, বউকেও খাওয়ায়। মেয়েটাই কেমন করে একদিন সব বুঝে বেশ সুন্দরভাবে ঘরের কাজ করতে শুরু করলো। লোকটা সে সবই দেখে। কিন্তু কোনদিনই ও মেয়েকে প্রশংসা করে না, কিংবা ভাত-ডাল পুড়িয়ে ফেললেও বকাঝকা তো দূরের কথা, নিন্দাও করে না।

লোকটার দশ বছরের ছেলেটা স্কুলে যায়। নিজে নিজেই বাড়িতে পড়াশুনো করে। কিছু বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ছেলেটা তার বাপকে কিছুই বলে না। লোকটাও জিজ্ঞেস করে না, ও স্কুলে পড়া পারে কি না। ছেলেটার অস্ফুট ইংরাজি-বাংলা উচ্চারণ লোকটার মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে কে জানে। লোকটা মাঝে মাঝে মুখ তুলে ছেলের দিকে চায়, আবার মাথা গোঁজ করে নিজের কাজ করে একমনে।

অফিসে লোকটা কাজ করে মুখ বুজে। কখনো 'পারবো না' জাতীয় কথা উচ্চারণ করে না। ও অফিসে যায় সকলের আগে। মালিক থেকে শুরু করে নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা ওকে ভালবাসে। ওকে ঘিরে বসে অফিসের লোকজন অবসর সময়ে গল্প করে। এমন কি মালিকও ওর বাড়ির কথা শোনে, ছেলেমেয়ের কথা শোনে। ও অকপটে সব কিছু বলে, কারো কাছে

কিছু লুকোয় না। সকলে যখন হাসে, ও-ও হাসে। ওকে যে সকলে ভালবাসে তা বুঝতে পারে লোকটা। কৃতজ্ঞতায় ভরে থাকে ওর মন সব সময়।

চলন্ত ট্রামে-বাসে কাউকে বিপজ্জনকভাবে উঠতে দেখলে লোকটার সারা শরীর ভয়ে হিম হয়ে যায়। পা-দুটো অসম্ভব ভারী হয়ে ওঠে ওর সেই সময়। ও চলা থামিয়ে বেকুবের মত দাঁড়িয়ে থাকে। আর যেই দেখে লোকটা ঠিকমত উঠতে পেরেছে, ওর বুকের মাঝের অসহায়তা মুহূর্তেই থেমে যায়। পায়ের ভারী ভাবটা ক্রমশ সরে যায়। ও হাল্‌কা মন নিয়ে গন্তব্য পথে এগোতে থাকে। পথে কলা কিংবা আমের খোসা নজরে পড়লে লোকটা পা দিয়ে টেনে টেনে ড্রেনের কোণে নিয়ে গিয়ে ফেলে।

একদিন সন্ধেবেলা লোকটা পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখে, ওরই মত রুগ্ন শীর্ণ চেহারার একজন একটা বড় বাড়ির দেয়ালে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কেউই ওকে ভাল করে দেখছিল না। সকলেই বড় ব্যস্ত। ও কি ভেবে খানিকক্ষণ ভ্যাবলা চোখে মানুষটার মুখ ভাল করে দেখার চেষ্টা করলো। তারপর একসময় নিজের শির বের করা হাত বাড়িয়ে মানুষটাকে ছুঁলো। আর অমনি কাঁদুনে লোকটার কান্নাও গেল বেড়ে।

লোকটা সহানুভূতি মাখান গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'খাবে কিছু?'

দেয়ালে মাথা রেখেই মানুষটা জানাল, না; সে কিছু খাবে না।

লোকটা ওকে আর কী বলতে পারে। চুপচাপ কিছু সময় দাঁড়িয়ে রইল। পরে বলল, 'তাহলে কাঁদ কেন?'

কাঁদুনে লোকটা যা বলল তার অর্থ এই, গত তিন দিন ধরে ওর ছেলেমেয়েরা অভুক্ত আছে। লোকটার কি বা ক্ষমতা! ও কতটুকুই বা সাহায্য করতে পারে! পকেট হাতড়ে দেখে একটা সিকি পড়ে আছে। লোকটা কিছু না ভেবে সিকিটা ওর হাতে দিয়ে বাড়ি ফিরল। বাড়ি এসে লোকটা দেখলো, বউটা তার তক্তপোষের ওপর বসে আছে। ধাঁধাঁয় পড়ে গেল বড় বেশি। দেখলো, বউটা চুল টানটান করে বেঁধেছে, মুখে সামান্য পাউডারের ছোপ। এমন দৃশ্য যে সে এর আগে আর কখনো দেখেনি তা নয়। বছরে দু' একদিন নিশ্চয়ই দেখেছে। লোকটা সামান্য খুশি হলেও প্রকাশ করলো না। ও রোজকার মতো বউটার পাশে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলোল। বউটা ওর চোখে চোখ রেখে সামান্য হাসল। লোকটাও হাসল। মেয়েটার গলা পাশের ঘর থেকে শুনতে পেল ওরা। মেয়েটা বড় সুন্দর গান গায়। কেউ শেখায়নি। পাশের ঘরে রেডিও শুনে শুনে শিখেছে। লোকটা আর তার বউ কান পেতে মেয়েটার গান শুনছিল।

বউটা না বলে পারল না, 'বেশ গায়, নাগো।'

লোকটা সম্মতির ভঙ্গি করে মাথা নাড়ল। বউটা বলল, 'মেয়েটা খুব কাজের'।

লোকটা এবারও আগের মত ভঙ্গি করলো।

বউটা বলল, 'মেয়েটা খুব সুন্দর'।

লোকটা হেসে বলল, 'ঠিক তোমার মত'।

বউটা দুঃখীর মত মুখ করে বলল, 'না, ও যেন আমার মত না হয়'।

লোকটা সামান্য সময় থম মেরে রইলো। প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য বলল, 'ছেলেটাকে দেখছি না যে?'

বউটা বলল, 'ও আজ প্রাইজ পাবে। স্কুলে গেছে।'

লোকটার বিস্ময় গেল বেড়ে। বউটার মুখের দিকে না বোঝার ভঙ্গি করে চেয়ে রইলো।

অনেক কাল পরে প্রাণ খুলে হাসল বউটা। বলল, 'ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে তোমার ছেলে।'

লোকটা খুশী হয়ে মাথাটা এপাশ ওপাশ করতে থাকল।

ছেলেটা ঠিক সেই সময় এক গাদা বই আর কিট্ ব্যাগ সঙ্গে করে ঘরে ঢুকলো। লোকটা আর তার বউ ছেলের দিকে অপলকে চেয়ে রইল।

ছেলেটা বলল, এই ব্যাগটা দৌড়ে পেয়েছি। আর এই বইগুলো. .বলতে বলতে থেমে গেল। ছেলেটা দেখল, বই ও ব্যাগের দিকে ওর বাবার নজর নেই। ওকেই দেখছে কেমন অবাক হয়ে।

বউটা বলল, 'এত বই। ফার্স্ট হয়ে পেয়েছিস নারে?'

ছেলেটা মাথা নাড়ল।

লোকটা হাত বাড়িয়ে বইগুলো ছুঁলো। ব্যাগটা হাতে নিয়ে এপাশ ওপাশ দেখলো। চেন খুলে ভেতরটা নজর করলো। বড় সুন্দর রং ব্যাগের ভেতরটা।

ছেলেটা বলল, 'তোমাকে না হেড স্যার ডেকে পাঠিয়েছে।'

লোকটা বলল, 'কী বললি তুই?'

ছেলেটা বলল, 'বলেছি, তোমাকে নিয়ে যাবো। জানো মা, আরও একটা প্রাইজ আমার পাওনা আছে। আবৃত্তি হয়েছিল। তাতেও ফার্স্ট হয়েছি। অনেক লোক আমাকে দেখছিল।'

লোকটা বলল, 'মুখ হাত ধুয়ে নে।'

ছেলেটা অমনি চলে গেল মুখ হাত ধুতে। বউটা বলল, 'ছেলেটার খুব মাথা।'

লোকটা বলল, ঠিক তোমার মত।'

বউটা বলল, 'না, ও যেন আমার মত না হয়'।

লোকটা হাসল শব্দ করে। বলল, 'মা'র মতো ছেলে হবে নাতো কার মত হবে?'

বউটা বলল, 'তোমার মতো'।

'ধুত! আমি আবার একটা মানুষ।'

বউটা বলল, 'তুমি খু-উ-ব বড় মানুষ'।

লোকটা বলল, 'ধুত'।

সে কথা শুনে বউটা খুব হাসছিল। বলল, 'মেয়েটাকে ডাকো না?'

লোকটা ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে মেয়েটাকে ডাকলো। মেয়েটা একছুটে বেরিয়ে এলো।

লোকটা বলল, 'ওঁদের বলে আয়'!

মেয়েটা ও ঘরে গিয়ে বলেই ফের বেরিয়ে এলো।

লোকটা বলল, 'জানিস তোর ভাই অনেক প্রাইজ পেয়েছে'।

মেয়েটা বলল, 'পারেই তো'।

কেন যেন মেয়েটার চুল এলোমেলো করে দিয়ে হাসতে থাকল লোকটা। বউটা বলল, 'অত হাসছ যে?'

লোকটা বলল, 'দ্যাখো দ্যাখো, তোমার মেয়ে রণচণ্ডী সেজেছে।'

বউটা বলল, 'ধ্যেত, ওতো সাক্ষাত মা লক্ষ্মী।'

মেয়েটা সে সব শুনে হাসল খানিকক্ষণ। তারপর ভাইকে ডেকে আদর করলো।

ছেলেটা ওর দিদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রাইজগুলো দেখাচ্ছিল। মেয়েটা বই-এর গন্ধ শুঁকছিল বিভোর হয়ে। ব্যাগটা হাতে নিয়ে মেয়েটা ঠিক ওর বাপের মত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব দেখলো। ব্যাগটাকে কোলের ওপর রেখে বলল, 'এটা আমার।'

ছেলেটা বলল, 'এসব তোর।'

ওরা যখন এসব বলাবলি করছিল, লোকটা সে সময় বউ-র পাশে বসে আজকের সিকি দেবার ঘটনাটা বলল।

বউটা শুনে শুধু বলল, 'আহা-রে!'

লোকটা বলল, 'আমরা বড় গরীব!'

বউটা কোন কথা বলল না, ম্লান মুখে বসে রইল।

লোকটা বলল, 'একটা টাকা দেবে?'

বউটা বলল 'টিনের বাক্সে আছে, নাও।'

লোকটা বলল, 'কেন নিচ্ছি জিজ্ঞেস করলে না?'

বউটা বলল, 'কেন করবো?'

ছেলেটা দিদির কাছ থেকে সরে এসে বলল, 'বাবা মাংস খাবো।'

মেয়েটাও বলল, 'হ্যাঁ বাবা, মাংস খাবো।'

লোকটা ছেলে-মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল সামান্য সময়। বউটার চোখে চোখ রাখল।

বউটা মাথা নেড়ে বলল, 'আনো।'

লোকটা বলল, 'অনেক দাম।'

বউটা বলল, 'হোক। আনো। অনেকদিন ওরা মাংস খায় নি।'

মেয়েটা বলল, 'বাবা আগামিকাল আমি চিড়িয়াখানা যাবো।'

লোকটা বলল, 'কার সঙ্গে যাবি?'

মেয়েটা উত্তর দিল, 'পাশের ঘরের ওদের সঙ্গে।'

লোকটা বলল, 'তুই ভাইকে ছেড়ে একা একা যাবি কেন?'

মেয়েটা কেমন ঘাবড়ে গেল। গোল গোল চোখ করে ভাই-এর দিকে, বাবা-মার দিকে দেখছিল মেয়েটা। মাথা নিচু করে রইল সামান্য সময়। পরে কি মনে করে বলল, 'না, যাবো না।'

ছেলেটা হাততালি দিয়ে উঠলো মুহূর্তেই। দিদির কাছে এসে বলল, 'তুই খুব ভাল দিদি।'

মেয়েটা উত্তর দিল, 'তুই আমার থেকেও ভাল।'

ওদের মা-বাবা একসঙ্গেই বলে উঠলো, 'তোবা দুজনেই ভাল।'

ছেলেটা কিছু না বলে হঠাৎ গম্ভীর গলায় আবৃত্তি করতে থাকল। স্বামী বিবেকানন্দের মত দাঁড়ানোর ভঙ্গি। ছেলেটার বাবা-মা, দিদি অবাক হয়ে ওর আবৃত্তি শুনছিল।

আবৃত্তি শেষ করে ছেলেটা বলল, 'তোমরা কেউ গেলে না কেন বাবা? সকলের বাবা-মা গিয়েছিল।' লোকটা দুঃখী মানুষের মত মুখ করে বসে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর কি ভেবে সামান্য হাসল।

লোকটা বলল, 'এর পরের বাব ঠিক যাবো। এখন মাংস কিনতে যাই, কেমন?' উবু হয়ে বসে টিনের বাক্স খুললো লোকটা।

বউটা ওদিকে না তাকিয়েই বলল, 'একটা শাড়ির ভাঁজে টাকা আছে। যা লাগে নাও।'

শাড়ির ভাঁজ খুলতেই, এক টাকার বেশ কয়েকটা নোট চোখে পড়লো লোকটার। টাকাগুলোয় হাত বুলোল কিছুক্ষণ। সব মিলিয়ে কুড়ি টাকা আছে দেখতে পেল লোকটা। তার থেকে একটা একটা করে দশ টাকা নিয়ে বলল, 'তিনশো মাংস আনলেই হবে, কী বলো?'

বউটা বলল, 'যা লাগে নাও, একটু বেশি করেই এনো।'

লোকটা বেশি নিল না। নাইলনের ছোট্ট ব্যাগটা হাতে করে বেরিয়ে গেল।

ধীর পায়ে গলি পার হয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়লো লোকটা। আজ আলোর বন্যা বইছে। সকলকেই বড় সুন্দর লাগছিল ওর । যা কোনদিন করে না, আজ ও তাই করলো। মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে লোকজনকে নজর করতে থাকল। মনে হল লোকটার, পৃথিবীর রং পাল্টে গেছে। কারো মুখে বিষণ্নতা বা ক্লান্তির ছাপ নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাবা-মার হাত ধরে এগোচ্ছে। যুবক-যুবতী হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছে। ট্রাম-বাসের মানুষগুলোর মুখেও কেমন হাসি। কন্ডাক্টরের মুখও উজ্জ্বল, প্রসন্ন।

লোকটাকে যেন শৈশব পেয়ে বসলো। মনে পড়লো, ছেলেবেলায় ও একা একা পুকুরের ঘাটে দাঁড়িয়ে জলেব ওপরে কায়দা করে ঢিল ছুঁড়তো। ঢিলগুলো ব্যাঙের মত লাফাতে লাফাতে অনেক দূর এগিয়ে যেতো। খুশীতে হাততালি দিত ও। সাহাদের আম-জাম-কাঁঠাল-আমলকি, জামরুল গাছে ঘেরা বাগানের মাঝে ও একা একা রাজার মত ঘুরে বেড়াত। আজও ঠিক এই মুহূর্তে নিজেকে রাজার মত মনে হল। লোকটা বুক চিতিয়ে নাইলনের ব্যাগ হাতে নিয়ে মাংস কেনার উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।

হাসপাতালের পাশ দিয়ে এগোতে গিয়েই লোকটা কেমন যেন হোঁচট খেলো। এ জায়গাটা কেমন যেন আলো-অন্ধকার মাখানো। লোকটার নজরে পড়লো, একজন জীর্ণ-শীর্ণ মহিলা ফুটপাথের ওপর বসে কাঁদছে। আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ওরই ছেলের বয়সী একটা ছেলে।

ছেলেটা ওর মাকে কাঁদতে বারণ করছে। মহিলা ওর বারণ শুনছে না একটুও। একটানা কেঁদেই চলেছে।

লোকটা এগিয়ে গেল মহিলার দিকে। ভাল করে নজর করে দেখলো ওদের। বুঝলো, মহিলা বড় দুঃখী।

লোকটা বলল, কাঁদছো কেন?

মহিলা কোনই উত্তর দিল না। ছেলেটা ফ্যালফ্যাল করে দেখলো শুধু লোকটাকে।

লোকটা জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে তোমার মা-র?'

ছেলেটা বলল, 'ডাক্তার মাকে দেখেনি। বড় কষ্ট মা-র।'

লোকটা বলল, 'কষ্ট কোথায়?'

ছেলেটা উত্তর দিল, 'বুকে।'

কষ্টটা বুকেই হয় লোকটা জানে। ফ্যাকাশে চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো। চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে এক সময় জিজ্ঞেস করলো, 'ডাক্তার দেখলো না কেন?'

ছেলেটা ঠোঁট উল্টোল সে কথায়। বোঝাতে চাইল, সে জানে না।

লোকটা এবার মহিলাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আহা কাঁদো কেন? কোথায় থাকো?'

মহিলা শতচ্ছিন্ন শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'বজবজ'। স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে ফের ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। মিনিট কয়েক কাঁদলো মহিলা।

লোকটার মাংস কেনার কথা মনেই পড়লো না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো।

মহিলা বলল, 'ভেবেছিলাম ভর্তি হয়ে যাবো, তা দেখলোই না ডাক্তারবাবু।'

লোকটা বলল, 'ভর্তি হতে গেলে সকালে আসতে হয়, টিকিট করতে হয়।'

মহিলা শাড়ির আঁচল খুলে কী যেন বের করতে চাইল।

লোকটা বলল, 'কী আছে ওতে?'

'হাসপাতালের টিকিট।'

লোকটা বলল, 'তবু দেখলো না।'

মহিলা জড়ান গলায় বলল, 'হ্যাঁ বাবু।'

লোকটা বলল, 'তুমি ভর্তি হলে ছেলে কী করে বাড়ি যেতো?'

মহিলা বলল, 'কি করবো বাবু। আর তো কোন উপায় নেই।'

লোকটা বলল, 'সারাদিন কিছু খাওনি বুঝি?'

ছেলেটা অমনি বলল, 'হ্যাঁ খেয়েছি। কি সুন্দর কচুরি, আলুর তরকারি।'

লোকটা বলল, 'এখানে বসে বসে কাঁদলে কি হবে। বাড়ি যাও। কাল ফের এসো।'

মহিলা এবার খিঁকিয়ে উঠলো, বলল, 'কী করে যাবো। এই রাক্ষসটার খিদে মেটাতে গিয়ে সব খরচ হয়ে গেছে।'

ছেলেটা ওদের কথাবার্তা কিছুই শুনছিল না। অবাক চোখে ট্রাম-বাস , লোকজন দেখছিল। আর মাঝে মাঝেই 'আরেব্বাস', 'আরেব্বাস' শব্দ বের করছিল মুখ দিয়ে।

মাঝে মাঝে মহিলা ওকে ধমকাচ্ছিল। 'চুপ যা হারামজাদা, শুয়োর, বজ্জাত।'

লোকটার কি যেন ঘটে গেল মুহূর্তে। এবার নিজেও ওই ছেলেটার মত অবাক চোখে সবকিছু দেখছিল। একটু আগের দেখা মানুষজনের সহাস্য প্রসন্নতা খুঁজে পাচ্ছিল না। বলল, 'রাত বাড়লে বাড়ি যেতে কষ্ট হবে।'

বলেই পকেটের ভেতর হাত ঢোকাল। টাকাগুলো থেকে পাঁচটা টাকা মহিলার হাতে দিয়ে বলল, 'তুমি মরলে এই ছেলেটার কী হবে ভেবে দেখেছো? বাড়ি যাও।' কথা না বাড়িয়ে ঋজু পায়ে বাড়িমুখো হল লোকটা। বউটা বলল, 'এত দেরী করলে কেন?'

লোকটা খালি থলে মেঝের ওপর রেখে স্পষ্ট শুনিয়ে সব বলল।

বউটা বলল, 'তা হলে?'

লোকটা বলল, 'জানি না।'

ঠিক সেই সময় ওরা লক্ষই করেনি ছেলেটা ও মেয়েটা দরজায় মুখ বাড়িয়ে সব শুনছিল। ছেলেটা মেয়েটাকে মেয়েটা ছেলেটাকে দেখছিল।

কি মনে করে হঠাৎ দুজনে হেসে উঠলো।

সে হাসির শব্দে লোকটা ও তার বউ ফিরে তাকাল।

মেয়েটা আর ছেলেটা লোকটার দুপাশে গিয়ে দাঁড়াল।

মেয়েটা বলল, 'মাংস আমার খেতে ভালই লাগে না।'

ছেলেটা বলল, 'কি রকম বিচ্ছিরি গন্ধ, তাই নারে দিদি?'

বউটা বলল, 'আসছে মাসে খাস।'

লোকটা বলল, 'মাস শেষ হতে আর ক' দিনই বা বাকী'।

মেয়েটা বলল, 'চা করি?'

লোকটা হেসে বলল, 'হ্যাঁ তাই কর।'

ছেলেটা দিদির পাশে বসে দিদির কাজকর্ম দেখছিল একমনে।

বউটা আড়ালে চোখের জল মুছলো।

লোকটা উঠে ঘরেব মধ্যে পায়চারি করতে করতে নিজের মনেই বলল, 'দয়াময়! দয়াময়!'

গোপন কৌটো

ইন্টারভিউর জন্য জনা তিরিশের মধ্যে বাদুও ছিল। গিয়েছিল গভর্নমেন্ট আন্ডারটেকিং-এর এক অফিসে। গিয়ে শোনে লোক নেবে মাত্র দু'জন। বাদুব তখন থেকেই ধারণা হল এগার বারের সুযোগটাও ফস্‌কে গেল। নিয়মমাফিক গিয়ে হাজিরও হল ইন্টারভিউ বোর্ডে। জনাকয়েক গাবদা-গোবদা চেহারার মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে রইল মিনিটকয়েক। ওঁরা বসতে বললে, বাদু নিঃসঙ্কোচে বসল। এর আগে দশ জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়েছে, সুতরাং প্রথম কয়েকবারের মত মানসিক উৎকণ্ঠা ছিল না। ওঁদের প্রশ্ন করার আগেই সার্টিফিকেট এগিয়ে দিল বাদু।

ইন্টারভিউ বোর্ডের একজন বলল, 'মিছিমিছি ছেলেদের হয়রানি কবছে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ। যা চাইব তা তো পাঠাবেই না, উল্টোপাল্টা লোক পাঠাবে। হোপলেস।'

বাদু সার্টিফিকেটগুলো গোছাতে গোছাতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'নমস্কার', সময় নষ্ট না করে সুইংডোর ঠেলে বাইরে বেরিয়ে একটা আকাশ ছোঁয়া বাড়ির নিচে এসে দাঁড়াল। চা খেতে ইচ্ছে করল খুব। পকেটে একখানা দু'টাকার নোট আর টাকা খানেকের মত খুচরো রয়েছে। সুতরাং বেশ খোস মেজাজেই এক কাপ চা আর নোনতা বিস্কুট কিনে খেল। বসে বসে লোকজন, গাড়ির এদিক ওদিক ছুটে যাওয়া লক্ষ করতে লাগল। মিনিট কয়েক পর একজন হিন্দুস্থানী নোংরা তেলচিটে থলে ঘাড়ে করে বাদুর থেকে হাত কয়েক দূরে ঘেরা জায়গায় গিয়ে বসল। লোকটার মলিন জামাকাপড়, খোঁচা খোঁচা দু'তিনদিনের বাসি দাড়ি, বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। জামার পকেট থেকে খৈনির ডিবে বের করে তামাক পাতা বাঁ-হাতের চেটোয় রেখে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ডলতে শুরু করল লোকটা। বাঁ-হাতের চেটোয় দু'তিনটে থাপ্পর মেরে কিছুটা ঝাঁঝাল ধুলো ওড়াল। তারপর নিচের পাটির দাঁতের গোড়ায় খৈনি ঠেসে দিয়ে থলের ওপর কাত হয়ে শুয়ে পড়ল।

কী মনে করে বাদু লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, 'কিসের ব্যবসা তোমার?'

'পুরানা লোহা-লক্কর, আকবর ঔর শিশি বোতলকা।'

বাদু উৎসাহী হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'খাটনি পোষায়?'

'ক্যায়া করে বাবু, কুছ না কুছ তো করনাই পরেগা। নাফা নেই হোনেসে চলেগা ক্যায়সে।' উত্তর দিয়ে লোকটা পিক করে থুথু ফেলল।

'কেমন লাভ হয়?'

লোকটা থলেটা দেখিয়ে বলল, 'ইসমে তিনশ রুপিয়া কা সামান হায়। লাগভাগ চাবশো রুপিয়ামে তো বিক যায়েগা।'

লাভের অঙ্কটা মাথায় যেতেই হকচকিয়ে গেল বাদু। ভাবে, বলে কি লোকটা! একশো টাকা লাভ। বিশ্বাস করতে মন চায় না। ভাবে রোজ যদি এরকম লাভ হয় তো মাসে তিন হাজার টাকা। তিন হাজার টাকা তো বড় বড় অফিসে যারা চাকরি করে তারাও পায় না অথচ জগৎজয় করা ভঙ্গি ফুটে ওঠে ওদের চলনে বলনে। আর এই লোকটাকে দেখে কি কেউ পাত্তা দেবে? নিজেই কি পাত্তা দিয়েছিল প্রথমে? এখন কেমন সমীহ্ করতে ইচ্ছে হচ্ছে লোকটাকে।

বাদু এবার প্রশ্ন করল, 'রোজই কি এরকম লাভ হয় তোমার?'

'নেহি বাবুজী। কই দিন ইস্‌সে থোরা জ্যাদা ভি হো যাতা। কই ঠিক ঠিকানা নেহি।'

লোকটা গুছিয়ে গুছিয়ে বলল কথাক'টি।

লোকটাকে ভাল লেগে গেল বাদুর। সে জন্য বুঝি জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবে?'

'নেহি বাবুজী। বেকার পয়সা খরচা করনা ঠিক নেহি।'

বাদু এই প্রথম যেন একজন খাঁটি মানুষ দেখতে পেল। জিজ্ঞেস করল, 'কতক্ষণ খাটতে হয় তোমাকে?'

লোকটা এবার অমায়িক ভঙ্গিতে হেসে বলল, 'সুবে সে সামতাক।' পরক্ষণেই জিজ্ঞেস করল, 'আপ কৌন আপিস মে কাম করতা বাবুজি?'

বাদু হো হো করে হেসে বলল, 'বেকার।'

'আরে রাম। রাম। জওয়ান হো, সমঝদার হো, কই কাম কাজ তো করনাই চাহিয়ে; নেহি তো দিন গুজরে গা ক্যায়সে?'

বাদু এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিল, 'কি করবো বল?'

'কিঁউ? হামারা মাফিক কাম করো।' লোকটা বেশ স্পষ্ট করে বলল কথাগুলো।

'ব্যবসা করতে গেলে টাকা লাগে, তাছাড়া এ-লাইনের কিছুই তো জানি না।' বাদু উত্তর দেয়।

লোকটা এবার সোজা হয়ে বসল, বলল, 'মেরা পাত্তা লিখ লো বাবুজী। হাম তুমকো মদত করেগা।' বলেই গড় গড় করে বাড়ির ঠিকানা বলে গেল। বাদু সার্টিফিকেট ভরা খামের ওপর লোকটার নাম ঠিকানা লিখে নিল। লোকটা আর মিনিট পাঁচ-সাত বিশ্রাম নিয়ে ভারী থলেটা ঘারে করে প্রথমেই হাঁক দিল, 'পুরোনো লোহা বিক, শিশি বোতল বিক।' ঘার ফিরিয়ে বাদুর দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল লোকটা।

পরদিনই লোকটার কাছে গিয়েছিল বাদু। ওকে দেখে মুখ ভর্তি হাসি নিয়ে বলল, 'পুরানা লোহা, খালি টিনা, শিশি বোতল খরিদনা পড়েগা। লোহা মে নাফা জাদা। জিস দিন যো কুছ মিলেগা, উসসেই কাম চলা যায়েগা। লেকিন থোরা সা রুপিয়া তো তুমহারা লাগবেই করে।'

'সেটা আমি যা পারি জোগাড় করব। তুমি শুধু বিক্রি বাটার ব্যাপারে আমাকে একটু সাহায্য ক'রো।'

লোকটা থলের ভেতরে দাঁড়ি পাল্লা ভরতে ভরতে উত্তর দিল, 'ফিকার মত কিজিয়ে। জয় রাম জী কী।' বলেই থলে ঘাড়ে করে বেরিয়ে যায়।

বাড়িতে সব জানাজানি হতেই বাড়ির পরিবেশটাই একদম পালটে গেল।

ছোট ভাই সতু বলল, 'এটা পাগলামি ছাড়া কিছু নয়।'

বাবা বলে, 'না না, এ হতেই পারে না। লোকে শুনলে বলবে কী?'

মা বলে, 'মান-ইজ্জত বলতে আর কিছু রাখবি না দেখছি।'

বাদু সামান্য প্রতিবাদ করে বলে, 'কিসের মান-ইজ্জত। খেটে খাবো, কাউকে আমি পরোয়া করি না।'

বাবা বলে, 'আমার বন্ধু-বান্ধবরা যদি দেখে তো কী ভাববে বল?'

সতু বলে, 'নুইসেন্স। থলে ঘাড়ে করে তুই যখন রাস্তায় বেরুবি, পাড়ার কুকুরগুলো তোর পেছনে লাগবে।'

বাদু সহাস্যে বলল, 'কুকুরের কাজই তো ওই। এগারোটা ইন্টারভিউ দিলাম, বোগাস। লোক দেখান ধাপ্পাবাজি। দু'দিন যদি না খেয়ে থাকি, তাহলে কি পাড়া প্রতিবেশিবা খেতে দেবে? আর খাবই বা কেন? কারও দয়ায় জীবন কাটানোর চেয়ে ফিরি করে রোজগার করাও অনেক সুখের।' আর বেশি কথা বাড়ায়নি বাদু। সামান্য টিউশানির পঞ্চাশ-ষাট টাকা সম্বল করে ওই লোকটার কাছে ফের হাজির হয়েছিল বাদু। লোকটা কোথায় কোথায় এসব ভাঙাচুড়ো জিনিস পাওয়া যায় তার সঠিক নির্দেশ দিয়েছিল। কী দামে মাল কিনলে লাভ হবে তাও বলে দিয়েছিল ওকে। মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্তরাই নাকি এসব জিনিস বেশি বিক্রি করে। বাদু গেল মানিকতলা, বাগমারি অঞ্চলে। এঁদো গলির মধ্যে ঢুকে গলাটাকে সামান্য অস্বাভাবিক করে হাঁক ছাড়ল, 'পুরানা লোহা কাগজ বিক; শিশি বোতল বিক।'

ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে পকেটের সব টাকা থেকে মাত্র দু'টাকা বাঁচিয়ে প্রথম দিনই ওর মাল কেনা হয়ে গেল। সারাদিন ঠায় বসে রইল লোকটার জন্য। ও ফিরল অনেক বেলা করে। জিনিসপত্র পরখ করে, ওজন করে প্রথম দিনই ওর কাছ থেকে মাল কিনলো। বাদুর লাভ হল বারো টাকা।

দেখতে দেখতে বাদুর পুঁজি বেড়ে গেল। এই ফাঁকে ও আরও নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করল। প্রেসে প্রেসে ঘুরে ছাঁট কাগজের ব্যবসা শুরু করে দিল। এ সব কথাই ও লোকটাকে বলল।

লোকটা খুব খুশি । বলল, 'একরোজ তুহারকা বহুত কিমত বাড় যায়েগা, হুঁ।'

লোকটার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যেতে লাগল। বাদু একদিন কলেজ স্ট্রিটের একটা গলিতে রুটি তরকারি কিনে খেল। আশপাশটা জুল জুল করে দেখতে দেখতে হঠাৎই ওর মনে হল, একটা ছোটখাট দোকান ঘর ভাড়া না নিলে চলছে না। কোনক্রমে যদি একটা দোকান ঘর জোগাড় করে ফেলতে পারে তো বসে বসেই রোজগার করে ফেলতে পারবে। এখন ওর অনেক নতুন নতুন জায়গা চেনা হয়ে গেছে। ওরই মত কারবারীরাও ওকে চিনে ফেলেছে। ফলে, বাদুকে মাল কিনে ওই লোকটাব জন্য আব বসে থাকতেহয় না। এখন চেনা-জানা দোকানগুলোতে হাজির হয়ে মাল বেচে দিয়ে গুনে গুনে পয়সা নেয়। বাদু আজ যখন সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট দিয়ে কাঁধে ঝোলা নিয়ে ফিরছিল, তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। মুখোমুখি দেখা হল হিমাদ্রির সঙ্গে। হিমাদ্রিব গায়ে কালো কোট, হাতে লম্বা মতন একগাদা কাগজ, সারা শরীরে সাফল্যের ছাপ হিমাদ্রিব।

বাদু জিজ্ঞেস করল, 'হিমাদ্রি না? আমি বাদু?'

হিমাদ্রি আপাদমস্তক বাদুকে দেখে মুচকি হেসে বলল, 'স্ট্রাগল করছিস?'

বাদুও হাসল সে কথায়। বলল, 'কী করি বল? দোরে দোরে চাকরির জন্য আর কতকাল ঘুরবো?'

'বেশ করেছিস।'

'তা তো বলবিই। আমি না ডাকলে, তুই কি চিনতে পারতিস আমাকে? অথচ দীর্ঘদিন আমরা একসঙ্গে পড়েছি।'

হিমাদ্রি উত্তর দিল, 'সত্যি বলছি চিনতে পারতাম না। তোর জামাকাপড় আর এই থলে ঘাড়ে দেখে কেউ বিশ্বাসই করবে না।'

বাদু ভরাট গলা করে বলল, 'আমার বাড়ির লোক কেউই আমার সঙ্গে দু'দণ্ড কথাও বলে না।'

'ফলস্ প্রেস্টিজ। কী করবি বল।' হিমাদ্রি উত্তর দিল। কিছুটা সময় নিয়ে ফের বলল, 'সময় পেলে একদিন কোর্টের দিকে চলে যাস। গাছতলায় দেখবি কত উকিল। লোক দেখলেই ওরা টানাটানি করে 'এফিডেবিট' 'এফিডেবিট' বলে। যার কাছ থেকে যা পারে আদায় করে ছাড়ে। দিনে পাঁচ-ছ'জনকে জপাতে পারলেই তিরিশ চল্লিশ টাকা রোজগার। ওদের বাড়ির লোকেরা কি জানে, কিভাবে মানুষটা রোজগার করে আনছে ঘরে। বাড়ির সামনে কিন্তু নেমপ্লেটের বাহার রয়েছে সকলের।'

বাদু মৃদু হেসে বলে, 'এভরি ওয়ার্ক ইজ অনারেবল এ কথাটাই বলতে চাইছিস তো?'

হিমাদ্রি তার উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করল, 'ও বাড়িতেই আছিস তো?'

'আর কোথায় যাব।'

'এত খাটছিস, হয় টয় কিছু?' হিমাদ্রি জিজ্ঞেস করে।

'এ লাইনে প্রায় বছর দেড়েক হয়ে গেল। দিনে ষাট-সত্তর টাকা হয়। একটা ঘর পেলে বসে বসে শ'দুয়েক টাকা রোজগার করতে পারতাম।'

হিমাদ্রি কী ভেবে বলল, 'কাল সময় করে সন্ধ্যে সাতটার পর আমার বাড়ি আসিস। কথা আছে।'

বাদু জানত না জীবনের ভোলটা এমন করে পাল্টে যাবে। পরদিন ধোপ দুরস্ত হয়ে হিমাদ্রির বাড়ি গিয়েছিল।

বাদুর জন্য চায়ের কথা বলে হিমাদ্রি সরাসরি বলল, 'তোকে একটা ঘর দিতে পারি, নিবি?'

আকাশ থেকে পড়ল যেন বাদু। উত্তর দিল, 'নেব না মানে।'

হিমাদ্রি বলল, 'বাড়িতে ঢোকার মুখেই গ্যারাজের পাশে একটা ছোট ঘর আছে। অনেকেই এসেছিল, দিইনি। ভালই করেছি, তোর কাজে লাগল, কি বল?'

বাদুর দু'চোখ ভর্তি হয়ে গেল জলে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'কবে থেকে পাব?'

হিমাদ্রি একটা মরচে ধরা চাবি বাদুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আজ থেকেই। ভাড়া কিন্তু

দেড়শো লাগবে।'

'লাগুক।' বাদু নির্দ্বিধায় উত্তর দিল।

চা এল; সঙ্গে নিমকি, বিস্কুটও।

বাদু হাত বাড়িয়ে একটা বিস্কুট হিমাদ্রির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নে ধর।'

হিমাদ্রি ভুরু কুঁচকে ধমকে দেবার ভঙ্গি করে বলল, 'এটা আমার বাড়ি, ভুলে যাস না। আগে নিজে খা তো? হ্যাঁরে, মাসিমা কি আমাকে দেখে এখন চিনতে পারবেন?'

বাদু চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'কি জানি।'

সামান্য সময় চুপ করে থেকে ফের বলল, 'তোর সব কথা শুনে মা-বাবা হয়তো আমার অপদার্থতার কথা সাত কাহন করে বলবে। সত্যিই বলছিস তুই যাবি?'

হিমাদ্রি হেসে বলল, 'আলবাৎ যাব, দেখিস।'

ঠিক সে সময় হিমাদ্রির দু'জন মক্কেল ঘরে ঢুকতেই বাদু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আজ্ঞ তাহলে আসি?'

হিমাদ্রির গলার স্বর পালটে গেল মুহূর্তেই। বলল, 'হ্যাঁ আসুন।'

'আপনি' সম্বোধনে বাদু একটু ঘাবড়ে গেলেও পরক্ষণেই বুঝল, মক্কেলদের সামনে ও-ধরনের ব্যবহার না করলে চলে না। তাই কিছু মনে না করেই ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বাদু।

দিন যায়। বাদুর ব্যবসা রমরম করে বেড়ে গেল। দোকানে একজন কর্মচারী রেখেছে। নিজে এখন বেরোয় অক্সানে। এ লাইনে এসে বাদু রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেল। অনেক অনেক টাকার মালিক এখন বাদু।

সতু টেব পেয়ে একদিন বলল, 'মিছি মিছি দু'শো টাকা দিয়ে লোক রেখেছিস। আমিই তো পারি ও কাজ করতে।'

বাদু একটুও অবাক হল না সে কথায়। বলল. 'একজনেব চাকরি খাওয়াটা কি ঠিক। তাছাড়া ছেলেটা খুব অভাবী ও বিশ্বাসী। তোব জন্য একটা ভাল কিছু করে দেব ভাবছি।'

ঠিক চার মাসের কনট্রাক্টে মধ্যমগ্রামে একটা ভাল বাড়ি করল বাদু। বাবা-মা'কে সে কথা বলতেই ওরা সবিস্ময়ে চেয়ে থেকে বলল, 'সত্যিই তুই পারিসও বটে। এবার নিজের দিকে একটু তাকা?'

বাদু বলল, 'আমার ভাবনা তোমরা ভাববে; তোমাদেরটা আমার। সুমিও তো দেখতে দেখতে বড় হচ্ছে, ওর ভাবনাটা আগে, তারপর সব।'

মা বলল, 'কবে ও বাড়ি যাবি? কেমন হল, আগে থেকে দেখে এলে হয় না?'

'পরশুই তো পয়লা বোশেখ; ওদিনই গৃহপ্রবেশ করব ঠিক করেছি।' বাদু উত্তর দেয়।

মা বলে, 'পুজোর সরঞ্জাম তো তাহলে ঠিক করে রাখতে হয়?'

'ওটা তোমার ব্যাপার। আমি কি জানি।' বাদু কথা শেষ করেই কাজে বেরিয়ে যায়।

হিন্দুস্তানী লোকটার কাছেই প্রথমে আসে। ওকে ভোলেনি বাদু। বিনীত ভঙ্গি করে বলে, 'কেমন আছ কাকা?'

'বহুত খুব। তু এতনা দুবলা হো গয়া কিঁউ রে?'

বাদু হো হো করে হেসে বলে, 'তুমি আমাকে পেয়ার কর তো তাই দুবলা দেখছো। জান কাকা, পরশু আমার নতুন বাড়িতে তোমাকে যেতেই হবে কিন্তু।'

লোকটা সবই জানত। বলল, 'জরুর যাউঙ্গা। তেরা মেহমান হোকে.....'

কথাটা শেষ করতে দিল না বাদু। দুঃখীর মত ভঙ্গি করে বলল, 'মেহমান কেন? বল, আপনা আদমী।'

বড় করে জিব কাটে লোকটা। বলে, 'বিলকুল ভুলি গয়া। মাপ করনা। জরুর আপনা আদমী।' বলেই বাদুর পিঠে সস্নেহে হাত বুলোয়। এরপর ও গেল হিমাদ্রির কাছে। সেখানেও আধ ঘন্টাটাক থেকে দোকানে এল। সেখান থেকে বেরিয়ে নতুন জামাকাপড় কিনল।

গৃহপ্রবেশের দিন বাড়িটা গমগম করতে লাগল লোকের ভিড়ে। সকাল থেকেই সুন্দর সুন্দর গান বাজছিল। লোকজন চলে গেলে পর বাদু একা একটা ঘরে গিয়ে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখল বাদু। কিন্তু কোনটাই ঠিক মনে করতে পারল না।

ঘরে এসে দেখে, বাবা-মা-সতু-সুমি সোফায় বসে গল্প করছে। সেন্টার টেবিলের ওপর খালি চায়ের পেয়ালা নজরে গেল।

ওকে দেখে মা বলল, 'মুখ হাত ধুয়ে আয় তোর জন্য চা করি।'

সুমি বাদুর গা ঘেঁষে বলল, 'দাদা আমাকে শালোয়ার কামিজ কিনে দেবে?'

সতুও সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আমার জিনস্‌্রে প্যান্ট।'

বাদু বলল, 'সব হবে। আগে মা-র জন্য একটা মটকার শাড়ি কিনে দি। পুজো আর্চার সময় মটকার শাড়ি না হলে ঠিক মানায় না।'

মা বলল, 'কতদিনের শখ।' একটু সময় চুপ করে থেকে বলল, 'সকলের সব কিছু হচ্ছে, তোর বাবার জন্য কিছু হবে না?'

'এনেছি। দামী লাইটার আর সিগারেট কেস।'

বাবা হাত বাড়িয়ে বলল, 'ভাল সিগারেটও আনিস তাহলে?'

বাদু বলল, 'কোনটার কী দাম, আমি তো জানি না। টাকা দেব, কিনে নিও।'

তিনদিন বাদু ঘর থেকেই বেরুল না। গৃহপ্রবেশের তিনদিন পর বাদু চা খেয়ে নাইলনের থলে হাতে করে বাজারমুখো হল। একদিনের কথা মনে পড়ে গেল ওর, যখন টিউশনি করত। ঘুম থেকে উঠতেই কানে গেল মা ছোট বোন সুমিকে তিরিক্ষি ভাষায় গাল দিচ্ছে। বাবাকে নির্বিকার ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখেছিল। ধীর গলায় বলেছিল, 'থলেটা দাও, আজ আমি বাজার যাব।'

মা বলেছিল, 'একদিন বাজার করে সারা মাস তো হাত পাতবি।'

বাদু উত্তর দিয়েছিল, 'মা-বাবার কাছে কোন ছেলে হাত পাতে না বল?'

একটা চাপা ব্যথা বুকের ভেতর জমাট বেঁধে রয়েছে টের পেলেও বাদু সেটাকে তত আমল দিল না। অনেককাল পর বাদু বাজারে এল। আজ অতীত বড় বেশি মজা করতে শুরু করল যেন

ওর সঙ্গে। পাঁচ-ছ'টাকার বেশি বাজার করার ক্ষমতা ছিল না তখন। মা-ই বলে দিত কী কী আনতে হবে। একদিন বড় বড় গলদা চিংড়ি উঠেছিল বাজারে। দাম জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি ওর। পাড়ার মুকুল মিত্তির পঞ্চাশ টাকা দাম শুনে এক কেজি কিনেছিল নির্বিকার ভঙ্গিতে। মুকুল মিত্তিরের চেহারাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিল সেদিন। বড় করে শ্বাস ফেলে পকেটে হাত রাখল আজ। অনেক টাকার স্পর্শ মোটেই বিচলিত করল না ওকে। বেশ বড় সাইজের গোটা একটা রুই মাছ কিনে ফেলল। সঙ্গে একডজন ডিমও নিল। পেঁয়াজ-আদাও নিতে ভুলল না। টুকটাক বাজার সেরে ঘেমো শরীরে বাড়ি এল বাদু। মুগ্ধ বিস্ময়ে মাছ নেড়ে চেড়ে দেখল মা। মা বেশ জোর গলায় বলল, 'দেখে যাও বাদুর কাণ্ড।'

এক এক করে বাবা-সুমিরা এসে দাঁড়াল।

বাবা বলল, 'এত মাছ কী হবে রে?'

মা-ও বলল, 'তা তো ঠিকই। আবার ডিম আনতে গেলি কেন?'

সতু বলল, 'আজকের মেনু হচ্ছে মসুরির ডাল, মাছ ভাজা আর ডিমের ডালনা। বাকি সব ফ্রিজে রেখে দাও।'

মা মাছ কাটতে বসে কিছুতেই বড় করে পিস করতে পারছিল না।

তা দেখে সুমি হেসে বলে, 'দেখ দাদা মা'র কাণ্ড। কত টুকুন টুকুন করে পিস করছে।'

বাদু মৃদু ধমক দিয়ে বলল, 'তাতে তোর কী? মা যা ভাল বোঝে করুক না।'

সুমি কথা বাড়াল না।

বাদু বলল, 'ভাবছি একটু কাজ সেরে আসব। একটার মধ্যেই ফিরবো। দেরী হলে আমার জন্য বসে থেক না।'

বাবা বলল, 'সে কি হয়। তুই কাজ সেরে আয়, একসঙ্গে খাব।'

বাদু সম্মতি জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। কাজ না ছাই। কী যে হয়েছে ওর কে জানে। হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছাল যশোর রোডে। রাস্তার দু'পাশে অনেক গাছ আর তাতে নানান ধরনের পাখি। গাছের পাতা হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। ডানপাশে বিস্তীর্ণ মাঠ। ফসল কাটা হয়ে গেছে। বড় রুখু দেখাচ্ছে মাঠগুলো। ও দেখল, অসংখ্য পাখি খুঁটে খুঁটে খাবার খাচ্ছে সে সব মাঠ থেকে। বিচিত্র এক ধরনের সুখ অনুভব করে বাদু। এক ঘন্টা টানা হেঁটে ক্লান্ত বোধ করল। সুনসান ফাঁকা রাস্তা, মাঝে মাঝে ঝড়ের বেগে বাস আর প্রাইভেট গাড়ির আনাগোনা চলছে। ঘড়িতে সময় দেখে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে সামনের দিকে ফের হাঁটা শুরু করল। হৃদয়পুর পার হয়ে বারাসতের দিকে কিছুটা এগোতেই মনে হল আর নয়। বেলা বাড়ছে মা-র রান্নাও শেষ। ও না যাওয়া পর্যন্ত সকলে অপেক্ষা করে থাকবে এটা ভেবে ফিরতি একটা বাসে উঠে পড়ল। বাড়ি এসে যখন পৌঁছুল তখন বারোটার কাঁটা পার হয়ে গেছে। সামান্য সময় জিরিয়ে নিয়ে স্নান করতে গেল বাদু।

স্টেনলেস স্টীলের থালার ওপর সাদা ধবধবে ভাত। তা থেকে অপূর্ব সুন্দর গন্ধ বেরুচ্ছিল। মা ডাইনিং টেবিলের ওপর সব সাজিয়ে রেখেছে।

ভাগে ভাগে ডাল, মাছভাজা আর ডিমের ডালনা সাজিয়ে রাখতে রাখতে মা বলল, 'কতদিন

পর তোরা একসঙ্গে বসে খাচ্ছিস।'

সতু বলল, 'দাদার কি আর একসঙ্গে বসে খাওয়ার সময় আছে।'

বাবা বলল, 'কাজের লোকেদের নাওয়া-খাওয়ার সময়ই থাকে না।'

বাদু লক্ষ করল, সকলেরই ডাল আর মাছভাজা খাওয়া শেষ হয়েছে। ভাত ভেঙে এবার ডিমের ডালনা ভেঙে নিল পাতে। বাদু তীক্ষ্ণ চোখে নজর করছিল সব। ডিম ভেঙে সতু বা সুমি কুসুম বের করে থালার একপাশে রাখল না। বুকের মাঝখানটা কেমন যেন করে উঠল বাদুর। মনে পড়ল, ছেলেবেলায় ডিম হলে ভাগ পড়তো আধখানা করে। আর তাতেই ওরা দু'জনে খুশিতে থৈ থৈ করত। মাখা ভাত আলু আর ডিমের সাদা অংশ দিয়েই পেট ভরে খেত। আধখানা কুসুম কিছুতেই একসঙ্গে খেতে পারত না। খাওয়া শেষে কুসুম চেটে চেটে খেত। তা দেখে একদিন বাদু বলেছিল, 'এরকম করে কি কেউ ডিম খায়!'

শুনে মা বলেছিল, 'ওদের যেমন খুশি খাক না।' কিন্তু আজ সেরকম কোন আচরণই করল না ওরা।

কী মনে করে বাদু বলল, 'মা, তুমি রান্না একদম ভুলে গেছ। কলকাতার বাড়িতে তোমার রান্নার স্বাদই ছিল আলাদা।'

মা করুণ মুখ করে বলে, 'কেন ভাল হয়নি, সবই তো দিয়েছি। কেন যে খারাপ হল?'

বাদু ইচ্ছে করেই ডিমের কুসুম চাটতে লাগল। তা দেখে সুমি আর সতু হেসে বাঁচে না।

সমু বলে, 'ছিঃ দাদা! ওভাবে কি কেউ ডিম খায়?'

বাদু সামান্য হেসে বলল, 'জান মা, ছেলেবেলায় আধখানা ডিমের স্বাদই ছিল আলাদা। এখন গোটা ডিম খাচ্ছি তেমনটা লাগছে না কেন? একটু থেমে ফের বলল, আগে যেমন ডিম কেটে রান্না করতে, এবার থেকে তাই করো তো?'

ওরা কে কী বুঝল কে জানে। কথা না বাড়িয়ে খাওয়া শেষ করে একে একে উঠে গেল। শুধু বাদু চুপচাপ বসে রইল একা।

ওই দিনটাকে এত সযত্নে মনের গোপন কৌটোয় লুকিয়ে রেখেছিল কিভাবে বাদু এটা ভেবে আশ্চর্য না হয়ে পারল না। কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ও ধীর শান্ত পায়ে মুখ ধোওয়ার জন্য বেসিনমুখো হল।

জ্বালা

দু' মাস আগেও বিন্দুমাত্র ধারণা করতে পারে নি শৌভিক যে, এমন অসহায়ভাবে সে বিছানায় শুয়ে থাকবে। বিশেষ ক'রে স্যানেটরিয়ামের স্প্রিং আঁটা একটা খাট যে তাকে নিতে হবে, এ তার কল্পনারও বাইরে ছিল। অবশ্য বেশ কিছুদিন আগে থেকেই টের পাচ্ছিল শৌভিক যে তার শরীরে কিছু একটার ঘাটতি পড়েছে। নইলে সন্ধ্যে হওযার সঙ্গে সঙ্গে এত অবসাদ ও ক্লান্তি ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলে কেন! সন্ধ্যে হলেই কীরকম এক জাতীয় ঝিমধরা ভাব ওকে ভীষণ ঘুম পাইয়ে দিত। বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে থাকাকালীন ওর রগের শির ছটফট করে উঠত; গা গুলোন ভাব মনটাকে বিষিয়ে দিত। একদিন ও আড্ডার ফাঁকে উঠে মোড়ের মাথার শীতল ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে জ্বর হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করেছিল। ডাক্তারের চেম্বারে সরাসরি আসার কোনরকম অসুবিধা ছিল না তার। কেননা, শীতল ডাক্তারের ছেলে ওর বন্ধু। অজয়ের বাবা নাড়ি টিপে যা বলেছিলেন তাতে ক'রে ওর দুশ্চিন্তার কোনই কারণ ছিল না। ডাক্তার সিজন চেঞ্জের কথা বলে অবশ্য সতর্ক করে বলেছিলেন যে, ওর পক্ষে এই সময় ঠান্ডা-টান্ডা না লাগানই ভাল। শৌভিককে চেম্বার থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে অজয়ের বাবা কি মনে করে স্যাম্পেল ফাইল থেকে বিনি পয়সায় দুটো ট্যাবলেট দিয়ে খুব উদার ও প্রসন্ন দৃষ্টিতে হাসছিলেন। ওঁর ও ধরণের হাসির অর্থটা যে সে একেবারে ধরতে না পেরেছে তা নয়। শৌভিক ভাল করেই জানতো, কলকাতার ডাক্তাররা স্যাম্পেল ফাইল যা রুগীদের বিনি পয়সায় দেবার কথা, তা বেচে দু' পয়সা কামায়। ট্যাবলেট দুটো পকেটে পুরে ও যখন রাস্তায় নেমে এসেছে, তখন অজয়ের কথাগুলো মনে পড়তেই আপন মনেই ফিকফিক করে হেসেছিল শৌভিক। অজয় মাঝে মধ্যেই তার বাবার বিরুদ্ধে কথা বলতো। জীবনে যে মানুষটা ডাক্তার হয়ে সবচেয়ে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত রইল; যে কখনও পরের উপকারে বা সাহায্যে লাগল না। দুর্নীতি টুর্নীতি ইত্যাদি বিষয়ে যখন কথা উঠতো তখন অজয় টেবিল চাপড়ে নিজের বাবার বিরুদ্ধে গড়গড় করে নানারকমের মন্তব্য করতো। বলতো, 'আমার বাবা ভুল পথে চলে এসেছে; হওযা উচিত ছিল কসাই কিংবা সুদখোর; তা না হয়ে, হয়ে গেল ডাক্তার! আরে ছ্যাঃ, ছ্যাঃ!'

তখন শৌভিকরা সহাস্যে বলতো, 'তা হলে তোর প্রেস্টিজটা কী খুব বাড়ত?'

সে কথা কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অজয় বিকৃত করতো মুখ, চোখ দুটোকে কুঁচকে বলতো, 'তবু তাদের বিশেষ একটা চরিত্রকে বোঝা যায়। আর বাবার কাছে যারা আসে তারা তো ঠকে।' কথা শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতো অজয়। বলতো, 'জানিস এতে আমার যে কী লজ্জা, কী দুঃখ

তা তোরা বুঝবি না।'

অজয়ের বাবা কেন যে অকারণে শৌভিককে স্যাম্পেল ফাইল থেকে দুটো ট্যাবলেট অমনি দিয়েছিলেন, তার অর্থ ও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। অবশ্য ওদুটো ট্যাবলেট খেয়ে তার যে কোন উপকার হয়েছে, এমন কথা সে বড় মুখ করে বলতে পারবে না। কেননা, ডাক্তার হিসেবে শীতল ডাক্তাবের নাড়ি টিপে জ্বর জ্বাবি পবীক্ষা কবাটাই একমাত্র ব্যাপার ছিল না, অন্তত ওর বুকে স্টেথো লাগিয়ে বুকটা ভাল করে পরীক্ষা করা উচিত ছিল। আর সে সময় শীতল ডাক্তার যদি কোন খারাপ কিছু ধরতে পারতেন, তা হলে সেই দু' মাস আগে সে নিজে থেকেই সতর্ক হতে পারত। অন্তত সতর্ক হওয়ার চেষ্টা করত। সন্ধ্যের সময় জ্বর-জ্বারি এলে সে নিজে থেকেই ডাক্তারি করতো না। এখন এই স্যানেটরিয়ামের স্প্রিং আঁটা খাটে শুয়ে এ সব কথা ভাবতে পারে, কিন্তু আসলে সেই সময় যদি শীতল ডাক্তার ওর বুকে কোন দোষ পেতেনই তবে কি সত্যি সত্যি সে বাড়িতে বাবা-মাকে, বাড়ির লোকদের সে বিষয়ে কিছু বলতে পারত, না, বললেই তারা চট করে একটা ব্যবস্থা কবতে পারতো?

শৌভিক একবাব পুরোপুরি সব ব্যাপারটা ভেবে নিল। এবং পরক্ষণেই দেখতে পেল, খুব স্পষ্ট বুঝতেও পারল যে, বাবা-মাকে সে কোন সময়ই তার বিশেষ রোগের কথা বলতে পারত না।

বাবা-মাব মুখ ঠিক এই সময় স্পষ্ট ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে। তার বাবা ব্রজনাথ রায় বিলিতি এক কোম্পানীতে নিজের বাহাদুরীতে টিকে রয়েছেন। আর তাঁর বাবা অর্থাৎ শৌভিকের ঠাকুর্দা ইংরেজ সরকাবের দেওয়া রায়বাহাদুর খেতাব নিয়ে দিব্যি জীবনটা কাটিয়ে গিয়েছিলেন। রায় বাহাদুরের বংশে জন্মে আর কিছু পাক আব নাই পাক, শৌভিক ভাবল, বর্তমানে আধা অভিজাত বংশের এক মামার দৌলতে সে এ যাত্রা বেঁচে যাবে। মামা, তারক সান্যাল নেহাতই তার মায়ের আপন সহোদর ভাই, যে কিনা তার চিঠি পেয়ে হাসতে হাসতে এসে হাজির হয়ে গিয়েছিলেন কিছু না জেনেই। শৌভিকের মা ভাইকে দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'হঠাৎ কী খবর রে তারু?'

রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুঝতে মুঝতে মামা উত্তর দিয়েছিলেন, 'সে কিরে? শৌভিক চিঠি লিখেছে, জানিস না?'

'ওমা!' যেন আকাশ থেকে পড়েন মা। চোখ দুটোকে বড় বড় করে বলেছিলেন, 'ও আবার কাউকে চিঠি লেখে নাকি? বলেই মামাকে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে চিলে কোঠার ঘরে চলে আসেন ওঁরা।

পায়ের শব্দে শৌভিক উঠে বসে। ধীরে ধীরে সব কথা মামাকে বললে পর তারক সান্যাল রুমাল দিয়ে নাক ঢেকে সান্ত্বনা দেবার সুরে বলেছিলেন, 'ধুস, এখন আর কি কেউ এ রোগে মরে? ভেবো না দিদি, ওকে সরকারী কোন হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে দেব।'

মামাকে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে কথা বলতে দেখে শৌভিকের সে সময় খুব হাসি পাচ্ছিল। অনেক কষ্টে হাসি চেপে বসেছিল। হেলথ ডিপার্টমেন্টের মাঝারি অফিসার তারক সান্যালের মেজাজ প্রায় সময়ই খুশীর মৌতাতে ভেজা থাকে, এটা জানতো সে।

পরে আরও বেশি নিশ্চিন্ত করার উদ্দেশ্যেই বলেছিলেন মামা, 'গোটা কয়েক স্ট্রেপটোমাইসিন আর ভাল খাওয়া পড়লে ভাগ্নে আমার কলির কেষ্ট হয়ে উঠবে, দেখো? দুদিনেই মুটিয়ে যাবে, তখন আর ওকে চিনতেই পারবে না কেউ। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে কব্জি ঘড়িতে ঘন ঘন চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন মামা। হঠাৎ কী মনে করে আবহাওয়াটাকে হালকা করার জন্যই বলেছিলেন, 'বাঁধালি, বাঁধালি ক্যানসার বাধাতে পারলি নি, বংশের মর্যাদা থাকত?'

সে কথা শুনে শৌভিকের মা হেসে বলেছিলেন, 'তোর এতগুলো বয়স হলো তারু, রোগ-শোক নিয়ে ঠাট্টা করা এখনও ছাড়লি নি।'

হে হে করে হেসে জবাব দিয়েছিলেন মামা, 'দিদি বংশধারা বলে তো একটা কথা আছে।' বলেই হাত তুলে নির্ভাবনার ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, 'ভাবিস নি, আমি দু'একদিনের মধ্যে মিনিস্টারকে ধরে একটা ভাল ব্যবস্থা করে দেব। চলি,' বলেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন মামা।

এরপর শৌভিক লক্ষ করেছে, মামার বাড়ির কেউ-না-কেউ যেখানে মাসে দু' তিনবার করে আসতো, এখন তাদের আসা গেল বন্ধ হয়ে। শৌভিক এই মুহূর্তে ভাবল, এ নিয়ে মা-বাবা ওদের দু' চারটে কথা শুনিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তারক সান্যাল অত কাঁচা কাজের মানুষ নন, মাসখানেকের মধ্যেই শৌভিক ডিগ্রি স্যানেটরিয়ামে ভর্তির চিঠি পেয়ে গেল। ফলে মামার প্রতি কৃতজ্ঞতায় সকলেই যেন কীরকম চুপসে যেতে লাগল।

পিতার বাহাদুরীতে শৌভিকের জন্ম হয়েছে বটে, কিন্তু রায় বাহাদুর হরেন্দ্রনাথ রায় নিজের কৃতিত্বে এই কলকাতার বুকে তিনতলা একখানা বাড়ি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যা তাঁর সাত ছেলের মধ্যে ভাগ হতে হতে ব্রজনাথ রায় অর্থাৎ শৌভিকের বাবার ভাগে এসে দাঁড়ায় আড়াইখানা ঘরে। ওই আড়াইখানা ঘরে শৌভিক আর তার চার বোন জন্মেছে, বড় হয়েছে, অন্তত দৈহিক। বিয়ের সময় শ্বশুরমশাইর দেওয়া ছাপর খাটে ওর বাবা-মা ছেলেমেয়েদের সামনে, কোন লজ্জাসরমের ধার না ঘেঁষে নির্বিকার চিত্তে ঘুমোয়। আর ওর বোনেরা দেখতে দেখতে কেমন পুরুষ্টু মেয়ে হয়ে ওঠে। শৌভিককে আড়ালে রেখে ওরা ফিসির ফিসির করে কথা কয়, গায়ে ঠ্যালা মেরে মেরে হেসে গড়িয়ে পড়ে। ও বোনেদের দিকে দেখেও দেখে না। ওদের দিকে চোখ মেলে তাকাতে কী রকম সঙ্কোচ হয়, লজ্জা হয়। দিনের অধিকাংশটা সময়ই ওরা সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের কেচ্ছা ঘাঁটে, কোন ছবি কোন স্টুডিওতে তোলা হচ্ছে, কোন নায়ক-নায়িকা কাজ করছে, এ সব ওদের কণ্ঠস্থ। সে সব আলোচনা করতে কবতে ওবা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সে সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় কাটায়, মানুষজন দেখে। শৌভিক দেখেছে, কোন কোন সময় ওদের আলোচনার মধ্যে মা-ও যোগ দেয়। একদিন তো শৌভিক মায়ের মুখের ভাষা শুনে চমকে গিয়েছিল। মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল তার মুহূর্তে। প্রায় ছিটকে ঘর থেকে বেবিয়ে টাল সামলাতে সামলাতে কোন রকমে ধাতস্থ হয়েছিল।

আর তার বাবা ব্রজনাথ রায়, রায়বাহাদুরের ছেলে, ঠাঁট বজায় রাখতে চেষ্টা করেন সব সময়। মনে হয়, নিজের সঙ্গে প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি করেন। বাবার সেই অসম্ভব ব্যাপার স্যাপার নজরে পড়তেই শৌভিকের কেমন যেন বাবাকে ক্লাউন বলে মনে হয়। বাবার গম্ভীর মুখ গিলে করা পাঞ্জাবির

নিচে কী করুণ চুপসে যাওয়া মুখটাই নজরে পড়ে তার। ম্যাক্স-ফ্যাক্টর মেখে এককালের নামী অভিনেতারা যেমন করে নিজেদের মুখের আঁকিবুকি, বয়সের ছাপ লুকোবার চেষ্টা করে, বাবাও ঠিক তেমনি যেন অভ্যেস করেন। ছুটির দিনগুলোতে সকাল সকাল স্নান সারেন, চুনোট করা ধুতি ও গিলেকরা পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে পায়ে শৌখিন চটি গলিয়ে বড় রাস্তা আর বাড়ি এই করে বেড়ান। যেন কত কাজ; ভীষণ কাজের মানুষ তিনি। চোখে মুখে স্বচ্ছলতার স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে কত সহজভাবে অভিনয় করেন পাড়ার মানুষদের সামনে, দোকানদারদের কাছে । অথচ, শৌভিক বোঝে সব ব্যাপারটা। না বোঝার মত কোন কিছুই নেই। পাড়ার মশলাওয়ালা, তেলওয়ালা ঘুঘু ব্যবসায়ী। ওদের লাল লম্বা খাতায় ব্রজনাথ রায়ের নাম মোটা হরফে লেখা থাকে। পুরোন বছরের ধার সব শোধ হল না, নতুন বছরের নতুন খাতার সময় আদ্দির পাঞ্জাবির পকেটে করকরে কয়েকখানা এক টাকার নোট রেখে পয়লা বোশেখের নেমন্তন্ন খেতে যান! ভাঁজ করা চেয়ার, যা দোকানদারেরা ডেকরেটারদের কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে দোকানের সামনে বসিয়ে দেয় তারই একটাতে বসে ভীষণ রকমের একখানা মুখ করে কোকাকোলার বোতলে স্ট্র লাগিয়ে দু' চুমুক বড় জোর তিন চুমুক টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ান এবং কলাপাতার ঠোঙায় মোড়া জর্দা পান মুখে দিয়ে বুক পকেট থেকে ওই দেখানো টাকাগুলো থেকে কয়েকটা টাকা বের করে দিয়ে দোকান থেকে সরে পড়েন। শৌভিকের এক বন্ধু একদিন বলেছিল, 'যাই বলিস, অ্যারিস্টোক্রাটদের চালচলন ঢং-ঢাংই আলাদা। মাইরি দ্যাখ, আমার বাবাব কত টাকা, কিন্তু তোর বাবার কাছে আমার বাবা ছেলেমানুষ।' শৌভিক সে সব কথায় খুব বেশি গুরুত্ব দেয় না; অন্যমনস্কের ভান করে ওই সব কিন্তু এড়িয়ে যায়।

একদিনের কথা মনে পড়ে শৌভিকের। শীতকালের রাত্রি। সাতটা টাতটা হবে। বড় মুদিখানাটার সামনে দিয়ে যেতে যেতে ও হঠাৎ চমকে গিয়েছিল বাবার গলা শুনতে পেয়ে।

বাবা বলছিলেন, 'আর ছটা মাস আমাকে সময় দিন। জানেন তো, আমার ছেলে শৌভিক, দেখেছেন তো তাকে, এবার আই. এ এস পরীক্ষায় ফার্স্ট হল, জানেন তো অল ইন্ডিয়া সার্ভিস, কিন্তু ছেলে আমার কিছুতেই দেশ ছেড়ে যেতে চায় নি। কত বলছি বিরাট ভারতবর্ষটাই তো তোর দেশ, যেখানেই যাবি, সেখানেই তুই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবি। কিন্তু ....

একটু লুকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল শৌভিক। আড়চোখে দেখেছিল, দোকানের মালিক সুরেন মুদির চোখ জোড়ায় বড় বেশি উজ্জ্বলতা।

সুরেন মুদি প্রশ্ন করে, 'ছেলেকে বোঝান। দেখুন স্যার, আপনারা বড় বংশের লোক। আরে বাবা, দেশ দেশ করেই দেশটা উচ্ছন্নে গেল। আজকালকার দিনের ছেলেদের বোঝাও দায়...'

বাবা এতটুকু ভোলবার পাত্র নন। তিনি গম্ভীর মুখ করে উত্তর দেন, 'আপনার মধ্যে প্যাট্রিয়টিজম নেই বলে ও কথা বলতেপারছেন ?' সুরেন মুদি হতাশ চোখে তাকিয়ে দেখেন তাঁকে।

ব্রজনাথ রায় লোকটাকে বেশি ভাববার সুযোগ দেন না। বলেন, 'ছেলে আমার সোনার টুকরো। দেশ ও জাতির একটা রত্ন। আমি বাবা, ছেলের প্রশংসা বাইরে কখনও করি না।

শৌভিক সরে এসেছিল। ও জানে, এই রায়বাহাদুরের বংশে আগামী চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কেউ

কখনও আই. এ. এস পরীক্ষায় বসবে না। কেননা বসবার সে রকমের কোন যোগ্যতাই থাকবে না। আর সে? বি. এ.-টা কোন রকমে পাশ করে বাবা ও মা'র আশাকে আরও তীক্ষ্ণ তীব্র করে তুলেছে। কী হতো, যদি সে এ পরীক্ষার জাবর না কেটে দালালি-ফালালি কোন একটা ব্যাপারে যোগ্যতা অর্জন করতো, তা হলে, কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত! গঙ্গাস্নান করলে যেমন পুণ্য হয়, বি-এ-র গণ্ডি পার হলেই যেন মানুষ হওয়া যায়, এরকম একটা ধারণা সমাজে চলে আসছে অনেকদিন ধরে। অথচ, সেই সকালবেলার বাবার কথাগুলো মুহূর্তে মনে পড়ে গেল তার। বাবাকে বাবা বলে মনে হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল এমন একখানা অশ্লীল চোয়াড়ে মুখ থেকে পচা গলা নোংরাই বেরিয়ে আসতে পারে। অথচ সেই লোকই সুরেন মুদির কাছে তার সম্পর্কে কিনা বলেছে, সোনার টুকরো! হাসি পেয়েছিল শৌভিকের। সে রাতেই ও তার বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বাবাকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছিল। সকালবেলার বাসি খবরের কাগজটা মেজকাকার ঘর থেকে নিয়ে এসে খুব মন দিয়ে পড়ছিলেন। শৌভিককে অমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলেছিলেন, 'কিছু বলবে?'

শৌভিক ম্লান হেসে কিছু একটা বলা উচিত মনে করে জিজ্ঞেস করেছিল, 'খবরের কাগজ পড়ে কী হয়?'

'কিচ্ছু না। তবে পড়লে সময় কাটে।' মুখ না তুলেই বলেছিলেন তিনি।

'হ্যাঁ, তা কাটে।' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্ন করেছিল, 'আমার কিছু হল? সাহেবকে বলেছিলে?'

শৌভিককে একবার মুখ তুলে দেখতে ইচ্ছাও হয় নি তাঁর। খবরের কাগজের পাতায় চোখ রেখে উত্তর দিয়েছিলেন, ওরা তো আমার শালা জামাইবাবু নয় যে, আমার গুণধরের জন্য ওদের বুক টস্‌টস্‌ করবে?'

ভীষণ রকমের একটা অপমানের আঁচ ওকে সেই সময় উত্তেজিত করে তুলেছিল, 'তবে সুরেন মুদির কাছে আমার সম্পর্কে ওসব না বললেই পারতে? সোনার টুকরো! লজ্জা করে না ওই সব কথা উচ্চারণ করতে?'

ব্রজনাথ এবার মাথা তুলে দেখেছিলেন ওকে। ওর কথায় একটুও উত্তেজিত হননি। মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'সব বাপ-মায়ের কাছেই তাদের ছেলেমেয়েরা জগতের সেরা। সে বোঝবার মত জ্ঞান বুদ্ধি হবে না কোনদিন। যাও, হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড় গে।'

স্প্রিং আঁটা খাটে পাশ ফিরে শুল শৌভিক। এক জাতীয় অস্বস্তিতে বুক গলা ভারী হয়ে উঠল। কী মনে করে বাইরের খোলা জানালার দিকে চেয়ে রইল। কৃষ্ণচূড়া গাছটায় অসংখ্য লাল ফুল ছেয়ে আছে। নিজের বুকের ভেতরটায়ও কী রকম আগুন জ্বলে উঠল। বুক গলা শুকিয়ে গেছে বলে মনে হলে সে খাট থেকে উঠে একটুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। চোখে পড়ল, আঠারো নম্বর বেডের মানুষটা মনোযোগ দিয়ে কী যেন পড়ছেন। ধীর পায়ে প্রায় নিঃশব্দে ও আঠারো নম্বরের দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল, 'কী পড়ছেন?'

চোখের ইশারায় শৌভিককে পাশে বসতে বলে মাঝবয়সী ভদ্রলোক সরাসরি উত্তর দিলেন, 'প্রেমপত্র'।

টুল টেনে বসল শৌভিক। বেশ মজা পেয়ে গেল সে। বলল, 'তা বেশ। এখনও প্রেম-ট্রেম আছে তা হলে?'

চিঠিটাকে বালিশের নিচে রেখে ভদ্রলোক বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর সুন্দর করে বললেন, 'ভাগ্যিস, এ রোগটা বাঁধিয়েছিল, তাই প্রেম কী বুঝতে পারছি।' কিছুক্ষণের জন্য থেমে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কেন, আপনাদের তো কাঁচা বয়েস। প্রেমে অরুচি এল কেন?'

শৌভিক কোন উত্তর দেয় না। সুন্দর করে হাসবার চেষ্টা করে।

'আরে ভাই, আপনার কাছে বলতে লজ্জা নেই, কেননা, উই আর ইন দি সেম বোট ব্রাদার', বলেই কী মনে করে হাসলেন। পরে নিজে থেকেই বলতে থাকেন, 'বিয়ে যদ্দিন না করেছিলাম, তদ্দিন হপ্তায় তিনখানা করে চিঠি পেতাম।' বলতে বলতে থেমে যান। ভদ্রলোক যেন অনেক দূর অতীতে ফিরে গেলেন। চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর। ধীর গলায় বলতে থাকেন, 'তারপর পনেরো বছর পর এই চিঠি। প্রেমপত্র।' শৌভিকের মুখের দিকে চেয়ে থেকে করুণ গলায় বলে ওঠেন, 'সে সময় কেবলই হারাবার ভয়, আর এখন যে সব চিঠি আসে, তাতে কেবল কতগুলো ফিরিস্তি, তা ভীষণ বেসুরো লাগে, একটুও অন্য কিছু থাকে না।' কথা শেষে করে জলভরা চোখে তাকিয়ে রইলেন ভদ্রলোক ওর দিকে।

কী করবে শৌভিক কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। পরক্ষণেই নিজের মন ঠিক করে নিয়ে ভদ্রলোককে একটু হালকা করবার জন্য বলে, 'আপনাদের সময় তবু হারাবার ভয ছিল, আব এখন, ও সবের বালাই নেই। আমার ছোট বোনটার, কত আর বয়স হবে, এই ধরুন না আঠাবো, পাড়ার একটা [illegible] ছেলের সঙ্গে মেশে, লেকে যায়, সিনেমায় যায়। ওদের সামনা-সামনি পড়ে গিয়েছিলাম একদিন। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমাকে দেখে ওবা গ্রাহ্যও করল না। সেদিনটা আমাব ভীষণ কষ্টে গেছে। কিছুতেই সহজ হতে পারছিলাম না। অনেক রাতে সেদিন আমি বাড়ি ফিবি। কেন জানেন? ওর সামনে দাঁড়াতে আমারই কী রকম লজ্জা করছিল। খেয়ে দেয়ে, আলো না জ্বেলে শুয়ে পড়তে যাবো ঠিক সেই সময়....' বলেই চুপ করে গেল শৌভিক।

ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে প্রশ্ন কবলেন, 'কী হল তারপর?'

'বোনটা আমাকে ইশারা করে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গেল। সব কিছু আমার কাছে ভীষণ রহস্য ঠেকছিল। অন্ধকারের মধ্যে ওর মুখটা তখন আমি ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলাম না। ফিসফিস করে ও বলেছিল,' জানি তুমি রাজেনকে পছন্দ কর না। কিন্তু আমি যে . '

ওকে বুঝতে একটু কষ্ট হয়নি সে সময় আমার। বলেছিলাম, 'যা এখন ঘুমোগে যা।' ও চলে গেলে পর আমার ভেতরের সব রকমের অহংকার, অভিমান যে কী ভাবে উবে গেল বুঝতেই পারলাম না।'

ভদ্রলোককে উঠে বসতে দেখে শৌভিক বলল, 'মিছিমিছি কষ্ট করছেন কেন, বেশ তো শুয়ে শুয়েই কথা হচ্ছিল।' ওর বাবণ কানে তুললেন না তিনি। হাঁটু মুড়ে বসে বললেন, 'কী হবে ওদেব কথা ভেবে, বলুন না নিজের সম্পর্কে দু'চারটে কথা?'

'কী আব বলবো--' বলেই হাত কচলাতে লাগল শৌভিক। জানেন তো, ও সব ব্যাপাবে একটু

আধটু কপাল না হলে চলে না, আর চাই কিছু পয়সা।

ভদ্রলোক কৌটো খুলে হাতের চেটোতে ভাজা মশলা ঢাললেন। শৌভিকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'নিন। ভাগ্যটাগ্য আমি একদম বিশ্বাস করি না।'

একটু যেন কুঁচকে গেল সে কথায় শৌভিক। বলে, 'জুটেছিল একটা। দিন কয়েক যেতে না যেতেই বিয়ের প্রস্তাব করে বসল। বিয়ের কথায় ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম।'

'কেন? ভয়ের কী আছে? আপনাদের ওই এক দোষ। বিয়ের ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা করলে চলে?' বলেই হাসতে থাকেন ভদ্রলোক।

শৌভিক শুধোয়, 'তার মানে?'

হাসলেন ভদ্রলোক। কী যেন চিন্তা করলেন। পরে আপন মনেই যেন বলতে থাকেন, 'আমাদের ব্যাপারে ও-ই এগিয়েছিল এইট্টি পারসেন্ট। দিন কয়েক যেতে না যেতেই ও-ই বলল, 'এবার বিয়েটা করে ফেলি, কী বল?' পরের সপ্তাহেই রেজিস্ট্রারকে ভুজংভাজং দিয়ে বিয়ে করে স্বামী-স্ত্রী হয়ে ঘর করতে লেগে গেলাম।'

'চাকরি করতেন?'

'না। পরে ঘুরে ফিরে একে-ওকে ধরে একটা চাকরি জোগাড় করে ফেললাম।'

'যদ্দিন না পেয়েছেন, তদ্দিন ক্যামন করে চলছিল?'

ভদ্রলোক শৌভিকের দিকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। পরে ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই। একটুও রোমান্টিক হতে পারেন না?'

শৌভিক স্থির পলক হীন চোখে তাকিয়ে দেখে ভদ্রলোক কেমন যেন ক্লান্ত বোধ করছেন। কিছু না বলে ফের শুয়ে পড়লেন।

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'কেমন? আমার শিভালরিটা কী রকম বুঝলেন?'

'ওকে ঠিক শিভালরি বলে, না বলে—' কথাটা শেষ করল না শৌভিক। [illegible] থেকে উঠে দাঁড়াল। ওকে উঠতে দেখে দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন করলেন না ভদ্রলোক। দু' পা এগিয়েছে শৌভিক ঠিক সেই সময় ও শুনতে পেল, 'যা বললাম, তার ঠিক উল্টো কল্পনা করে নিতে কী কষ্ট হবে?' পেছন ফিরে দেখল শৌভিক, ভদ্রলোকের মুখটা ভীষণ কঠিন। ওই রকমের একটা রুক্ষ কঠোর মুখ দেখতে চায় নি সে। বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল সে সময়। ফিরে এসে টুলটাব ওপর বসল। ভদ্রলোক ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, 'বর্তমানে শ্বশুরবাড়িতেই রয়েছে আমার ছেলেমেয়ে বউ, অথচ, এমনটা হোক তা আমি জীবনে চাই নি।'

ওঁর কথা শেষে হতেই শৌভিক উঠে দাঁড়াল। ওখান থেকে ফিরে এসে এবার আর বসলো না। শুয়ে পড়ল। কী রকম যেন ক্লান্ত লাগছিল তার সে সময়। বুঝল, দীর্ঘ সময় সে ঘুরে বেড়িয়েছে, ঠায় বসে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলেছে। এই সময়ের মধ্যে সে এতটা সময় এমনিভাবে কাটায়নি। শুয়ে শুয়ে সে ভাবল, মিছিমিছি ভদ্রলোককে সে নিজের কথা বলতে গিয়ে মিথ্যে কতগুলো কথা বলে এল। কেন যে ওই সব মিথ্যে কথাগুলো বললো সে, তার সঠিক কারণ একটুও খুঁজে পেল না। আসলে নিজেকে নিয়ে যখনই চিন্তা করে শৌভিক তখনই দেখে, সে সব সময় নিজেকে বড়

করে জাহির করে। এটা ওর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। অথচ, এ তো একেবারেই বানানো ব্যাপার। কেয়া কখনই তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় নি বরং উল্টোটা, সেই দিতে চেয়েছিল। আর এও তো ঠিক নয়, কেয়া তাকে কখনও ভালবাসার কথা বলেছিল। কিন্তু সে কথা জানাতে গেলে মনে যতটুকু সাহস থাকা দরকার তার ছিটেফোঁটাও তার মধ্যে ছিল না। আবার এও ঠিক, বাস্তবকে অস্বীকাব করে চলার মত কোন ক্ষমতা সে তার বংশের কারো কাছ থেকে পায় নি। এসব ভাবতে গিয়ে মাথা ভীষণ ভারী হয়ে যায়। অকারণে মিথ্যে বলার দরুন দারুণ এক অনুশোচনা শৌভিককে অসম্ভব দুর্বল করে দিতে থাকে।

ভদ্রলোকের ব্যাপারটাকে ভাল করে ভাববার চেষ্টা করল শৌভিক। ওঁর ইচ্ছে ছিল নিজেকে যথাসম্ভব গোপন রাখা। এর সঙ্গে আরও একটা বিশেষ ব্যাপার যে না ছিল তা নয়; ভদ্রলোক চেয়েছিলেন শৌভিককে একটু খুশীর দোলায় চাপানো। কিন্তু তা তো করতে পারলেনই না, উপরন্তু নিজেকে কষ্ট দিলেন। ঠিক সেই ফাঁকে শৌভিক নিজের দিকে ফিরে তাকাল। দেখল, সেখানে সেও অনেক কিছুই কষ্ট করে গোপন রাখে; কেননা, না রাখলে চলে না। অসুস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত শৌভিক যে কতদিন গড়ের মাঠের সস্তা মেয়েছেলে ভাড়া করে সময় কাটিয়েছে সে ছাড়া আর কেউই জানে না। অবশ্য অজয় ওকে বার কয়েক বেশ্যা পল্লীতে নিয়ে গিয়েছিল। অজয়ের সঙ্গে প্রথম ওসব জায়গায় যাওয়ার আগেও সে বেশ কয়েকবার নারী কী বস্তু তা আস্বাদ করেছিল। কিন্তু অজয়কে সে সব কথা বলে নি বরং এমন ভাব করেছিল যাতে করে অজয় বুঝতে পারে, ও খাঁটি নির্ভেজাল ও পবিত্র। পবিত্র এই শব্দটা নিজের কাছেই কী রকম বেমানান মনে হল।

আজ প্রায় দিন দশেক হল, বাড়ির কোন চিঠি আসে নি। বন্ধুবান্ধবরা সকলেই বলেছিল, স্যানেটরিয়ামে এসে ওর সঙ্গে দেখা করবে, কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ওরা কেউ-ই এল না। কেবল ছোট্ট বোনটা আর মা সপ্তাহে একটি করে চিঠি লিখে যাচ্ছে নিয়মিত। কেন যে মাকে দেখবার জন্য মনটা তার ভীষণ নরম হয়ে এল এই মুহূর্তে। অনেক রাতে মা কি এখনও, সকলে ঘুমিয়ে পড়লে, অল্প ছেঁড়া জামাকাপড়গুলো কাঁপা হাতে রিফু করে, না, শৌভিকের জন্য একলা বারান্দার এক কোণে বসে ভাবে? মাকে সে অমন করে আর কখনও তো মনে করেনি শৌভিক। ভাবল, আজ তার সব কিছুই কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে যেতে বসেছে। একটু পরেই নার্সদের ব্যস্ততায় ঘরে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা যাবে, হেসে হেসে কথা বলবে ওরা। ওই সময়টা ওর বেশ ভাল লাগে। উঁকি মেরে দেখল, আঠারো নম্বরকে দেখা যায় কিনা। কিন্তু দেখা গেল না। ভদ্রলোকের কথাগুলো ওর মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠলো আবার। 'উই আর ইন দি সেম বোট ব্রাদার, উই আর ইন দি.....' ভাবতেই একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস পড়ল শৌভিকের। যেন স্পষ্ট বুঝতে পারল, ভদ্রলোকের নিজের বলতে যারা তারা একবার উঁকি মেরেও জানতে ইচ্ছুক নয় তার সম্পর্কে। হারানো দিনের সব কিছু যেন দল বেঁধে হাজির হতে লাগল এই সময়।

ওর এক বন্ধু নীহার একদিন গম্ভীর মুখ করে হাজির হল শৌভিকের কাছে। 'অমন প্যাঁচার মত মুখ করে আছিস কেন?' শৌভিক জিজ্ঞেস করেছিল। নীহার এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। পরে

ধরা গলায় উত্তর দিয়েছিল, 'সকালবেলাই মেজাজটা বিগড়ে দিয়ে গেল মেজদা। বাবা-মা আমাদের কাছে থাকে, তা যেন অপবাধটা সব আমাদেরই।'

'হোম পলিটিকস্' একটু হালকা করবার ভঙ্গিতে বলেছিল শৌভিক, 'ও সব না কবাই ভাল।'

'তোর আর কি, শালাব রায়বাহাদুরের নাতি, তুই বুঝবি কোত্থেকে?' শৌভিককে একটু খোঁচা মেরেই বলেছিল নীহার।

কথাটা শুনে প্রচণ্ড শব্দে হেসে ফেলেছিল ও। তারপব ওর মুখোমুখি বসে বলেছিল, 'খুব বেঁচে গেছিস নীহার, রায় বাহাদুরেব নাতি হয়ে জন্মাসনি, তোদের তো আমার হিংসে করার কথা।'

'কব না। কিন্তু তা বলে শালার নোংরামি, ছ্যাঃ ছ্যাঃ,' বলেই মুখ বিকৃত করেছিল নীহার।

শৌভিক চুপ করে গিয়ে ঘরেব মধ্যেই ইতস্তত পায়চারি করছিল। দেখে নীহার বলেছে, 'মজাটা দ্যাখ, মেজদা আলাদা হয়ে গেছে নিজেব ইচ্ছেতেই, হাসপাতালে বাবাকে ভর্তি করানো হয়েছে, খবর দেওয়া হল। মেজদা কয়েকটা ফল হাতে নিয়ে কর্তব্য কবে চলে গেলেন। তারপর দ্যাখ, আজ না হয় কাল বাবাকে নিয়ে শ্মশানে যেতেই হবে, কনডিশান খুব খারাপ, আবার খবর পাঠালাম মেজদাকে, না দিয়ে তো উপায় নেই, মেজদারও তো বাবা, কিন্তু কী হল, মেজদা এসে হম্বিতম্বি লাগিয়ে দিলেন। শুনে আব ঠিক বাখতে পাবলাম না নিজেকে। যা মুখে এল শুনিয়ে দিলাম,' কথা শে[illegible] কবে জল চোখে তাকিয়েছিল নীহাব।

শৌভিক ভাবল, 'ঠিক ওই একই ব্যাপার চলছে সব জায়গায়। নিজেব দুর্বলতাকে ঢাকতে গিয়ে নিজেকে আরও বেশি ক[illegible]র প্রকাশ কবা। নীহারেব মেজদাব ব্যাপারেও হয়েছে তাই। সে ভদ্রলোক বিলক্ষণ জানতেন, কর্তব্য, কেবলমাত্র নীহারের বা তাব অন্য ভাইদেব নয়, বাপ-মা যখন—তখন কর্তব্যের ব্যাপারটা তারও রয়েছে। সংসাব থেকে আলাদা হয়ে গেলেই সব কিছু চুকে যায় না। যদি যেত, তা হলে কী হত বলা যায না, আর তা জানেও না শৌভিক। নীহারের মেজদা তাই নিজেব দোষ ঢাকতে গিয়ে নীহারকে ও অন্য ভাইদেব গালাগাল দিয়েছিল। একবারও ভেবে [illegible]নি, সম্পর্কটা বাবা-মা মারা গেলেই চুকে যায না, বংশপরম্পরায় সেটা থেকে যায়। বাবাব মুখটা মনে পড়ল শৌভিকেব। কী না কবতে পারেন তিনি। শৌভিকের সম্পর্কে বাড়িয়ে বলে সুখ পেতে চান কিন্তু পান কি? যদি পেতেন তবে দৃষ্টিটা নিশ্চয়ই অমন ঘোলাটে হত না কিংবা মেজকাকার কাছ থেকে খবরের কাগজ পড়তে নিয়ে এসে তাব ফাঁকে রেসের বই লুকিয়ে ঘোড়ার হিসেব কবতেন না। এসব সময় একবার ও কী শৌভিক, বাবার ভেতরটাকে জানতে চেয়েছে, না দেখতে চেয়েছে? সেও তো চূড়ান্ত স্বার্থপরের মত নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে কিংবা বাবা-মা কোন কর্তব্যই করল না, এ রকম খেদ মনের মধ্যে পুষে রেখেছে। বিশেষ করে সে তো বাবা-মার কাছ থেকে প্রত্যাশাই কবে চলেছে, না পেয়ে ইতরের মত কথা শোনাতেও ছাড়েনি।

এই ভাবনাটাই শৌভিককে একেবারে শূন্যতার একটা গভীর খাদের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলল। ঠিক এই সময় নীহার যদি তাব সামনে থাকত, তা হলে দেখতো নীহারের সঙ্গে তাব মূলত কোন রকমের তফাত নেই। কেননা, অক্ষমতার জ্বালা ওদের দুজনকেই একইভাবে জ্বালাচ্ছে। নীহারেব বাবা হাসপাতালে থাকাব সময় শৌভিক জানে, কী প্রচণ্ড অর্থাভাব ও মানসিক কষ্ট গেছে নীহারেব। সময় নেই, অসময় নেই, হাসপাতালে যাওয়া, দামী দামী ওষুধ কেনা, সে সব একেবারেই পেরে

উঠছিল না সে। তার ওপর কথার ফাইফরমাস তো লেগেই ছিল। বলতেন, 'আর কি, মারাই তো যাবো। তোর মাকে বলিস, একটু কষা মাংস করে দিতে। আর শোন, অফিস ফেরতা তো তোকে বউবাজার হয়ে আসতে হয়; সম্ভব হলে ভীম নাগের দোকান থেকে টাকা দুয়েকের সন্দেশ এনে দিস। নীহারের চোখে জল এসে যেত, বেদনায়, দুঃখে, অভিমানে। সব কিছু ছাপিয়ে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ত নীহার দাদাদের ওপরে। বড়দা বিদেশে; সুতরাং, সাত খুন মাপ। আর মেজদা? সে সময় প্রায়ই নীহার মেজদাকে উদ্দেশ্য করে গালাগাল দিত। শ্রদ্ধা ট্রদ্ধা তো দূরের কথা, মেজদাই তখন শালা হয়ে যেত নীহারের কাছে! ওর মেজদা সংসার থেকে আলাদা হয়ে যাবার মাস আষ্টেক পর এই নীহারই একদিন হাসি হাসি মুখ করে বলেছিল, 'জানিস শৌভিক মেজদাটা লোক খারাপ নয়।'

শৌভিক বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'হঠাৎই তোর মতের পরিবর্তন হল যে বড়?'

উত্তরে বলেছিল নীহার, 'গতকাল জানিস, একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে বাড়িতে। কয়েকদিন ধরে শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। ছুটি নিয়ে ঘরে শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ শুনতে পাই মেজদার গলা। তাই ঘুমের ভান করে শুয়েছিলাম পাশ ফিরে।'

'তারপর?' শৌভিক জিজ্ঞেস করেছিল।

'মার গা ঘেঁষে চুপ করে বসে রইল মেজদা কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ মাকে জড়িয়ে ধবে সে কি কান্না। মা যত মেজদাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে মেজদা ততই কাঁদে। কিছুক্ষণ পর মেজদা বলল, 'এ রকমটা হোক তা আমি চাই নি মা।'

মা মেজদার মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছে, 'আঃ এতে আর দোষ কী! তুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখে থাক, এই তো আমি চাই। যখন শুনি বউমা তোর খুব আদর যত্ন করে, নিজের চিন্তা সে একটুও করেনা; কিসে তোর একটু সুখ হয়, এই যখন ভাবে সব সময়, তখন বুকটা আমার ভরে ওঠে।'

মেজদা যেন মুহূর্তে সব কিছু ভুলে যায়। ছেলেমানুষের মত আবদার করে বলে, 'চলো না মা, দিন কয়েক আমার ওখানে থাকবে।'

মা বলে, 'দূর বোকা! একবেলা আমি না থাকলে ওদের খাওয়াই জুটবে না।'

কী বোঝে জানি না মেজদা। এই যেন প্রথম আমার দিকে চোখ যায় তার। বলে, 'নীহারটা এই অবেলায় ঘুমোচ্ছে। শরীর খারাপ করে নি তো? একটু সাবধানে থাকতে বলো, দিনকাল ভাল না। হঠাৎ রাতে ঘুম ভেঙে গেলে, ওদের সকলের কথা মনে পড়ে। তখন ভীষণ কষ্ট হয়। কথা শেষ করেই ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে মেজদা।'

সেদিন সে সময় আর কোন কথাই জিজ্ঞেস করে নি শৌভিক নীহারকে। অক্ষমতার যে জ্বালা, তাকে ঢাকবার মত মনে কোন জোর পাচ্ছিল না। আসলে নীহার মেজদার ওপর রাগ করতো না, যদি সে এককভাবেই তার বাবার চিকিৎসার যোগান দিয়ে যেতে পারত। যখনই তা পারতো না, তখনই সে অন্য মানুষ হয়ে যেত। আর শৌভিক, সে-ও চায়, বাপ-মা'র দুঃখ কষ্ট দূর করতে, বোনেদের সুন্দর একটা জীবনের মধ্যে নিয়ে আসতে। কিন্তু পারে না। আর পাবে না বলেই

সংসারের সকলের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। অজয় জানে, কেননা, অজয়ের কানে যায়, তার বাবা শীতল ডাক্তারের সাইন বোর্ডে একবার লিখে দিয়েছিল, 'এখানে শীঘ্র মৃত্যুর পথ বাতলে দেওয়া হয়।' কথা কটি প্রেসক্রিপশনে সার্ভড হিয়ার কেয়ারফুলি, তার নিচেই লিখে গিয়েছিল ওরা। দেখে শীতল ডাক্তার রাগ করেনি; নিজের হাতে লেখাগুলো মুছে দিয়েছিলেন। সে সময় অজয় মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছিল। কেউ কেউ অজয়কে দেখে বলেছিল, 'তোমরা এর একটা বিহিত কর।' অজয় তার কোনও উত্তর দিতে পারে নি। বাবাকে শোধরাবার কোন ক্ষমতাই তার হাতের মুঠোয় ছিল না।'

ভীষণ এক ধরনের কষ্ট চাপ বেঁধে উঠল সে সময় শৌভিকের বুকের মাঝে। মনে হচ্ছিল, দুটো লাংগসের ভেতর অজস্র সূঁচ বিঁধে রয়েছে। দম নিতে কষ্ট হল তখন। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন। বহু দিন পর, আবার সেই আগেকার মত, কপালের পাশের শির দুটো ছট্ছট্ করে উঠলে পিপাসায় বুক গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। কাতর গোঙানির মত সুর করে সে অনেক কষ্টে হাতের ইশারায় নার্সকে ডেকে একটু জল চাইল।

নার্স হেসে জানতে চাইল, 'কী কষ্ট হচ্ছে আপনার?'

শৌভিক চট করে উত্তর দিতে পারল না। পাশ ফিরে শুয়ে অনেক কষ্টে জলের গ্লাস শেষ করে নার্সের দিকে চেয়ে হাসবার চেষ্টা করল। বেশ কিছু সময় কাটার পর শৌভিক ধরা গলায় প্রশ্ন করল, 'আজ কত তারিখ?'

নার্স কী বলল তা যেন সঠিক বুঝতে পারল না শৌভিক। তার যেন মনে হতে লাগল, আজ সেই দিন যেদিন অফিসের লোকেরা বাবাকে ফেয়ারওয়েল দেবার জন্য ব্যস্ত। বাবা গম্ভীর মুখে সভার মাঝখানে বসে, ফুলের মালায় বাবার মুখটা ঢেকে যাচ্ছে, বাবা অনেক কষ্টে ঘাড় সোজা রেখে চোখের জল, না অন্য কিছু লুকোবার চেষ্টা করছেন।

নার্স কি বলতে যাবে, ঠিক সেই সময় ওকে বাধা দিয়ে শৌভিক বলে উঠল, 'ঠিক আছে সিস্টার। ঠিক আছে।'

নার্স চলে গেলে পর ও পাশ ফিবে শুয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলো।

মাখনলালের সুখ

সকাল হলেই বাসনার প্রথম কাজ বাড়ির সকলকে ঘুম থেকে টেনে তোলা। দু'টো ছেলেই ন্যাতা-প্যাতা হয়ে শুয়ে থাকে। ওর ডাকে ঘুম চোখেই কুকুর ছানার মত কিউঁ কিউঁ করে। পরে সে গলাতেই যখন মেঘ ডাকে তখন ঘুমের আঠা চোখ থেকে সরে যেতে সময় নেয় না। কেননা, মাকে ওদের বড্ড ভয়। হারু আর বীরু চোখ পিটপিট করে পরস্পরের দিকে তাকায়। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, ওদের বাবা মাখনলাল লিকপিকে চেহারা নিয়ে শুঁটকো মাছের মত বিছানার এককোণে পড়ে আছে।

হারু চোখ রগড়ে বলে, 'বাবাকে তোল না?'

বীরু বলে, 'ওখানে তোমার তম্বি চলবে না।'

কথাগুলো কানে যায় মাখনলালের। চোখ বুজেই বড় করে হাই তুলে বলে, 'শুয়োর দুটোর আস্পদ্দা দ্যাখ।'

বাসনা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসে। হাসির সামান্য শব্দও কানে যায় মাখনলালের। আগেব মত ভঙ্গিতেই বলে, 'এ দুটো যদি তোমার হাড়ে দুব্বোঘাস না গজায়, তো কী বলেছি।'

ধমকে ওঠে বাসনা। বলে, 'ছিঃ, ও কী কথা। সাত সকালে ছেলেদুটোকে এ সব কী বলছো।'

মুহূর্তেই ভোলানাথ হয়ে যায় মাখনলাল। বিছানায় বসে হাত দুটোকে দু' পাশে মেলে ধরে একমনে সামান্য একটু ব্যায়াম করে। বলে, 'আমার বাবাও আমায় শুয়োর বলতো, তা জান?'

বীরু বলে, 'ঠাকুমা কিছু বলতো না।'

'ধৃত। কেন বলবে? প্রত্যেক বাপই ছেলেদের শুয়োর, হারামজাদা এসব আদর করে ডাকে। তোরা যখন বাপ হবি, তোরাও ডাকবি।'

হারু বলে, 'বয়ে গেছে ওধরণের কথা বলতে।'

মাখনলাল হি হি করে হাসে।

বাসনা গলায় ঝংকার তুলে বলে, 'হাসছো যে বড়। লাজ-লজ্জা কি কিছুই নেই তোমাব।'

মাখনলাল চৌকি থেকে নেমে ভাল করে লুঙিতে কষি বাঁধে, বলে, 'লাজলজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়।'

বীরু আর হারু জানে, বাবা নানান ধরনের ছড়া কাটতে ওস্তাদ। একটু খুঁচিয়ে দিলেই হ'ল। গড়গড় করে নানান ধরণের ছড়া কথার প্রসঙ্গে বলে বলে বাড়ি মাতিয়ে দেবে। মাখনলাল বাঁ-হাতের চেটোয় দাঁতের মাজন নিয়ে কলতলায় চলে যায়। যেতে যেতে বাসনাকে লক্ষ করে বলে, 'ডিম পাড়ে মুরগীতে, খায় দারোগাবাবু।'

বাসনা জানে মিছিমিছি একথা বলেনি মাখনলাল।

ও বাসনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, 'কাল বাতে বলা হয়নি। মইনুলের বউকে ছুঁচ ফোটাতে গিয়ে চারটে ডিম এনেছি। দুটো এখন সেদ্ধ বসিয়ে দাও তো।'

'এখন ডিম খাবে কি গো। তোমার কি মাথা খাবাপ হয়েছে।' বাসনার চোখে মুখে জিজ্ঞাসা।

বীরু আর হারু সে-কথায় মাকে বলে, 'বাবা বলছে যখন সেদ্ধ বসিয়ে দাও না।' বাসনা কথা বাড়ায় না। প্লাসটিকের থলে হাটকে ডিমক'টা খুঁজে পায। তাবপব থলে উল্টে দেয় মেঝেতে। দেখে, গোটা কয়েক পাকা কলা, আলু, পেঁয়াজ আব লঙ্কা। শাড়ির আঁচলে সেসব গুছিয়ে নিয়ে রান্নাঘরমুখো হয় বাসনা।

বীরু আর হারুরও মুখ ধোযা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। কলতলা থেকে বেবিয়ে বাবাকে বান্নাঘবে মা'ব মুখোমুখি বসে থাকতে দেখে। কৌতূহলী হয়ে ওবাও বান্নাঘবে ঢোকে। ওদেব দেখে মাখনলাল বলে, 'আয়, বোস।'

ওরা অবাক হয়ে দেখে বাবা শিল-নোড়ায় গোলমবিচ গুঁড়ো কবছে। মা ছাড়াচ্ছে ডিমেব খোসা। খোসা ছাড়ান হলেই উনোনে কেতলি বসিয়ে দেয় বাসনা। চা হবে।

মাখনলাল বলে, 'আজ ওদেব জন্যও একটু চা করো। ডাক্তাববাবু বলে'ছ' এককাপ চা শবীবের পক্ষে ভাল। ওতে নাকি হার্ট ভাল থাকে।'

বারো বছর হল বিয়ে হয়েছে বাসনাব। এধরণের কথা মাখনলালের মুখ থেকে শুনেছে কিনা মনে করতে পারল না। ববং একবাব এদের সর্দিজ্বরের মত হলে, বাসনা আদা মেশান চা দিয়েছিল খেতে। তা দেখে মাখনলাল ক্ষেপে বাড়ি মাথায় তুলেছিল। বলেছিল, 'এসব খেলে লিভাব নষ্ট হয, তা জান?'

বাসনা বলেছিল, 'ডাক্তাবি ফুটিয়ো না। জ্বরজারি হলে সবাই চা খায়, এ আমি অনেক দেখেছি।'

'হুঃ।' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলেছিল মাখনলাল সেদিন। বলেছিল, খাচ্ছিল তাঁতি তাঁতবুনে, কাল হ'ল এঁড়ে গবু কিনে। তোমার দশাও তাই হবে বলে দিলাম।' আজ সেই মাখনলালই কিনা চাযেব উপকাবিতার কথা বলছে। বেওকুফের মত বীরু আর হারু চেয়ে থাকে। আব বাসনাব চোখে জমাট বিস্ময়। কী ভেবে ডিম দুটোকে চারভাগ করলো বাসনা। ডিমেব ভেতরকাব হলদে কুসুমের দিকে লোভী দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল হারু-বীরু।

সেবার পৌষ-মেলায় খান কয়েক কাপ ডিস কিনেছিল মাখনলাল। সম্পন্ন বাড়িতে কাপ ডিসের ব্যবহার দেখেছে। নিজের বাড়িতে গেলাসে চা খাওয়ার রেওয়াজ, এটা অনেকদিন ধবেই অপছন্দ মাখনলালের। কম্পাউন্ডারী করতে করতে নানান ধরণেব বাড়িতে ওর যাতাযাত। প্রেসক্রিপশানে ইনজেকশান দেওয়ার কথা লেখা থাকলে মাখনলালের বুকের ভেতরে জগঝম্প বেজে ওঠে। কতটুকু সময়ের কাজ কিন্তু মাখনলাল শেয়ানার শেয়ানা। বোগীর বাড়িতে গিযেই প্রথমেই ডাক্তারবাবুর মত নাড়ী টিপে দেখে রোগীর। তারপর বড় করে জিব বের করতে বলে। চোখ দুটোও টেনে টেনে দেখে। কী বোঝে মাখনলাল কে জানে, কিন্তু বিজ্ঞেব মত ভঙ্গি করে গুম মেরে

বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে সুস্থে ছোট্ট ব্যাগ খুলে তার ভেতর থেকে সিরিঞ্জ বের করে। স্পিরিট দিয়ে সূঁচ মুছে হাওয়ায় শুকিয়ে নেয়। ছোট্ট করাতের মত যন্তরটা দিয়ে অ্যামপুলের কাঁচ কাটে। পরে সূঁচটা অ্যামপুলের ভেতরে গলিয়ে দিয়ে ওষুধ টেনে তোলে। রবারের দড়ি বের করে রোগীর হাতে পেঁচায়। নীল শিরা দেখতে দেখতে মোটা হয়ে ফুলে ওঠে। দেরী না করে প্যাট করে সূঁচ ঢুকিয়ে ওষুধ রোগীর শরীরে দেয়। সূঁচ বের করে নিয়ে স্মিত মুখে জিজ্ঞেস করে, 'লাগল'? 'পিঁপড়ের কামড় খেলাম যেন মনে হল। রোগী উত্তর দেয়। হো হো করে হেসে মাখনলাল বলে, 'আমারটা শুধু পিঁপড়ের কামড়, জহিরুলের ভীমরুলের, তাই না? কত জন এসে নালিশ করে বলেছে, জহিরুল শরীরের ভেতর যেন শাবল চালায়। ব্যথায় দু-তিনদিন টসকো হয়ে ফুলে থাকে। ওস্তাদের হাতে সুর বেরোয়। আর আনাড়ির হাতে ঢ্যাব ঢ্যাব আওয়াজ বেরোয়, সত্যি কিনা বলো?'

বেশি কথা না বলে চা খেয়ে আট আনা পকেটে পুরে ব্যস্তবাগীশের মতো রোগীর বাড়ির আঙিনা পেরিয়ে যায়। যেতে যেতে বলে, 'ডাক্তারবাবু যাই বলে বলুক, একটু মাগুর মাছের ঝোল খেয়ো। শরীরে রক্তের ছিটেফোঁটাও নেই। একদম ফ্যাক-ফ্যাক করছে। তোমার পুকুরে জিওল মাছ তো অনেক, পারতো আমার বাড়িতে দু'একটা পাঠিয়ে দিও। বসে বসে এসব কথাই এখন ভাবছিল মাখনলাল ঠিক সেই সময় হারু বলল, 'হ্যাঁ বাবা, গোল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে কী হবে?'

হে হে করে হাসে মাখনলাল। বলে, 'সকালবেলা নুন গোলমরিচের গুঁড়ো মেখে ডিম খেলে শরীরে শক্তি আসে।' নিজের হাতেই কলা, ডিমের টুকরো সাজিয়ে বাসনার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, 'নাও গো, খেয়ে নাও। নে নে চটপট খেয়ে নে তোরা।'

বাসনা খুশী খুশী গলা করে বলে, 'আগে তোমরা খাও, এই ফাঁকে আমি চা ছেঁকে ফেলি।'

ছেলেদের মুখের দিকে আড়ে আড়ে তাকায় মাখনলাল। চাকুম-চুকুম শব্দ উঠছে ওদের মুখ দিয়ে। বড় সুখ অনুভব করে। বাসনার দিকে চোখ যেতেই দেখে, ওর শরীরটা ভরা দীঘির মত ঢল ঢল করছে। বুকের ভেতরে সুখের সুড়সুড়ি অনুভব করে মাখনলাল। বীরু কী মনে করে ঠিক সে সময় জিজ্ঞেস করে, 'এরকম খাওয়া কি রোজ চলবে এখন থেকে?'

মাখনলালও সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'হবে রে হবে, জল জোলাপ জোচ্চুরি, তিন নিয়ে ডাক্তারি', বলেই খিলখিল করে হাসে।

ছেলেরা বোঝে না কিছুই, এমন কি বাসনাও।

ওরা আর কথা না বাড়িয়ে বাধ্য ছেলের মত ঘরে গিয়ে পড়তে বসে। বাসনার গা ঘেঁষে দু'চারবার খুনসুটি করে মাখনলাল। বাসনার মেজাজটা আজ সাফ। মাখনলালের এমত আচরণ বেশ ভাল লাগায় মাতিয়ে তোলে। একটা সুখের পর আর একটা সুখের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে ওরা। কিন্তু সময়টা বড় বেয়াড়া। গরম নিঃশ্বাস ফেলে বাসনা বলে, 'সরে বসো, ওরা এসে পড়তে পারে।'

মাখনলাল অবুঝ নয়। বড় করে নিজেও শ্বাস টানে।

বাসনা বলে, 'এরকম রোজ রোজ খাওয়া জুটলে, ছেলেদুটো কলকলিয়ে উঠবে দেখো।'

বাসনার শরীর এখন মাখনলালের হাতের মুঠোয়। বলে, 'সে চিন্তা করো না। চুল পাকলো তো

বুদ্ধি বাড়ল। ইনজেকশানের আটআনায় কী হয় বলো? পয়সা তো নেবই, তাছাড়াও লাউ, কুমড়ো, ডিম, জিওল মাছ নিয়ে আসতে পারলে লাভ অনেক। বুদ্ধির গোড়ায় রাজেন ঘোষ অনেক আগেই জল ঢেলেছিল। সেই থেকে ব্যাপারটা যদি রপ্ত করতে পারতাম তো চিন্তা ছিল না। বাসনা সবিস্ময়ে চেয়ে থেকে বলে, 'প্রায়ই তুমি রাজেন ঘোষের নাম করো। লোকটা কে বলো তো?'

'থানার সেকেন্ড অফিসার। বড় ডাকসাইটে লোক।'

'ওর সঙ্গে তোমার আলাপ হল কী করে?'

মাখনলাল উত্তর দেয়, 'মেয়েমানুষ তুমি, সব কিছু বুঝবে না। ছড়া কেটে বলে, 'পেটের কথা পেটে থাকাই ভাল, বৌ-পোয়ে জানলে সব গরল।' নিজেই হাসে মাখনলাল।

বাসনা এবার গা ঘেঁষে বসে মাখনলালের। বলে, 'এক জোড়া বাউটি করে দেবে বলেছিলে, দিলে না তো?'

মাখনলাল দু'হাত জোড়া করে কপালে ঠেকিয়ে বলে, 'মায়ের কৃপা হলে, এ মাসেই তোমার বাউটি আর নৎ হয়ে যাবে।'

'কবে যে মায়ের কৃপা হবে,' বাসনা শ্বাস টেনে বলে।

মাখনলাল গাঢ় করে চুমু খেল বাসনাকে। সহাস্যে বলে, 'হবে হবে'।

জেলেপাড়ায় গত রাতে কী নিয়ে মারামারি হয়েছে। খুন হয়নি কেউ, তবে জখম হয়েছে দশ বারো জন। শহরে যেতে গেলে পাক্কা তিন ঘণ্টা। তাই লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচিতে ডাক্তারবাবুর বাড়ির সামনে বেশ ভিড়। সব শুনে টুনে ডাক্তারবাবু মাখনলালকে সঙ্গে করে জেলেপাড়ার দিকে এগোন। মাখনলাল বেশ কিছুটা পথ গিয়েই বলে, 'ডাক্তারবাবু আপনি এগোন, আমি যাচ্ছি।'

ডাক্তারবাবু ভুরু কুঁচকে তাকান মাখনলালের দিকে। বলেন 'পরে যাবেন কেন?'

'সুবল হাজরাকে সূঁচ না ফোটালে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।' মাখনলাল উত্তর দেয়। সুবল হাজরা অঞ্চল প্রধান। ক'দিন ধরেই শ্বাস কষ্টে ভুগছে। ডাক্তারবাবুই টানা তিনদিন ইনজেকশান দেবার কথা বলেছেন। মহাপ্রতাপশালী লোক, সময়মত না যেতে পারলে নানান ঝামেলা। জেলেপাড়ার লোকগুলোর যা হয় হোক, সুবল হাজরার ঝামেলা মিটিয়ে আসাই ভাল।

ডাক্তারবাবু বলেন, 'বেশি দেরি করবেন না। ইনজেকশান দিয়েই চলে আসবেন।'

মাখনলাল মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানিয়ে বলে, 'সে আর বলতে। একদম ভাববেন না, আমি যাব আর আসব।' কথা শেষ করেই মাখনলাল ঊর্ধ্বশ্বাসে সুবল হাজরার বাড়িমুখো হয়।

সুবল হাজরাকে বেশ সুস্থই দেখাচ্ছিল। হাত জোড় করে নমস্কার করল মাখনলাল।

সুবল হাজরা জিজ্ঞেস করলো, 'আজ দশ মিনিট দেরি হলো যে?'

'আর বলবেন না স্যার। জেলেপাড়ায় কী নিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড হয়েছে। ওখান থেকেই তো আসছি। ওদের প্রাণ কই মাছের মত, সহজে মরে না। স্যারের কথা মনে পড়তেই চলে এলাম।' মাখনলাল উত্তর দেয়।

'আজ কিন্তু আপনাকে খুব চার্মিং দেখাচ্ছে।'

মাখনলালের কথায় হেসে ফেলে সুবল হাজরা। বলে, 'নতুন ডাক্তারের পাল্লায় পড়ে তোমার বেশ ইংরেজিতে জ্ঞান হয়েছে দেখছি। তা যাই হোক, তাড়াতাড়ি সূঁচ ফুটিয়ে আমায় নিশ্চিন্ত করো বাপু। এই ভাল আছি, কখন যে ফের শ্বাসকষ্ট শুরু হবে, কে জানে।' সিরিঞ্জ ঠিক করতে করতে মাখনলাল বলে, 'অনেক লাউ আর কুমড়ো হয়েছে। দু' একটা যদি দয়া করে দেন।'

সুবল হাজরা হো হো করে হেসে বলে, 'যত খুশী নিয়ে যেও। যাবার সময় রাম পালোয়ানকে বলে নিও।'

মনে মনে মাখনলাল বলে, ঠ্যালার নাম বাবাজীবন। শালা আটআনা পয়সা দিতে দম বন্ধ হয়ে যায় আর এখন শরীর দিয়ে কলকল করে শীতল জল পড়ছে। 'পড়েছো মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।'

চটপট ইনজেকশান দিয়ে রামপালোয়ানকে বলে, দুটো লাউ, একটা কুমড়ো আর আধ ডজন ডিম নিয়ে বাড়ি মুখো হল মাখনলাল। 'জেলেপাড়া জাহান্নামে যাক, আপনি বাঁচলে বাপের নাম' মনে মনে কথা ক'টি আউড়ে মাখনলাল দ্রুত পথ চলতে থাকে। যাওয়ার পথেই হারান ঘরামির আটচালাটা চোখে পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস উথলে ওঠে ওর বুকের মধ্যে। হারানের বিধবা বোন উমার সঙ্গে থানার সেকেন্ড অফিসার রাজেন ঘোষের আশনাই ছিল। আর তারই দাপটে হারানও যেন সেকেন্ড অফিসার বনে গিয়েছিল। অনেকের অনেক টাকাই খেয়েছে হারান। টাকা খেলেও কাজ করে দিত। তার সুযোগ মাখনলালও কি ছেড়েছে। ছাড়েনি। নিখরচায় ডাক্তার দেখিয়ে হাসপাতালের ওষুধ বেমালুম পাচার করে দিয়েছে হারানের বাড়িতে। উমার প্রসাদ পাবার জন্য দু-একবার হাতও বাড়িয়েছে। কিন্তু মেলেনি। মুহূর্তেই উমার ভাবনায় পড়ে যায় মাখনলাল। কী তেজ ছিল মেয়েটার। একবার শীতের দুপুরে জাপটে ধরেছিল উমাকে। কিন্তু উমার জোরের কাছে হার মানতে হয়েছিল মাখনলালকে। উমা বলেছিল, 'ফের যদি আসবি হতচ্ছাড়া তোকে আমি জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়ব। রাজেন আসুক, তোকে গাঁ ছাড়া করে ছাড়ব আমি।'

মাখনলাল সেদিন পাকা অভিনেতা হয়ে গিয়েছিল। গড় হয়ে উমার পায়ে পড়ে বলেছিল, 'শরীরের দুর্বলতা ক্ষমা করে দাও উমারানী। এই কান ধরে প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার ত্রিসীমানায় আসব না।'

উমার সে কী হাসি। বেশ সুন্দর ভঙ্গি করে হেলতে দুলতে কাছে এসে বলেছিল, 'বিয়ে থা কর না রে মুখপোড়া। শরীরের দুর্বলতা কাটবে।' কথাটা মনে ধরেছিল মাখনলালের। মাথা হেলিয়ে বাড়ি চলে এসেছিল। কিন্তু তিন-চার রাত্তির ঘুমোতে পারল না ও। ভাবত, এই বুঝি রাজেন দলবল নিয়ে কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবে। কিন্তু এক মাস যখন নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেল, মাখনলালের শরীরে জেল্লা দেখা দিল। ঠায় দাঁড়িয়ে এসব ভেবে লাউ কুমড়ো আর আধ ডজন ডিম নিয়ে হারান ঘরামির বাড়ি ঢুকল মাখনলাল। হারানের নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করল। কেউ উত্তর দিচ্ছে না কিন্তু নজরে গেল, ঘরের দরজা হাট করে খোলা। বেড়াল পায়ে গুটিগুটি এগিয়ে গেল দোর গোড়া পর্যন্ত। দরজা দিয়ে চোখ বাড়াতেই নজরে গেল, উমা বিছানায় শুয়ে আছে।

কাছে এগিয়ে এসে দেখে ফ্যাক ফ্যাক করছে উমার মুখ। সেই চোখ ধাঁধান চেহারায় এখন শুধু ক'খানা হাড়। দুটো ডাগর চোখ গর্তে বসে গেছে।

উমা বলল, 'কী মনে করে কম্পাউন্ডার'?

কী জবাব দেবে মাথায় এল না চট করে মাখনলালের। একটু সময় নিয়ে বলল, 'সুবল হাজরার বাড়ি গেছলাম। পয়সা যৎসামান্য দেয়, তাই লাউ কুমড়ো নিয়ে এসেছি, ডিমের কথা বেমালুম চেপে গেল। ভাবলাম, একটা লাউ তোমাকে দিয়ে যাই।'

অস্থি চর্মসার উমা যেন খুব হাসির কথা শুনলো। বলে 'রেখে যাও'। বলেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল উমা।

মাখনলাল মনে মনে বিপদ গোনে। ভাবে, এসময় যদি হারান ঘরে ঢোকে তো খারাপ ভাবনা না ভেবে পারবে না। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে যায়। মুখে বলে, 'আমার সময় নেই উমারানী, লাউ রেখে গেলাম। খেয়ো।' কথা না বাড়িয়ে প্রায় দৌড়নোর মত ভঙ্গিতেই উমার ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মাখনলাল। একটা লাউ উমার কাছে রেখে এসেছে ফলে ওজন হালকা হওয়ায় পথ চলতে তেমন আর কষ্ট হচ্ছে না ওর। কিন্তু মাখনলালের কষ্ট অন্য জায়গায়। উমার কান্না ওর মনমেজাজকে ভীষণ বেকায়দায় ফেলেছিল। অমন নজর কাড়া দেহটার ওই হাল হয়েছে দেখে বুকের মধ্যে দুঃখের একটা পুকুর তৈরি হয়ে গেল মুহূর্তেই। কিন্তু এসবের বিন্দুবিসর্গও প্রকাশ করা চলবে না। প্রকাশ হলেই চিলচিৎকার শুরু করে দেবে বাসনা। ফলে পাড়া প্রতিবেশীরাও জেনে যাবে খুব সহজে। মনে মনে ভাবল, যাক গে যাক উমার বাড়ির ত্রিসীমানায় আর পা দিচ্ছে না ও। লাউ কুমড়ো আর ডিমকটা দাওয়ায় রেখে বাসনাকে জানান দিয়ে জেলেপাড়া মুখো হল। এত দেরি করে আসার কারণ জিজ্ঞেস করতেই মাখনলাল বেমালুম দু-চারটে মিথ্যে বলে গেল। ডাক্তারবাবু যা যা কবার সব পরামর্শ দিয়ে চলে গেলেন, মাখনলাল তিরিক্ষি মেজাজ করে ভিড় করে থাকা লোকজনকে সবিয়ে দিয়ে বলল, 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' তোবাও হচ্ছিস তাই, কোথায় মিলমিশ করে থাকবি তা না, শুধু খেস্তাখেস্তি করে মাবামারি কবেই মলি।' শত দোষে র মধ্যে এই একটা ব্যাপারে জুড়ি নেই, কম্পাউন্ডারীটা ভালমতই রপ্ত করেছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঠিকঠাক ওষুধ দিয়ে আশপাশটা ভাল করে নজর করে দেখে। কাজেম আলির বাড়িব উঠোনে বেশ কয়েকটা মুরগি খুটে খুটে খাবার খাচ্ছিল। সোৎসুক চোখে মুবগি ক'টাকে দেখে মাখনলাল বলল, 'ও মিয়াভাই, মুবগি ক'টা তো বেশ শাঁসে জলে হয়েছে দেখছি।'

কাজেম আলি বলে, 'তা হয়েছে কম্পাউন্ডারসাব।'

মাখনলাল কৃত্রিম গলা করে বলে, 'অকৃতজ্ঞ বলে একটা কথা আছে, তা জান?'

'অকৃতজ্ঞ' শব্দটার অর্থ বোঝে না কাজেম আলি। বলে, 'তা যা বলেছেন।'

বড় বড় চোখ করে মাখনলাল জিজ্ঞেস করে, 'সে কি রে? তুইও সে দলের নাকি?'

কাজেম আলি হ্যাঁচোর প্যাঁচোর করে বলে, 'ও সব ঝগড়াঝাটিতে আমাকে জড়াচ্ছেন কেন সাব।'

হো হো করে হেসে কাজেম আলির পিঠে হাত রাখে মাখনলাল। বলে, 'কথাটার মানেই বুঝিসনি। মানে হচ্ছে গিয়ে....'

কথাটা শেষ করতে দেয় না কাজেম আলি। বলে, 'বিকেলে বাড়ি আছেন তো? গোটা মুরগি পাঠাব, না, ছাড়িয়ে ছুড়িয়ে পাঠাব বলে দেন। ছেলেটারে যেন পুলিশে না খাবলায়।' বলেই মাখনলালের হাত ধরে বলে, 'পঞ্চাশ একশো যা লাগে বিকেলে মুরগির সঙ্গেই পাঠিয়ে দেব, কী বলেন?' হে হে করে হাসে মাখনলাল। পরক্ষণেই গম্ভীর গলা করে বলে, 'ডাক্তারবাবু ওই সামান্যতে পটবে কী না কে জানে। তার ওপরে বড়বাবু মুকুন্দ মিত্তিরের ল্যাঠা। কথায় বলে না, 'কায়েত কালসাপ বেদোনারী; তিনজনকে পরিহরি।' কাজেম আলি ভ্যাবলা চোখে চেয়ে থাকে মাখনলালের দিকে। মুখে রা করে না। শুধু হাত কচলায়।

'ঠিক আছে, তোমার চিন্তা কী।' চটপট হাতের কাজ সেরে হাসপাতাল মুখো হয় মাখনলাল। ডাক্তারবাবুকে এসে সব বলে। ডাক্তারবাবু লোকটা ভালই । বলে, 'আপনি এখানকার পুরোন লোক। কী করতে হবে বলুন।'

'আপনি বললে থানা পুলিশ এড়ান যাবে, সংসারে দ্যাখেননি স্যার, এটা সেটা নিয়ে টুং-টাং লেগেই থাকে। তা কি কেউ চিরকাল জিইয়ে রাখে। তাছাড়া, পুলিশের কাজ শুধু শাস্তি দেয়াই নয়, ক্ষমা করা, শোধরান। ধমক-ধামক দিয়ে ওদের শোধরান যাবে, এ আমি হলপ করে বলতে পারি।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেন ডাক্তারবাবু। বলেন, 'এসব কথা আমি বললে পুলিস হয়তো ভাববে, আমার স্বার্থ আছে; বলুন ভাববে কিনা?'

অকপট সরল মুখ করে মাখনলাল বলে, 'খাঁটি কথা। তবে কি জানেন, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। তেমনি.. ....।'

ডাক্তারবাবু সমঝদার লোক। বলেন 'ওদের জন্য সত্যি আপনি ভাবেন দেখছি।'

'কেন ভাবব না বলেন স্যার। আপনারা তো দু'তিন বছর অন্তর চলে যান, আমাকে এদের নিয়েই থাকতে হয়। ওদের ভালমন্দ সুখ-দুঃখের সঙ্গে আমি যে জড়িয়ে গেছি ডাক্তারবাবু।' মাখনলাল উত্তর দেয়।

ওর বলার ভঙ্গিতে মনটা নরম হয় ডাক্তারবাবুর। কথাগুলো ফেলনা নয়। যুক্তি আছে। অস্বীকার করাব উপায় নেই। বলেন, 'ঠিক আছে বলছেন যখন, যাই থানা থেকে একটু ঘুরেই আসি।'

'ট্রাই করবেন স্যার। কেসটেস যেন এর মধ্যে না লিখে বসে।' মাখনলালের মুখে চোখে তীব্র আর্তি প্রকাশ পায়।

পুলিসে চাকরি করলে এই মাখনলালের শরীরেই খাঁটি দুধের সর লাগত, এতে কোন সন্দেহই নেই। ডাক্তারবাবু চলে যেতেই, বেমক্কা মনটা ভার হয়ে যায় ওর। ঘন করে একটা শ্বাস ফেলে বুঝি। কম্পাউন্ডারীতে বছর দুয়েকও কাটেনি, এক শীতের রাতের কথা মনে পড়তেই সারা শরীরে কাঁপন লাগে মাখনলালের। মাঝরাতে টুকটুক আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। প্রথমে ভেবেছিল ছুঁচো বা ইঁদুরের উপদ্রব। কিন্তু পরপর একই ধরণের আওয়াজে ওর ঘোর কেটেছিল। শীত যেন সূঁচ ফোটাচ্ছিল, গরম লেপের নিচ থেকে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছেই করছিল না। আরও মিনিট কয়েক

ঝটকা মেরে পড়ে থাকল। কিন্তু ফের ওধরণের টুকটুক আওয়াজ এবার ওকে ওঠাতে বাধ্য করাল। র‍্যাপার জড়িয়ে দরজা খুলেই দেখে, রাজেন ঘোষ। এ অঞ্চলে জাঁদরেল সেকেণ্ড অফিসার। অন্য কেউ হলে ঘুমের আঠা চোখ থেকে সরতোই না। ভ্যানতারা করে দূর করে দিত। কিন্তু রাজেন ঘোষ বড্ড শক্ত জাল, সে জাল কেটে বেরিয়ে আসা অত সহজ নয়। সুতরাং শীতভাব এক মুহূর্তেই কেটে গেল মাখনলালের; র‍্যাপারের ভেতর থেকে হাত জোড় করে সরাসরি কপালে ঠেকাল। বলেছিল, 'এত রাতে নিজে না এসে লোক দিয়ে ডেকে পাঠালেই আমি হাজির হয়ে যেতাম।'

ঘরের ভেতরে সরাসরি ঢুকে গেল রাজেন ঘোষ। মাখনলালের সিঁটকে বিছানায় গিয়ে বসলো। আপাদমস্তক ওর মুখের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ পর বলেছিল, 'পুরুষ মানুষের শরীরে কাম-কীট থাকে তাই না, কম্পাউন্ডার?'

'আজ্ঞে, তা তো থাকবেই।'

'তোমার শরীরেও ওই কাম-কীটের বাসা আছে তা জান।' রাজেন ঘোষ জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল।

'তা তো থাকবেই স্যার।'

হে হে করে খচ্চর মার্কা হাসি হাসল রাজেন ঘোষ। বলেছিল, 'একটা সোমত্ত মেয়েছেলে পেলে তুমি কী কর কম্পাউন্ডার?'

মাখনলাল ওর কথাগুলো ঠিক ঠিক ধরে উঠতে পারল না। মাথার ভেতরে হাজারো বিজবিজানি শুরু হয়। এ রকম শীতের রাতে রাজেন ঘোষ কি ওর সঙ্গে ঠাট্টামসকরা করতে এসেছে? কিন্তু পরক্ষণেই উল্টো চিন্তা মাথার মধ্যে পাক খায়। ভয়ে হাত-পা সিঁটিয়ে যায় ওর। মরা মাছের মত ছিল বুঝি ওর চোখের চাউনি। পাল্টা প্রশ্ন করতে ভরসা পাচ্ছিল না মাখনলাল।

রাজেন ঘোষ একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, 'বিয়েথা না করে কী করে আছ মাখনলাল?'

ও উত্তরে বলেছিল, 'শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াবে তাই সয়।'

ওকথা শুনে দুলে দুলে হেসেছিল রাজেন ঘোষ। সিগারেটে ঘ· ·ন টান দিয়ে বলেছিল, 'উমাকে তাই বুঝি জাপটে ধরেছিলি হারামজাদা। শরীরের দুর্বলতা ওভাবে সারাতে চেয়েছিলি কেন রে?'

বুকের ভেতরটা ধূ ধূ মাঠ হয়ে গিয়েছিল মাখনলালের। অমন করে ক্ষমা চাওয়ার পরও উমা রাজেন ঘোষকে বলেছে ভাবতেই, মাখনলাল কালবিলম্ব না করে রাজেন ঘোষের পা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, সেদিনের পর থেকে ও-বাড়িমুখো আর হইনি স্যার। ও কীট বড় সব্বনেশে কীট।'

রাজেন ঘোষ ওর হাত দুটো ধরে তুলে বলেছিল, 'বেশ করেছিলি। সুযোগ পেলে হাজার- বার করবি। মেয়েমানুষ নিয়ে একটু আধটু ফুর্তিই যদি না করলি তো পুরুষ কিসের রে? মাথা ঠাণ্ডা কর। নে একটা সিগ্রেট খা।'

সিগারেট নিতে হাত কাঁপছিল মাখনলালের। ওর অমন ভঙ্গি দেখে, রাজেন ঘোষ শব্দ করে হেসে ফেলেছিল। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ওর টুকরোটা মেঝেতে ফেলে জুতো দিয়ে পিষতে পিষতে বলেছিল রাজেন ঘোষ, 'ডাক্তারের সঙ্গে তোর খাতির কেমন?'

'দুলাল শিকদার ফাস্ ক্লাস লোক স্যার।' উত্তর দিয়েছিল মাখনলাল।

পয়সা টস করার মত মুদ্রা দেখিয়ে রাজেন ঘোষ বলেছিল, 'এসবে টান কেমন?'

মাখনলাল একটু একটু করে শক্তি ফিরে পাচ্ছিল। বেশ ঋজু ভঙ্গিতেই বলেছিল, 'শীত বড়ই কামড়াচ্ছে স্যার। আর একটা সিগ্রেট দেন তো?' মনে মনে ভেবেছিল, সিগারেট পেলেই বুঝবে রাজেন ঘোষ-এর কোন না কোন দুর্বলতা আছে, তা না হলে এত রাত্তিরে ওর বাড়ি সেধে আসেনি। বেশ আত্মপ্রত্যয়ী ভঙ্গিতে হাত বাড়াল মাখনলাল।

রাজেন ঘোষ সিগারেটের প্যাকেট ওর সামনে রাখল। মাখনলাল নির্দ্ধিধায় প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে দেশলাই জ্বালাল। গল গল করে মুখ-নাক দিয়ে ধোঁয়া বের করে বলল, 'জানেন তো স্যার ভগবানও পুজা চায়, আর দুলাল ডাক্তার তো রক্ত মাংসের মানুষ।'

'তাহলে আমার হয়ে তোকে একটা কাজ করতে হবে।'

দ্বিগুণ উৎসাহী হয়ে বলেছিল মাখনলাল, 'কী করতে হবে বলেন?'

'উমার পেটের বাচ্চাটার জন্য যে তুই দায়ী, একথা বলে উমাকে খালাস করতে হবে।'

শরীরটায় ফের শীত ভাব অনুভব করেছিল মাখনলাল। গলা শুকিয়ে কাঠ। ফ্যাকাশে চোখে চেয়েছিল শুধু রাজেন ঘোষের দিকে। বলেছিল, 'কী কথা বলছেন স্যার।'

রাজেন ঘোষ বেশ ঋজু ভঙ্গিতেই বলেছিল, 'বলবি, ওই কাম-কীটের তাড়নায় মেয়েটার সব্বোনাশ করে ফেলেছিস। এখন একটা ব্যবস্থা না করলে আমাদের দুজনেরই মরণ। এমন করে বলবি যেন ডাক্তারকে জল করতে পারিস। হ্যাঁ, তার জন্য যা লাগবে, তা আমি দেবো। ভাবিস না।'

মাখনলাল ফ্যাকাশে মুখ করে বলেছিল, 'আগে থেকে কী করে কথা দিই বলেন। তাছাড়া যা করিনি, তা বলবো কেন?'

'নইলে উমাই বলবে যে, তুইই ওর পেটের বাচ্চাটার জন্য দায়ী।'

সেকথায় সারা শরীরে ভূমিকম্প হতে থাকে মাখনলালের। মাথা গোঁজ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ। গলা দিয়ে চিঁ চিঁ আওয়াজ করে বলেছিল, 'উমা মিথ্যে আমার নামে লাগাবে কেন স্যার। যে ওর সব্বোনাশ করেছে তার কথা বললেই তো সব ন্যাটা চুকে যায়। যায় কী না কন?'

রাজেন ঘোষ বলেছিল, 'ন্যাটা চুকোতে হলে এছাড়া আর কোন পথ নেই, মাখন। তুই ওকে জাপটে ধরেছিলি, একথা তো মিথ্যে নয়?'

'জাপটে ধরেছি তো কী?' গলায় দৃঢ়তার ছাপ ফুটিয়ে তুলেছিল সে সময় মাখনলাল। রাজেন ঘোষ বাজখাঁই গলা করে বলেছিল, 'চ্যাটাং চ্যাটাং কথা যে খুব কইছিস রে। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, আর পুলিসে ছুঁলে কত ঘা তা জানিস। জানিস না। প্রথমেই তোকে পিছ মোড়া করে রেপ কেসের আসামী করে ধরে নিয়ে যাব। উমারও একটা জবানবন্দী নিয়ে নেবো সেই সঙ্গে। ফলে পাঁচ বছর পর্যন্ত ঘানি টেনে আসতে হতে পারে তোর। তার চেয়ে যা বলছি শোন। উমার পেটের বাচ্চাটাকে খালাস করার ব্যবস্থা কর। মনে রাখবি, উমা যেন টের না পায়। শালির বড় শখ রাজেন ঘোষের বউ হবে। বিধবা হয়ে স্বপ্ন দেখতে লজ্জা করলো না। শালি!'

উমাকে উদ্দেশ্য করে শেষের কথাগুলো বলেছিল রাজেন ঘোষ।

মাখনলাল ফিক করে হেসেছিল। বুকটা বেশ হালকা, ভয়ের লেশমাত্রও টের পেলো না। ফিকফিক করে হেসে চোখ মেরেছিল রাজেন ঘোষকে। বলেছিল, 'বেশ আছেন মাইরি, গাছেরও খান, তলারও কুড়োন।'

রাজেন ঘোষ পকেট থেকে একগাদা টাকা বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, এতে শ'চারেক আছে। লাগলে ফের না হয় দু একশো দেয়া যাবে। মেয়েছেলের বুদ্ধি কখন যে কোন দিকে ঘুরে যায় কে জানে। জানাজানি হলে, চাকরিতে যাবেই, তার ওপর জেল। উঃ। জীবনটা একদম কেলো হয়ে যাবে।'

টাকাগুলো পকেটের মধ্যে সন্তর্পণে রেখে মাখনলাল বলেছিল, 'যান, এবার ঘরে যান। দু' ঢোক গিলে নিশ্চিন্তে ঘুমোন গে। দুলাল ডাক্তারকে বলে ফন্দিফিকির একটা কিছু বের করতেই হবে।'

পরদিন খুব ভোরেই পাকা অভিনেতার মত দুলাল ডাক্তারের বাড়িতে গিয়ে সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে বলেছিল, 'স্যার আমি তো পারি উমাকে বিয়ে করতে, কিন্তু বিয়ের আগেই পেটে বাচ্চার কথা যদি জানাজানি হয় তো, আমাদের দুজনারই আত্মহত্যা করা ছাড়া পথ থাকবে না।'

দুলাল ডাক্তার গম্ভীর গলায় বলেছিল, 'ব্যাপারটা খুবই জটিল। ক'মাসের জেনে না নিলে আমি কিছু করতে পারবো না।'

'দেড় মাস স্যার।' বলেই দুলাল ডাক্তারের পায়ে পড়ে গড়াগড়ি দিয়েছিল মাখনলাল।

দুলাল ডাক্তার বলেছিল, 'শ' দুয়েক টাকা জোগান রেখো।'

চট করে পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বের করে বলেছিল মাখনলাল, 'দিন পনেরোর মধ্যেই বাকি টাকাটা শোধ করে দোব।'

দুলাল ডাক্তারের হাত ভাল। খুব বেশি ঝামেলা পোয়াতে হল না এব্যাপারে। দু'চারটে কী সব ট্যাবলেট দিল, দিন তিনেকের মধ্যেই সব খালাস হয়ে গেল। সেদিনও উমা কেঁদেছিল খুব।

মাখনলাল গাঢ় করে শ্বাস টেনে নিল। সব বড় বেশি স্পষ্ট মনে পড়ছে। মনে মনে রাজেন ঘোষের বাপ চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করলো। ঘন ঘন দু'তিনটে বিড়ি শেষ করে উঠতে গিয়েই মাথাটা সামান্য ঘুরে গেল। ভাগ্যিস হাতের কাছে বাঁশের খুঁটিটা ছিল, সেটা ধরে নিয়ে নিজেকে সামলে নিল মাখনলাল। উমার শরীরটা এখনও ওর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভাসছে, বুকের মধ্যে কেমন এক ক্ষ্যাপা ঢেউ উথাল-পাথাল শুরু করে দিল। বিকেলের দিকে হারানের সঙ্গে দেখা।

মাখনলাল মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, 'উমার অমন দুগ্গোর মত শরীরটার বেহাল অবস্থা। তুই কী মানুষ রে হারান। বোনটার দিকে নজর দিস না। হারান বিমর্ষ মুখ করে বলল, 'কী করি কম্পাউন্ডারবাবু। যা আয়, তাতে মাসের পনেরো দিন কষ্ট করে চলে। বেশ্যাই হোক আর যাই হোক, মায়ের পেটের বোন, কী করে ফেলি বলেন। নিত্যিদিন ভাবি কত লোক মরে,উমা মরে না।' বলেই হাপুস কাঁদে হারান।

মাখনলাল ওকে শান্ত করে বলে,'মিছিমিছি কাঁদিস তুই। উমা ছিল বলেই না এতকাল রমরমা

চলছিল তোর। নতুন ডাক্তার মানুষটা ভাল। উমাকে একবার দেখা। আমিই সব ব্যবস্থা করে দেবো।' বেশি কথা বাড়ায় না ও। হারানের পাশ কেটে পশ্চিমমুখো হাঁটতে শুরু করে মাখনলাল। ধূ ধূ প্রান্তরের ওপর দিয়ে ও হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে। হঠাৎ মাঠের মাঝে ও থম মেরে দাঁড়ায়। কতকাল এমন মায়াবী মুহূর্ত দেখেনি। ও অবাক চোখে আকাশের রঙ, পাখ-পাখালিব ঘরে ফেরা লক্ষ করতে থাকে। ও বোঝে, এ সময়টা সকলেরই ফেরার পালা। বাসনা এখন বুঝি গা ধুচ্ছে, ছেলে দুটো ঘরে ফিরলো কি? রাজেন ঘোষের কি একবারও উমার কথা মনে পড়ে না। বাসনাকে বাউটি, নৎ আর কানপাশা পরিহিত চেহারায় দেখতে পায়। সোনার বর্ণ যেমনটি ছিল ঠিক তেমনই আছে কিন্তু কেন যেন এই প্রথম মনে হয়, রাজেন ঘোষের মত মানুষের কাছ থেকে শ' পাঁচেক টাকা হাতিয়ে যে গয়না ও বাসনার জন্য গড়িয়ে দিয়েছিল, তার বর্ণ মোটেই উজ্জ্বল নয়। পচা নর্দমার গন্ধ ওর নাকে এসে ঢোকে। কেন যে এমন বিভ্রান্ত মানুষের মত পশ্চিমমুখে হাঁটছিল এতক্ষণ, তা নিজেই বুঝে উঠতে পারল না। ও এবার ভারী পা নিয়ে বাড়িমুখো রওনা হল।

সকালবেলা বাড়ি মাথায় তুলল বাসনা। হাউ হাউ করে কাঁদছে। ছেলে দুটো মুখ শুকনো করে বসে আছে।

মাখনলাল জিজ্ঞেস করে, 'কাঁদছো কেন? কী হলো?'

বাসনা চোখের জল মুছতে মুছতে বলে, 'আমার সব্বোনাশ হয়ে গেছে গো। গয়নাগাটি কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না।'

'দ্যাখো, খুঁজে দ্যাখো ভাল করে' বলেই বড় করে হাই তুলে কলতলার দিকে এগিয়ে যায় মাখনলাল। কুয়োর থিতোন জলে নিজের মুখের ছায়া নজরে পড়ে। কেন যেন মনে হয়, মুখটা ওর ভীষণ রকম পাল্টে গেছে। বাসনার দুঃখ ওকে একটুও ভাবায় না। কেননা, গয়নাগুলো বেচে দিয়ে এখন বড় সুখ অনুভব করছে। টাকাগুলো সুবিধে মত উমার হাতে কায়দা করে তুলেও দিয়েছে। এত সুখ মাখনলাল আগে আর কখনও পায়নি। বড় করে শ্বাস টেনে নিজের মনেই হাসে মাখনলাল।

অনিয়মের একদিন

খুব যে কাজের মানুষ প্রসূন তা বলা চলে না। তা বলে বাড়িতেও বেশিক্ষণ বসে থাকার মানুষ নয় ও। একটা নামী স্কুলের বাংলার মাস্টার। সুতরাং বাইরে ওর চাহিদা নেই-ই বলতে গেলে। অবশ্য ছেলেমেয়ের ভবিষ্যত নিয়ে যে সব বাবা-মা চিন্তিত তাঁদের কাছ থেকে দু-চারটে যে ডাক পায় না প্রসূন, তা নয়। দুমদাম দু একটা নিয়েও ফেলে। আর সঙ্গে সঙ্গে দেড়শো ইনটু চার-এর গুণ দিয়ে একটু অবিশ্বাসী ভঙ্গিতে গুম মেরে বসে। অঙ্কটা যখন ছ'শ, তখন আগেভাগেই এটা সেটা কিনে ফেলে। অধিকাংশই বই আর পেন।

ওর বউ মল্লিকা রহস্য করে বলে, 'এ নিয়ে শ' দেড়েক কলম হ'ল তোমার। চাকরিটা চলে গেলে, দোকান খুলে বসবে নাকি?'

প্রসূনের মুখে শিশুর সারল্য। বলে, 'ধ্যেৎ কী যে বলো?'

'বইগুলো যে কেনো, ক'খানা পড় বলতে পার?'

'ও সব ভবিষ্যতের সঞ্চয়, তুমি বুঝবে না', প্রসূন সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীর মুখে উত্তর দেয়।

'আমাদের আবাব ভবিষ্যত।' সামান্য অবহেলার ভঙ্গি ফুটিয়ে মল্লিকা বলে, 'এই নোনাধরা দেওয়াল, পায়রার খোপেব মত ঘর, সব ঋতুতেই স্যাঁতস্যাতে ভাব, এ সব নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিতে হবে।'

প্রসূন স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলে, 'তোমাদের এই মধ্যবিত্ত মানসিকতা কবে যে কাটবে, বুঝি না। আমি বেরুচ্ছি, দুটো জরুরী চিঠি আসতে পারে, দেখে শুনে জঞ্জালের স্তূপে ফেলো, নইলে সেবারের মত কাণ্ড করে বসবে।'

মল্লিকা বলল, 'সে তো জেনেশুনেই করেছিলাম, প্রতি বছর পবীক্ষার খাতা নেবে, আর এক মাস ধরে, বাড়িতে একটা গণগনে উনোন বসিয়ে রাখবে। উঃ, কী জ্বালান যে জ্বালাও একটা মাস।'

প্রসূন একথায় জল হয়ে যায়। বলে, 'পুজোর সময় যখন চেক পাই তখন কিন্তু পেছনের একটা মাসের কথা বেমালুম ভুলেই যাই। অথচ কত সামান্য টাকা! কিন্তু রেসপনসিবিলিটি, তার কী শেষ আছে।'

মল্লিকা শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে হাসি চাপার চেষ্টা করে, তা দেখে, প্রসূন বলে, 'এমন করে হাসছ যেন ভানু-জহরের কাণ্ড দেখছ?'

মল্লিকা বলল, 'হাসছি কী সাধে?'

'কিসের জন্য শুনি?'

'একজামিনারস মিটিং-এর পব খাতা নিয়ে বাড়ি এসে যখন ভ্যাবলা মুখ করে বসো, সেটা মনে পড়তেই হাসি পেল।'

প্রসূনও হাসল সে কথায়, বলল, 'ঝাঁ ঝাঁ রদ্দুর মাথায় করে হেড একজামিনারের বাড়ি যাওয়া, দু-চারটে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা, তারপর দুটো সিকি সাইজের সন্দেশ, দু'খানা থিন অ্যারারুট বিস্কুট আর পানশে চা। বিশ্বাস কবো, আমি একদিনও খাইনি।'

'কেন খাওনি। সকলেই তো খায়।' মল্লিকা জিজ্ঞেস কবল।

'সকলের সঙ্গে আমার তুলনা। আমি লিখি, ক্রিয়েটিভ রাইটার।'

মল্লিকা ঠোঁট উল্টে খুব হালকা চালে উত্তর দেয়, 'ছ'মাস, এক বছরে একটা লেখা বেরোয়, তার আবার গর্ব।'

প্রসূন পাঞ্জাবি খুলে গ্যাঁট হয়ে বসল মল্লিকার মুখোমুখি। বলল, 'তা যাই হোক, রাইটার এ কথাটা অস্বীকার করবে কি করে? কাজের দফা-রফা হল। একটু চা খাওযাও তো।'

মল্লিকা বলল, 'কেতলিতে চা আছে গরম করে দেবো, না ফ্রেশ চা করবো?'

'তাই দাও। চা খেতে খেতে আজ তোমার সঙ্গে দু'চারটে ব্যাপার নিয়ে বোঝাপড়া করবো।'

মল্লিকা ফের শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে রান্নাঘরমুখো হল। প্রসূন সিগারেট ধরাতে গিয়েও ধরাল না, সিগারেটটা মুখ থেকে নামিয়ে রাখে। দশ মিনিটের মধ্যেই মল্লিকা চা নিয়ে এল।

চায়ের রং দেখে নাক সিঁটকোয় প্রসূন। মুখে দেবার আগেই বলল, 'এটা চা, না কবরেজি পাঁচন?'

'আগে খেয়েই দ্যাখ না।' উত্তর দিয়েই মল্লিকা উৎসুক চোখে চেয়ে থাকে প্রসূনের দিকে।

প্রসূন চায়ে মুখ দিয়েই বলে, 'নাহ্, যা ভেবেছিলাম তা নয়। আসলে চায়ের কোয়ালিটিটাই ভাল।'

মল্লিকা জিজ্ঞেস করে, 'কিসের বোঝাপড়া করবে বলছিলে না?'

প্রসূন হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'সোমনাথের কথা মনে আছে? অরুণের ভাইয়ের বিয়েতে আলাপ হয়েছিল।'

মল্লিকা ভুরু কুঁচকে সোমনাথকে মনে করার চেষ্টা করল। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে নিরাশ গলা করে বলল, 'কাউকেই মনে করতে পারছি না।'

'অরুণের ভাইয়ের বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিলাম, মনে নেই?ঐ ওর ভাইটা গরমকালেও মোজা পরেছিল। ওভাবে বর সেজে এখন কী কেউ বিয়ে করতে যায়? তুমি আর বিজু খুব হাসাহাসি করছিলে। তোমাদের পরামর্শে...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়ছে।' মুখ উপচে হাসি ছড়িয়ে দিয়ে মল্লিকা জিজ্ঞেস করল, 'তা হঠাৎ সোমনাথের কথা কেন?'

সিগারেট ধরাল প্রসূন। বলল, 'গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি ওর কাছ থেকে।'

'কী সব হেঁয়ালী করছ, পস্টাপস্টি বল না, কী ব্যাপার?'

মল্লিকাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে প্রসূন বলল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী কথা হয়। একটু পাশে বসোই না।'

মল্লিকা কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলে, 'ওসব ঢং এ বয়সে সাজে না। সামনের একত্রিশে জানুয়ারী, আমাদের কুড়ি বছর কমপ্লিট হবে।'

প্রসূন হো হো করে হেসে বলে, 'তাতে কী হয়েছে। জান, আমার বাবা-মা ছাপ্পান্ন বছর ধরে রোমান্টিক লাইফ লিড করেছিলেন।'

'ওঁদের মনে সুখ ছিল, তাই সম্ভব হয়েছে। আমাদের সঙ্গে ওঁদের তুলনা হয় কী করে?'

'ছিঃ, তুলনা করবো কেন? বলেই গুনগুন করে গাইল, 'আরো কিছুক্ষণ না হয় রহিলে কাছে...'

'ধ্যাত', মল্লিকা বিরক্তি প্রকাশ করে চলে যাচ্ছিল। প্রসূন ওর হাত ধরে একেবারে বুকের কাছে টেনে আনল। টের পেল মল্লিকার বুকটা কেমন ধুকপুক করছে ভয় পাওয়া পায়রার মত। বড় বেশি অবাক হল প্রসূন। এত বছর পরও মল্লিকার ভয় কাটলো না কেন বুঝে উঠতে পারল না। কথাটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েই দেখে, মল্লিকার চোখে মুক্তোর মত জল টলটল করছে। বিব্রত বোধ করল প্রসূন। মল্লিকার মুখের দিকে অপলকে চেয়ে রইল।

মল্লিকা কান্নায় ভেঙে পড়ল। ওর পিঠে হাত রাখতেই উথাল-পাথাল ঢেউ টের পেল প্রসূন। নিজেকে শক্ত মাটিতে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো?'

'আজ আটাশে মার্চ।' বলেই ফের ডুকরে কেঁদে উঠল মল্লিকা।

প্রসূনের সব কিছু মুহূর্তেই মনে পড়ে গেল। এদিনই ওদের একমাত্র সন্তান চিরকালের জন্য ছেড়ে গেছে। বেঁচে থাকলে আঠারোয় পা দিত। কিন্তু এবার আর গম্ভীর হয়ে থাকা চলে না ভেবেই মল্লিকাকে জোরে নাড়া দিয়ে বলে, 'কী হচ্ছে এসব। জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে এতে তো কারোর হাত নেই। মিছিমিছি মন খারাপ করছো তুমি। তার চেয়ে আজ একটু আমরা অনিয়ম করি, কী বলো?'

ম্লান মুখ করে মল্লিকা বলল, 'তুমি কিছু মনে করো না।'

প্রসূন মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করে বলল, 'আমার বয়েই গেছে। পৃথিবীতে কত মানুষের কত রকমের দুঃখ। খুব ভালো একটা ছবি চলছে মেট্রোতে। প্রায় বারো সপ্তাহ পার হল। ভাবছি, এখন গেলে ম্যাটিনির টিকিট পেয়ে যাব। রান্না-বান্না আজ থাক। গতকাল ছ'টা এরিয়ার ডি এ পেয়েছি। টাকার চিন্তা করো না।' মল্লিকা হেসে ফেলল এবার। বলল, 'যতক্ষণ তুমি না ফেরো ততক্ষণ আমোকে ঠুটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকতে হবে। বলি কী, আমিও তোমার সঙ্গে যাই, কেমন?'

'তাহলে তো খুবই ভাল হয়। তোমার তো স্নান সারা। আমি বরং চটপট স্নান সেরে নিই।' প্রসূন বলল।

বাইরে বেরিয়েই অন্য মানুষ হয়ে গেল মল্লিকা। লিন্ডসে স্ট্রিট থেকে কেনা হালকা প্রিন্টেড শাড়ি পরেছে, শ্যাম্পু করা খোলা চুল বাতাসে এলোমেলো হয়ে দোল খাচ্ছিল মল্লিকার। প্রসূন রহস্য করে বলল, 'তোমাকে না বিজ্ঞাপনের মেয়ের মত দেখাচ্ছে। আমাকে তোমার পাশে একদম বেমানান লাগছে। সকলে তোমাকেই দেখছে, আর আমাকে দেখে ভাবছে আমি তোমাকে ভাগিয়ে এনেছি।'

সুন্দর ভঙ্গিতে হেসে মল্লিকা বলে, 'লোকে ঠিকই ভাবছে।'

প্রসূনও হাসল সে কথায়। ঘড়িতে সময় দেখে বলল, 'এই রে দশটা বেজে গেল।'

মল্লিকা খুশী খুশী গলায় উত্তর দেয়, 'তা আজ তো আমরা অনিয়ম করবো বলেই বেরিয়েছি।'

কতগুলো যে বাস চলে গেল বোঝাই মানুষ নিয়ে তার সীমা সংখ্যা নেই।

মল্লিকা অস্ফুটে শুধু বলল, 'বাব্বা'। লাইফ রিস্ক করে কী ভাবেই না অফিস করতে হয় সকলকে।'

প্রসূন ভারিক্কী গলা করে বলল, 'তাহলেই বোঝ। আর তোমারা এটা হল না, ওটা হল না, এটা নেই, ওটা নেই, কত রকমের বায়নাক্কাই না করো।'

'তাতে তোমার কী। যাও দুলকি চালে, ফেরো দুলকি চালে। পড়ালে পড়ালে, না পড়ালেও কেউ দেখার নেই। ফাঁকির কায়দা তেমরা কত রকমই না জান।' মল্লিকা কথাগুলো বলে ঠোঁট টিপে হাসি চাপছিল। প্রসূন বলল, 'তা তো বলবেই। পরপর তিনটে ক্লাস করার পর জিব বেরিয়ে যায়। তার ওপর একটা একস্ট্রা ক্লাস । কেউ না এলেই গেরো। হেড মাস্টার অ্যাবসেনটিস রুটিন করেই খালাস।'

'তার মানে ওই একস্ট্রা ক্লাসটাই ফালতু। ক্লাসে গিয়ে খালি ছেলেদের পাহারাদারি করা।'

'সে কথা ঠিক। আমি বাংলা পড়াই, সায়েন্সের 'স'ও বুঝি না। সেই আমাকেই যদি..'

'থাক্। যুক্তি তোমরা অনেক দাঁড় করাতে পারো। কথা শেষ করেই ডান দিকে হেলে মল্লিকা বলল, 'এই মিনিবাসটা একটু ফাঁকা মনে হচ্ছে, যদি দাঁড়াবার জায়গা পাই তো উঠে পড়বো কী বলো?'

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে প্রসূন উত্তর দেয় 'দেখ'।

যা ভেবেছিল তাই, বাসটা মোটামুটি ফাঁকাই। কথামত ওরা দুজনেই সেটাতে উঠে পড়ল। মিনিট পনেরোও লাগল না এসপ্লানেডে পৌছুতে। বাস থেকে নেমে রাস্তা পার হয়ে ওরা মেট্রোর সামনে এসে পৌছুল। বড় বড় হরফে হাউসফুল লেখা বোর্ডটা ওদের ভীষণ ভাবে অসহায় করে দিল মুহূর্তে।

প্রসূন বলল, 'রাবিশ। অ্যাডমিন্‌সট্রেশান বলে কোন কিছুই নেই। ফিফটি পার্সেন্ট টিকিট ব্ল্যাকারদের হাতে চলে গেছে। শো শুরু হওয়ার ঘন্টাখানেক আগেই ব্ল্যাকারদের দাপাদাপি শুরু হয়ে যাবে।'

মল্লিকা বলল, ' তা-বলে ব্ল্যাকারদের কাছ থেকে টিকিট আমি তোমাকে কিনতে দেব না।'

'ক্ষেপেছ। আমি ওদের ছায়াও মাড়াই না কোনদিন। তার চেয়ে চলো, এখন তো প্রায় এগারোটা বাজল, এবার নিশ্চিন্ত হয়ে গুপ্তধনের খোঁজটা করে আসি। জানি, কোন কাজই হবে না, তবু চেষ্টা করতে দোষ কী।' প্রসূন একটানা বলে গেল কথাগুলো।

মল্লিকা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'গুপ্তধনের ব্যাপারটা কী বললে না তো!'

প্রসূন একটু চাপা স্বভাবের। এটা এতদিনেও টের পেল না দেখে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেও এ মুহূর্তে তা প্রকাশ করল না। মেট্রোর পাশের সরু গলির ভেতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল মল্লিকাকে নিয়ে।

দুপাশে অসংখ্য দোকান। বিদেশী জিনিসপত্রের ছড়াছড়ি। গতকাল এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় আজ রোদের তাত তেমন নেই। বরং রোদ বেশ মিঠেই লাগছিল । সারা বছর যদি এমন আবহাওয়া থাকত তো, পৃথিবীর সেরা জায়গা হত এই কলকাতা। কিন্তু তাতো হবার জো নেই। আগামীকালই এমন চড়া রোদ উঠবে যে, গায়ের ছাল-চামড়ায় ফোস্কা পড়ার দশা হবে। এসব ভাবতে ভাবতে ওরা যখন যাচ্ছিল, ঠিক সে সময় একটা ছোট্ট দোকানে চোখ গেল প্রসূনের। দামী সেন্ট, ইলেকট্রনিক্স ঘড়ি, ছাতা, এমন কি সুন্দর সুন্দর চপ্পলও নজরে পড়ল। মল্লিকার সুঠাম হাতটা ধরে প্রসূন বলল, 'এসো।'

ভদ্র, ইনটিমেট, চার্লি আরও কত রকমের সেন্টের শিশির দিকে চোখ বোলাল প্রসূন। একটা শিশি তুলে ধরে বলল, 'এটা আসল, না, খিদিরপুরের?'

দোকানদারের চোখেমুখে বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গি। বলল, 'তা তো আমরাও জানি না স্যার। তবে যাদের কাছে থেকে এসব কিনি তারা এ লাইনে পাকা লোক। বেশি দাম হলেও ঠকবেন না।'

'কত দাম এটার?'

'সাতান্ন টাকা। দু' বছরের বেশি চলবে ।'

'পঞ্চাশে হয় না।'

মল্লিকা ভুরু কুঁচকে বলল, 'মিছিমিছি এতগুলো টাকা খরচ করবে?'

প্রসূন হেসে বলল, 'অনিয়মের দিন না!'

মল্লিকা কথা বাড়াল না। দোকানদার রাজী হয়ে গেল ওই টাকাতেই। বলল, 'বিশ্বাস করুন স্যাব, দু' টাকা লাভ রেখে মালটা বেচলাম আপনাকে।'

প্রসূন শিশিটা খুলে এক প্রস্থ মল্লিকার গায়ে, নিজের গায়ে, এমন কি দোকানদাবের গায়েও স্প্রে করে দিল। সেন্টের মিষ্টি গন্ধে ডুবে গেল ওরা।

দোকানদার হি হি করে হাসছিল, বলল, 'আসলি মাল হলে, জামা কাপড় ধোযার পরও গন্ধ থাকবে।'

'তাই বুঝি।' মল্লিকার গলায খুশীর ঢেউ উপচে পড়ছিল।

দাম মিটিয়ে ওরা সামনের দিকে এগিয়ে গেল। একটা দোকানে গরম সিঙাড়া ভাজছে। মল্লিকা সিঙাড়ার খুব ভক্ত। প্রসূন বলল, 'চলবে নাকি?'

দোকানের ভেতর জায়গা নেই। বাইরে দাঁড়িয়েই ওরা সিঙাড়া আব মাটির ভাঁড়ে চা খেল। শুধু ওরাই নয়, আরো অনেকেই খাচ্ছিল। কেউ কারুর দিকে নজরও করছে না। এটা ভাল লাগল প্রসূনের। আরও একটু এগোতেই দু'পাশে সুন্দর সুন্দব আয়নার দোকান দেখতে পেল।

প্রসূন বলল, 'একটা আয়না কিনলে কেমন হয়? বাড়ির আয়নাটা আর চলে না। আয়নার সামনে দাঁড়ালে মনে হয়, আমি নই, অন্য কেউ বুঝি আমাকে ঠাট্টা করছে। তোমাব এবকম মনে হয় না?'

মল্লিকা উত্তর দিল, 'বললে বলে মনে পড়ল, নইলে ওটাই গা সওয়া হযে গেছে। চুন বালি খসা দেযালে তুমি আয়না রাখবে কোথায়?'

প্রসূন বলল, 'বাড়িওলাটা একের নাম্বারের তেঁয়েটে। মুখ মিষ্টি। পয়লা নম্বরের হারামজাদা। বলে কী জ্ঞান, আরও তিরিশ টাকা ভাড়া বাড়াতে হবে।'

মল্লিকা বলে, 'ঘরের তো ওই অবস্থা। সে কথা কী বলেছ ভদ্রলোককে?'

'ক্ষেপেছ? ও কথা বলে বিপদ ডেকে আনি আর কী। বললেই হয়তো বলবে, 'পছন্দ না হয়, ছেড়ে দিন।' ছাড়লেই দ্বিগুণ ভাড়ায় ভাড়াটে পেয়ে যাবে।

মল্লিকা প্রসূনের বক্তব্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই বুঝি চুপ করে গেল।

প্রসূন বলল, 'বাদ দাও। চলো, বরং গুপ্তধনের খোঁজটা আগে করে আসি।'

এবার গলায় বিরক্তির ঝাঁঝ তুলে বলল, 'সেই থেকে গুপ্তধন, গুপ্তধন করছো।'

হো হো করে হেসে ফেলল প্রসূন। একটা সিগারেট ধরিয়ে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'আগে চলই না; গেলে স্বচক্ষেই সব দেখতে পাবে। সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।'

মল্লিকা কথা বাড়াল না। প্রসূন লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোচ্ছে। ওর সঙ্গে সমানে হাঁটতে পারছিল না মল্লিকা। বলল, 'আর একটু আস্তে চল না?'

প্রসূন চলার গতি কমিয়ে দিল সামান্য। মল্লিকার গা ঘেঁষে চলতে চলতে বলল, 'দেখতে দেখতে বারোটা পার হয়ে গেল। গুপ্তধনের আখড়ার বাবুরা আর মাত্র ঘন্টা দুয়েক থাকবে। তারপর কে যে কোথায় সটকে পড়বে তার ঠিক নেই।' কথা শেষ করেই বাঁ দিকের গলি পেয়েই তাতে ঢুকে পড়ল প্রসূন। বলল, 'তাড়াতাড়ি এসো। ট্রামে করে বরং চলে যাই।'

মল্লিকা যে গোলকধাঁধায় সেই গোলকধাঁধাতেই রয়ে গেল। মুখে চোখে সামান্য বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। একটু এগোতেই ট্রাম রাস্তায় এসে পড়ল ওরা।

ট্রাম থেকে নেমেই মল্লিকা বলল, 'সামান্য এটুকুনের জন্যে মিছিমিছি পয়সা খরচ করলে।'

প্রসূনকে আজ খুশির মেজাজে পেয়েছে। বলল, 'ভুলে যাচ্ছ কেন, আজকের দিনটা তো অনিয়মের দিন।' কথাটা শুনে শুধু মুখ টিপে হাসল মল্লিকা।

লোটাস সিনেমার সামনে তখন তাণ্ডব চলছে। হলের সামনে বেশ কয়েক শ' লোক। ওদের অধিকাংশের বয়সই কুড়ির মধ্যে। সেখানে রঙীন প্রজাপতির মত নানান ধরনের পোশাক পরে বেশ কিছু মেয়ে রয়েছে। ভিড় কাটিয়ে উৎসুক ভঙ্গিতে ছবির নাম দেখে নিল প্রসূন।

ছবির নাম 'বে-আবরু'।

প্রসূন মল্লিকাকে শুনিয়ে বলল, 'চমৎকার নাম। বে-আবরু। হিন্দিওলারা বেশ নাম দিচ্ছে তো আজকাল।'

মল্লিকা হাসতে হাসতে বলল, 'হাম কিসিসে কম নেহি, আ গলে লাগ যা, প্রেম পূজারী, ধুল কী ফুল, এসব কী খারাপ নাম?'

হঠাৎ ওদের সামনে একজন চোঁয়াড়ে মার্কা ছেলে দাঁড়িয়ে বলল, 'টিকিট নেবেন নাকি?'

'না ভাই। সিনেমা দেখার সময় নেই।'

'দুটো বেড সিন আছে। ইংলিশ ছবিকেও হার মানায়। চার টাকার টিকিট আট টাকা দেবেন।'

প্রসূন বিরক্তির সঙ্গে ভুরু কোঁচকাল। বলল, 'অনেকেই তো ল্যা ল্যা করছে টিকিটের জন্য। ওদিকে যাও না।'

'দূর মশাই।' বলেই প্রচণ্ড তাচ্ছিল্যের ঢং-এ পাশ কাটিয়ে চলে গেল ছেলেটা।'

'বেযাদপ, বাস্টার্ড!' প্রচণ্ড রাগে আর ক্ষোভে ফেটে পড়ছিল প্রসূন।

মল্লিকা বলল, 'গালাগাল দিচ্ছ কেন? অনিয়মের দিনে এমনটা তো হবেই।'

প্রসূন বলল, 'ওদের অ্যাটিচুড তুমি বুঝবে না। তোমাকে খারাপ লাইনের ভেবেছে। দেখবে এসো।' বলেই মল্লিকার হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে সার বাঁধা রিকশাওলাদেব সামনে এসে দাঁড়াল। আমাদের দেখে ঘন্টা বাজাচ্ছে কেন বল তো?'

মল্লিকা বলল, 'এটা ওদের জীবিকা তাই!'

'মোটেই না। ওরা সব ব্রথেলেব টাউট। রিকশায় চাপলেই ওরা ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে যাবে। এ পাড়ায় দুপুরে রাত্তিরে বিস্তব ফাঁকা বাড়ি পাওয়া যায়। একবার ঢুকিয়ে দিতে পারলেই সওয়ারীর কাছ থেকে তো পয়সা নেবেই, তারপর বাড়িওলা'র কাছ থেকেও পয়সা ঝাড়বে।'

মল্লিকার গলা শুকিয়ে কাঠ। ফ্যাসফেসে গলায় বলল, 'এত সব তুমি জানলে কী করে?'

জানতে হয় বুঝলে। চোখ কান বুজে কলকাতায় বাস করা চলে না। সে সব পরে বলবো'খন। এবার চলো তো।'

দুটো বাড়ি ছাড়িয়ে তৃতীয় বাড়িতে ঢুকে পড়ল ওবা। দোতলায় উঠেই বাঁ দিকে এগিয়ে গেল। মল্লিকা দেখল, বড় বড করে আবাসন কথাটা লেখা। সবকারী প্রতিষ্ঠান। এবাব মুচকি হাসল।

মল্লিকাকে পাশে রেখে স্থির চোখে অফিসের ভেতরটা দেখছিল প্রসূন।

'কাকে খুঁজছেন'। একজন পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করল।

প্রসূন সরল সহজ ভঙ্গিতে উত্তর দিল, 'কাউকেই চিনি না, শুধু খোঁজ পেয়ে এসেছি।'

'ফ্ল্যাট? হবে না। তবে ওই যে টাকমাথা ভদ্রলোককে দেখছেন, বিভাসবাবু ওব নাম পারলে উনিই পাববেন।' কথা ক'টি বলেই ভদ্রলোক পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

প্রসূন সতর্ক চোখে সব কিছু দেখে নিয়ে মল্লিকাকে বলল, 'এবাব কিন্তু তোমাকেই একটু একটিভ হতে হবে গুপ্তধনের জন্য।

'কী রকম?'

প্রসূন ওর কানে কানে কী বলল।

কথাটা শুনে হাসি পেলেও নিজেকে সামলে নিল মল্লিকা। বলল, 'চেষ্টা করব। তবে কখনও তো এমন গোলকধাঁধায় পড়িনি।

ওরা দু'জনে খুব ধীর পায়ে বিভাসবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে ওঁর টেবিলের সামনে দাঁড়াল। স্তূপীকৃত কাগজের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছেন বিভাসবাবু। কিন্তু হলে হবে কী বড় সতর্ক মানুষ বিভাসবাবু। কাজ করতে করতেই মুখ না তুলে গম্ভীর গলায় বললেন, 'কী চাই?'

মল্লিকাই আগ বাড়িয়ে কথা বলল, 'নমস্কার বিভাসবাবু।'

নারী কণ্ঠে মাথা তুললেন বিভাসবাবু। বললেন, 'নমস্কার, কী ব্যাপার বলুন তো?'

মল্লিকা বলল, 'পরশু মিনিবাসে আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি।'

'কী শুনেছেন?'

'আপনাব চেষ্টা আব সহানুভূতিব জন্য এক ভদ্রমহিলা পূর্বাশায় ফ্ল্যাট পেয়েছেন।' মল্লিকাব

গলায় দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর।

হো হো করে হাসলেন বিভাসবাবু। পরক্ষণেই মুখের রেখা পাল্টে ফেলে সতর্ক চোখে চেয়ে রইলেন এদের দিকে। বড় করে নস্যির টিপ নিয়ে রুমাল দিয়ে নাক মুছে বললেন, 'জীবনে আমি কারুর কোন উপকার করিনি। ভদ্রমহিলা কী আপনার পরিচিতা?'

চট করে মল্লিকাও বলে ফেলল, 'না, না। দুজন ফ্ল্যাটের বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন। পেছনের সীটে আমি ছিলাম। সমস্যায় পড়েছি আমরাও। তাই ওদের কথা মন দিয়ে শুনেছিলাম।'

'কী করেন আপনি?'

মল্লিকা উত্তর দেয়, 'কিছুই জোগাড় করতে পারিনি, বি-এড পাস করে তিন বছর বসে আছি। ইনি আমার স্বামী, স্কুলমাস্টার। বোঝেনই তো একার রোজগার.....

'বিলক্ষণ জানি। ক'টি ছেলেমেয়ে আপনার?'

গাঢ় গলা করে উত্তর দিল মল্লিকা, 'নিঃসন্তান।'

এখন কোথায় থাকেন।'

'শ্রীমানী বাজারের কাছে, একটা ছোট্ট ঘরে। দিনে আলো জ্বালতে হয়। আমার হাজার রকমের অসুখ। ওঁর ডিওডিনাল আলসার।'

এবার বিভাসবাবু প্রসূনের দিকে চেয়ে বললেন, 'কোন স্কুলে পড়ান?'

প্রসূন স্কুলের নাম বলতেই চমকে গেলেন বিভাসবাবু। বললেন, 'অ্যাডমিশানের ব্যাপারে আপনারা খুব কড়া, তাই না?'

প্রসূন বলল, 'সরকারী স্কুল, তা একটু তো হবেই, তবে মোটামুটি ভাল ছেলে হলে পেয়ে যায় অনেকেই।'

বিভাসবাবু বললেন, 'দেখুন মশাই, এখনকার যুগটাই গিভ অ্যান্ড টেক পলিসিব।'

প্রসূন বিগলিত ভঙ্গি করে বলল, 'তা তো বটেই।'

'আমার নাতিকে ক্লাস ওয়ানে অ্যাডমিশান করে দিতে পারবেন?'

'এটা তো এপ্রিল মাস, সামনের বছরে চেষ্টা করে দেখব। আর পারি হঠাৎ যদি কোন ভেকান্সি হয় তা হলে।'

'চাকরির ভেকেন্সি হয় শুনেছি, অ্যাডমিশানের ব্যাপারেও ভেকান্সি আছে নাকি?' বলেই মুখ টিপে হাসলেন বিভাসবাবু।

প্রসূন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতেই বিভাসবাবু স্পষ্ট গলায় বললেন, 'তাহলে সামনের বছরেই আসবেন।'

মল্লিকা এবার করুণ গলা করে বলল, 'কিছু না দিতে পারলে, আমাদের মত মানুষরা কী করবে বলুন তো? শুনেছি, পূর্বাশায় এখনও টু-রুম ফ্ল্যাট খালি আছে আর সিংঘিবাগানেও। ভদ্রমহিলার কথা শুনে কেমন যেন বিশ্বাস হয়েছিল, আপনি ওই ভদ্রমহিলাকে যেমন উপকার করেছেন, আমাদের জন্যও কিছুটা করবেন। আমাদের অবস্থা একটু সহানুভূতিব সঙ্গে দেখলে চিরকালের জন্য আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।'

স্তূপীকৃত কাগজগুলো দেখিয়ে বিভাসবাবু বললেন, 'এর মধ্যে শতকরা নব্বুইটাতেই বাঘা বাঘা লোকের রেকমেন্ডেশান রয়েছে। তাছাড়া পার্টির সুপারিশ তো আছেই। ঘেন্না ধরে গেল মশাই।'

প্রসূন কথার খেই ধরে বলল, 'অ্যাডমিশানের ব্যাপারেও আমাদের অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়। ষাটটা সীটের মধ্যে পঞ্চাশ জনেরই হয় সুপারিশে। আই ওয়াশ দেয়ার জন্য দশজন বাইরের সুযোগ পায়। এবার আমার ছোট ভাইয়ের ছেলের জন্য চেষ্টা করেছিলাম। হয়নি। বাড়ির কেউ বিশ্বাসই করে না যে, আমি চেষ্টা করেছি। বিশ্বাস করুন হেড মাস্টারের পায়ে ধরতেই খালি বাকি রেখেছি। মাঝখান থেকে বাড়িতে আমরা অস্পৃশ্য হয়ে গেলাম। কী যে কষ্ট বোঝাতে পারব না।' একটুক্ষণ থেমে সুর পাল্টে প্রসূন বলল, 'জানেন বিভাসদা, বাড়িতে হইচই চলছে, আমাদের দেখেই সবাই স্পিক-টি নট। মেজবউদিকে তো একদিন বলতেই শুনলাম, 'নিজের ছেলে হলে ঠাকুরপো কী না করে পারত? কী করি বলুন তো, বিভাসদা?'

বিভাসবাবু কেমন যেন পাল্টে গেলেন। গাঢ় শ্বাস ফেলে বললেন, 'এ রকম অভিজ্ঞতা আমারও আছে। নিজে থাকি মদন দত্ত লেনের এঁদো গলিতে, নিজেব জন্য যে কিছু করবো, তার উপায় নেই। ছেলেমেয়ে বউ সব আমাকে নিয়ে উপহাস করে। আমি নাকি ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। সহ্য করতে পারি না। আবার ওদের যে বুঝিয়ে বলব, তারও উপায় নেই। ছোট ছেলেটা তো একদম বকে গেছে। নেশা করে রাতদুপুবে বাড়ি ফেরে। ফ্ল্যাট পাইয়ে দেবে বলে আমার নাম করে একজনের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা বেমালুম লোপাট করে দিল। কী লজ্জা! কী লজ্জা!'

ফাঁক পেয়ে মল্লিকা প্রসূনকে দেখিয়ে বলল, 'আর ও তো অপদার্থ সাবজেক্টের টীচার। বাংলা পড়ায় বলে, কোন টিউশানও পায় না। সকলেই ভাবে বাংলার লোক ইংরাজির কী জানে। অথচ, শুনলে অবাক হবেন, ওরই দু'খানা অনুবাদের বই বেশ রমরম করে চলে। এ যাবৎ ও দুটো বই থেকে সাড়ে সাতশ টাকা রোজগার করেছে।'

প্রসূনের দিকে আপাদমস্তক দেখলেন বিভাসবাবু। বেশ সমীহ [illegible]ই বললেন, 'আপনি বাইটার। একথা আগে বলতে হয়'।'

প্রসূন মাথা নিচু করে বলে, 'কাউকেই বলি না। বড় লজ্জা হয়, গ্লানি বাড়ে।'

বিভাসবাবু বললেন, 'ছেলেবেলায় আমারও সাহিত্য বাতিক ছিল। সব যে কোথায় মিলিয়ে গেল, কে জানে।' কথা শেষ কবেই পেপার ওয়েট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

বিভাসবাবুর টেবিল ঘিবে অদ্ভুত এক নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সকলেরই সংলাপ শেষ হয়ে গেছে। তাই অসম্ভব নৈঃশব্দ বিরাজ করছে। মাথার ওপরে বনবন করে পাখার শব্দই শুধু হচ্ছিল। সমস্ত নিস্তব্ধতাকে চুরমার করে বিভাসবাবু বললেন, 'এই ফর্মটা নিয়ে যান। ফর্ম ফিল আপ করে দিয়ে যাবেন; ডেটটা মেনশান করবেন না। ফর্ম জমা দিয়ে আব এমুখো হবেন না। পারলে মদন দত্ত লেনের বাড়িতে যাবেন। এই নিন আমার বাড়ির ঠিকানা।'

বিভাসবাবুর আচরণে অভিভূত হয়ে গেল দুজনই।

বাইবে বেরিয়েই দেখে, আকাশে থমথমে মেঘ। এক্ষুণি হয়তো ভেসে যাবে কলকাতা। ঘড়িতে

সময় দেখল, একটা দশ। দ্রুত পায়ে ওরা ফিরতি ট্রামে এসপ্ল্যানেডে এল। আর যতটা সম্ভব দ্রুত পায়ে আমেনিয়ার দিকে এগিয়ে গেল।

দোকানে ঢুকতেই খাবারের গন্ধে ওরা টের পেল খিদে পেয়েছে। সামনে একটাও বসবার জায়গা না পেয়ে ওরা ভেতরে গেল। একটু এগোতেই খালি কেবিন পেয়ে গেল। মুখোমুখি বসে ওরা পরস্পরের দিকে বিস্ময় বিহ্বল চোখে দেখছিল।

উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে মল্লিকা বলল, 'ফ্ল্যাট আমরা পেয়ে গেছি; এটা জোর গলায় বলতে পারি।'

'আমারও তাই মনে হয়।' প্রসূন বলল। কথা শেষ করে স্থির চোখে মল্লিকাকে নজর করে বলল, 'তুমি যে এত পাকা অভিনেত্রী তা কিন্তু আগে জানতাম না।'

মুখে লালচে আভা নিয়ে মল্লিকা চুপ করে আছে দেখে হো হো করে হেসে উঠল প্রসূন। বেয়ারা এসে পড়ল হাসির মাঝখানেই। চিকেন কালিয়া আর বিরিয়ানির অর্ডার দিয়ে শরীরটাকে এলিয়ে বেশ কায়দা করে সিগারেট ধরাল প্রসূন।

'মিনিবাসের ব্যাপারটা তোমার মাথায় এল কি করে?' প্রশ্ন করল প্রসূন।

মল্লিকা অকপটে বলল, 'সে কী ছাই আমি জানি। কেন যেন মনে হল, লোকটা যদি জিজ্ঞেস করে বসে, কী করে জানলাম, তো ধাঁ করে মাথায় বুদ্ধিটা খেলে গেল।' একটানা কথা বলে রিন রিন শব্দে হাসল মল্লিকা। তারপর বলল, 'আর তুমি? তুমিই কী কম বড় অভিনেতা। বাপের একমাত্র ছেলে তুমি; আর সাত কাহন করে একান্নবর্তী সংসারের কথা গড়গড় করে বলে গেলে। আর শেষটা তো ক্লাইম্যাক্সে নিয়ে গেলে। দুম করে বিভাসবাবুকে বিভাসদা বানিযে দিলে। সত্যি তোমার তুলনা নেই।'

বেয়ারা খাবার দিয়ে গেল। ওরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপই কবছিল না। ওরা হেসেই যাচ্ছিল। এত হাসি আর এত মজা যে ওদের জীবনে সঞ্চিত হয়েছিল, তা যেন এই প্রথম টের পেল।

খাওয়া সেরে বিল মিটিয়ে দিতে গিয়েই প্রসূন হিসেবি হয়ে গেল। পকেট থেকে খুচরো পঞ্চাশ পয়সা বের করে টিপস্ দিল বেয়ারাকে।

মল্লিকা বলল, 'এক টাকা দিলে পারতে। অনিয়মেব দিন কিনা!'

প্রসূন সে কথায় সামান্য হেসে মল্লিকার হাত ধরে রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়েই ঘড়িতে চোখ রাখল। দুটো কুড়ি। এখনও চেষ্টা করলে কোন শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে মোটামুটি তিন ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারবে ভেবে, ও সামনের সিনেমা হলের থিকথিকে ভিড়ের মধ্যে মল্লিকাকে নিয়ে সেঁধিয়ে গেল। ওদের কাছে আজ যেন লুকোন আছে একটা আশ্চর্য প্রদীপ। প্রদীপের দৈত্যটা যেন ওদের মনের সব কিছু সামনে এনে হাজির করছে।

সিনেমা হলের সিঁড়ির ধাপে প্রসূন সুমধুর এক নারীকণ্ঠের ডাক শুনতে পেল।

মল্লিকা বলল, 'এই, তোমাকে বোধহয় কেউ ডাকছে।'

প্রসূন বলল, 'এ নামে আরও কতজন থাকতে পারে।'

'ধুত! এ নামটা শুধু তোমারই, আর কারো থাকতে পারে না।'

'থাকলে কী করবে?'

'বলবো নামটা পাল্টাতে। এ নামটা শুধু আমারই জন্য', মল্লিকা সহাস্যে উত্তর দেয়।

ঠিক সে সময় ভিড় ঠেলে একজন মহিলা এগিয়ে এসে প্রসূনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, 'বাব্বা! এত ডাকছি, শুনতেই পাও না যে?'

প্রসূন চিনতে পারল সঙ্গে সঙ্গে। শুক্লা সেন। সুগন্ধি ফুলের মতন স্মিত মুখে দাঁড়িয়ে। এতগুলো বছর কেটে গেছে তবু শুক্লার এতটুকু চেহারার পরিবর্তন নেই দেখে, আশ্চর্যও হল কম না। অপলকে মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুমি একা, না সঙ্গে তোমার উনিও আছেন?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে শুক্লা মল্লিকার দিকে চেয়ে বলল, 'তোমার বউ বুঝি?'

'কেন ভাগানো বলে মনে হচ্ছে বুঝি?'

'তা তুমি পার। পি. জি.-র এমারজেন্সীর গেটের সামনে যা কাণ্ড করেছিলে মনে আছে?'

'মনে নেই আবার।' প্রসূন পূর্ব স্মৃতি স্মরণ করে হাসল।

মল্লিকা কৌতূহল চেপে রাখতে পারছিল না। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছিল বলুন তো?

শুক্লা সুস্মিত ভঙ্গি করে বলল, 'বলতে পারি। তবে একটা শর্তে।'

'শর্তটা কী শুনি?'

'শুনলে প্রসূনকে ভুল বুঝতে পারেন, তাই সঙ্কোচ হচ্ছে।'

মল্লিকা টানটান ভঙ্গিতে বলল, 'কথা দিচ্ছি, ভুল বুঝবো না।'

প্রসূনকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা বলুন তো ভাই, কোন প্রেমিক কী তাব প্রেমিকাকে হাসপাতালের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে বলতে পারে? প্রসূন কিন্তু পেরেছিল।'

প্রসূন মল্লিকার সামনে সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করল, 'ন্যাচারেলি। পকেটের তখন যা অবস্থা, সিনেমা হলেব সামনে ডাকার সাহস ছিল না।'

মল্লিকা আর শুক্লা সে সময় পবস্পবের দিকে বহস্যঘন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তারপব মল্লিকা হাল্কা গলায় শ্লেষ মিশিয়ে বলল, 'আপনার বন্ধুটি তার যোগ্য জায়গাই বেছে নিয়েছিল, কী বলেন?'

খোঁচাটা গায়ে মাখলো না শুক্লা। নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে অপূর্ব লাস্য ফুটিয়ে বলল, 'কিন্তু প্রসূনের মন্দ কপাল। তাব আগেই আমি পরিমলেব সঙ্গে এনগেজড হয়ে গেছি। খুব দুঃখ পেয়েছিলে, তাই না প্রসূন?'

প্রসূন ঋজু ভঙ্গিতে উত্তর দিল, 'কান্নাকাটি করেছিলাম কিনা মনে নেই। কিন্তু তুমি কি বলেছিলে মনে আছে?'

'নাহ্।' সে সব একদম ভুলে গেছি।'

মল্লিকা দুম করে বলে ফেলল, 'কিছুই ভোলেননি আপনারা। ভুললে এত কথা বলতে পারতেন না।'

শুক্লা কথা ঘোরালো। ঘড়িতে সময় দেখে খুব ব্যস্ততার সঙ্গে বলল, 'ওঁর আসাব কথা ছিল। কিন্তু মনে হচ্ছে, কাজে আটকে গেছে। আর আসতে পারবে না। আমি আট টাকা করে ব্ল্যাকে টিকিট কিনেছি। নেবে তো নাও।'

প্রসূন বলল, 'তুমি পারও বটে। তিন টাকা নব্বুয়ের টিকিট আট টাকায়। নীতিতে বাঁধছে। ঠিক আছে দাও। ব্ল্যাকার তো নও। দাও।' প্রসূন টিকিট দুটো হাতে নিয়ে ষোল টাকা এগিয়ে দিল শুক্লার দিকে।

শুক্লা টাকা ক'টা নিয়ে ব্লাউজের ভেতরে গুঁজে দিয়ে মল্লিকার দিকে কটাক্ষে তাকিয়ে হনহন করে ভিড় কাটিয়ে চলে গেল।

সিনেমা হলে প্রথম বেল বাজল। মল্লিকার সঙ্গে প্রসূনের দৃষ্টি বিনিময় হতেই মল্লিকা শ্লেষের গলায় হাসল, 'আজকের অনিয়মটা চূড়ান্তই হল দেখছি।'

একজন অপরিচিত লোক ওদের পাশে এসে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলবো?'

প্রসূন বলল, 'নিশ্চয়ই বলুন।'

লোকটা বলল, 'আপনাদের কথাগুলো শুনেছি বলেই বলছি, আপনি কিন্তু ঠকেছেন।'

'তার মানে?'

লোকটা বলল, 'ওই ভদ্রমহিলা একদিন আমার কাছেও ঠিক ওই একই কথা বলে টিকিট বিক্রি করেছিল। সেদিনও কিন্তু আপনাদের মতই আমারও মনে হয়েছিল, উনি ব্ল্যাকার নন। কিছু মনে করবেন না, চলি।' লোকটা চলে গেল।

হলের শেষ বেল এবার বাজল। প্রসূন আর মল্লিকা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সিঁড়ির গোড়ায়। মল্লিকা হঠাৎ ক্ষুব্ধ গলায় বলল, 'মিথ্যেবাদী।'

'কে?' প্রসূন দুর্বল গলায় বলে।

মল্লিকা উত্তর দিল না। প্রসূনের হাত থেকে টিকিট দুটো টেনে নিয়ে কুচি কুচিকরে ছিঁড়ে ফেলে দিল।

সূর্য চলে গেলে

লীলাবতীর সকাল থেকেই মন খারাপ। রান্নাঘরে সেই কোন সকালে ঢুকেছে, টুকটাক কাজ, এটা ওটা করেই যাচ্ছে মুখ বুজে। অন্যদিন এত বেলা অব্দি মুকুন্দকে শুয়ে থাকতে দেখলে, কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারতো না ও। কিন্তু আজ এখন পর্যন্ত একটা কথাও মুখ ফসকে বেরিয়ে আসেনি লীলাবতীর। মাথার নিচের বালিশ সরিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শবাসনের ভঙ্গিতে শুয়ে থেকে থেকে লীলাবতীর কথা ভাবল অনেকক্ষণ মুকুন্দ। হিসেব করে দেখল, এই মাঘে পঞ্চাশে পা দিল ও। আর লীলাবতী? চল্লিশ থেকে বছর পঁচিশের যে কোন একটা কিছু ভাবা চলে ওর সম্পর্কে। মুকুন্দ বুঝতে পারল, লীলাবতী মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে কেন? সূর্যকে নিয়ে কলকাতার বাবুরা গতরাতে চলে গেছে। মাস-খানেকের কাজ। কাজ শেষ হলেই ফিরে আসবে সূর্য, আলোঝলমল একখানা মুখ নিয়ে। গৌরবে, গর্বে উন্নত সূর্যকে ঠিক এই মুহূর্তে চোখের সামনে দেখতে পেল মুকুন্দ। বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়েও সারা শরীরে কেমন যেন এক অবসাদ এই প্রথম টের পেল। অথচ, অন্য-অন্য দিন সেই কোন রাত থাকতে উঠে বেরিয়ে যেতো, লীলাবতী ঘুম চোখে উঠে দরজা বন্ধ করে ফের এসে শুয়ে পড়ত। পাশের ঘরটা সূর্যের। সারস পাখির মত ঘাড় উঁচু করে প্রায় রোজই মুকুন্দ সূর্যর ঘরটায় উঁকি দিয়ে যায়। রোজই এক দৃশ্য ওর চোখে পড়ত। ছোট্ট তক্তোপোশটায় কোণাকুণি বিভোর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে সূর্য। ওর অমনধারা ভঙ্গি দেখে না হেসে পারে না। চোখে পড়ে, মাথার বালিশ দু-পায়ের মাঝখানে রেখে শরীরটাকে ধনুকের মত বেঁকিয়ে পরম প্রশান্তিতে ডুবিয়ে রাখে যেন সূর্য। তা দেখে মনের অবসাদ যায় দূর হয়ে, খুশীর পাখনা মেলে দ্রুত পা ফেলতে ফেলতে কারখানার দিকে এগিয়ে যায় মুকুন্দ। কিন্তু আজ? আজ সারা বাড়িটা জুড়েই যেন এক নৈঃশব্দের শীতলতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এইবার নিজের মনটাকে হাতড়ে দেখবার চেষ্টা করল মুকুন্দ। দেখল, সূর্য নেই, মাত্র তো এক রাত্তির! বুকের মাঝখানটা কেমন যেন একটা চিড়, কেমন যেন একটা ফাঁকা গহ্বর রচিত হয়েছে। ভাবতেই মনটা মুহূর্তের মধ্যে ভীষণ অসহায় হয়ে উঠল মুকুন্দর। কেমন একটা জ্বোরো ভাব মেজাজটাকে তিরিক্ষি করে দিতে লাগল। ঠিক সেই সময় পাশের মিলটায় কাজের ভোঁ বাজলে পর একমুহূর্তও আর শুয়ে থাকতে মন চাইল না মুকুন্দর। বিছানা ছেড়ে উঠে পাতকুয়োর দিকে ধীরে ধীরে এগোল। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যেতে গিয়েই দেখল, লীলাবতীর চোখ দুটো ভীষণ ফুলো, সারা শরীরের রক্ত মুখে উঠে এসেছে এই রকমের মুখ নিয়ে চুপচাপ বসে আছে।

মুখে হাতে ভাল করে জল ছিটিয়ে কাঠ-কয়লার খণ্ডটুকরো কুড়িয়ে নিয়ে দাঁত মুজল মুকুন্দ। এক সময় রান্নাঘরের ভেতর ঢুকে ছোট্ট পিঁড়ি টেনে নিয়ে লীলাবতীর মুখোমুখি বসে জিজ্ঞেস করল, 'শরীলটা আইজ খুব বেজুত ঠকে গো সূয্যির মা, তা তোমারও শরীলটা ক্যামুন খারাপ ঠেকতিছে?'

লীলাবতী সে সবের উত্তরে না গিয়ে হাত বাড়িয়ে মুকুন্দর কপালে ঠেকায়। অস্ফুটে বলে, 'না, জ্বর নাই।'

'চট করে এট্টু চা বানাও দিকি। ফের শালা, ডাক্তারের কাছে যাইয়ি সাট্টিফিটি জোগাড় করতি হবে।'

লীলাবতী বলে, 'একদিনের জন্যি কি সাট্টিফিটি লাগে নাকি?'

'আর কইয়ো না; শালার কি যে হতিছে, কিছুই বুঝি না। আজ এটা দাও, কাল ওটা লাগবি। গরমেন্ট মাইনসেরে নিয়ে কী যে তিন্নানাচন নাচতিছে না, কী কব।'

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে একটু উত্তাপ পেয়ে খুশী মনে বলে উঠল মুকুন্দ, 'সূয্যিটা নাই, সারা বাড়িটা কীরকম শ্মশান শ্মশান বোধ হতিছে।' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ফের বলতে থাকে মুকুন্দ, 'বুঝলে সূয্যির মা, ও খুব একজন মানিগণ্যি মানুষ হবে বলে দিলাম। তুমি দেইখে নিও।'

লীলাবতী নিজেও সামান্য চা নিয়েছিল। পেয়ালাতে ছোট্ট করে একটা চুমুক দিয়ে কেমন ফ্যাকাশে চোখে তাকাল মুকুন্দর দিকে। 'বুঝ্‌লা, আমার খুব ভয় করতিছে', ধীর গলায় বলে উঠল লীলাবতী।

ওকে আশ্বস্ত করবার জন্যই যেন বলল মুকুন্দ, 'না-না, ভয়ের কী আছে। সূয্যি তো আর বোকা হাবলা না...' বলেই উজ্জ্বল এক জোড়া চোখে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে লীলাবতীর দিকে।

'তুমিও তো কম চালাক ছিলা না; বুদ্ধি তো তোমার ঘটেও ছিল, সেই তুমিও তো...'

লীলাবতীর কথাটাকে শেষ করতে দিল না মুকুন্দ, বাধা দিয়ে বলে, 'জানো সূয্যির মা, গেরামদেশের মানুষ আর শহরের মানুষ, তার তফাৎই অনেক। আর তা ছাড়া, সূয্যি আমাদের নেখাপড়া শিখিছে, মুখ্যুরে ঠকায় সবাই। কিন্তু আমাদের সূয্যিরে.... না না, ও তুমি অকারণ চিন্তা করতিছ।' কী মনে করে উঠে পড়ল মুকুন্দ।

লীলাবতী ধীর গলায় শুধোয়, 'তা তুমি কি চল্‌লা নাকি এখনই ডাক্তারের ওখানে?'

'ক্যান, কও দিকি।'

'এট্টু বাজারে যাতি হবে, চাইল রইয়েছে। ডাইল, তরকারি কিছু নাই।'

'তা এট্টু আগে কতি হয়।'

সে কথায় লীলাবতী গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, 'সূয্যি থাকলি তো কথাই ছিল না-- না পারো আমিই যাই।'

মুকুন্দ নরম হয়ে গেল মুহূর্তে। এক মুখ হাসি নিয়ে বলে, 'কোন দিন কবা, তুমিই ঘরে রান্দোবাবো, আমি কারখানায় কাম করতি যাই।' বলেই প্রাণখোলা হাসি হাসল মুকুন্দ।

লীলাবতীর এতক্ষণের থমথমে গম্ভীর মুখটায় এই প্রথম হাসির রেখা দেখা দিল। মুকুন্দর দিকে অনেকক্ষণ অপলকে চেয়ে থেকে বলে, 'একবার আয়নায় নিজের মুখটা দ্যাখো দি'নি। এত বড় বড় দাড়ি দেখলি, উত্তবালির জগা পাগলা বলি ভুল হয়।'

মুকুন্দ পিঁড়িটাকে টেনে লীলাবতীর আরও কাছে এগিয়ে গেল। অনেক দিন পর এমন মুখোমুখি বসা, ঘরে সূর্য নেই; তাই বুঝি মুকুন্দর বুকে কিসের একটা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ওঠে। ডান হাতটা বাড়িয়ে লীলাবতীকে ছুঁয়ে বলে, 'তোমার মুখ দেখলিই বুঝি আমি ক্যামুন আছি। তোমার চোখে সুখ-দুঃখের ছায়া দেখতি পাই।'

কপট রাগে গম্ভীর হয়ে ওঠে লীলাবতীর গলা। 'যাও ঢং করতি হবে না। নাপতা ডাকি খেউরি করগে যাও।'

ঝাঁক ঝাঁক ছেলেমানুষি ভিড় করতে থাকে সে সময় মুকুন্দর মাথায়। বলে, 'ভরা জেবন রাখতি পাবি সোহাগ দিলি পর, আহাহা, কত দিন সোহাগ দ্যাও না হলি কি তুমি পর?'

রহস্যময়ীর মতো তাকায় লীলাবতী। অকারণেই কিনা কে জানে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে।

মুকুন্দ বলে, 'হ্যাঁ গো, সূয্যির মা, মনে পড়ে, সেই, সেই সব দিনগুলার কথা। তুমি সারাদিন বাপ্তোবারো, আমি সারাদিন কাম করি, গায়ের ঘাম ঝরায়ে শুকনা মাটি নরম করি, বাড়ি আলি পর পাখার হাওয়ায় শেতল কর আমার শরীল-মন, মনে পড়ে সেই সব দিনের কতা।'

সে কথায় মনের চোখে অনেক ছায়া পড়ে লীলাবতীর। সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে।

এককালে পদ্মফুলের পাপড়ির মতো ঠোঁট দুটোর দিকে নজর পড়ে মুকুন্দর। দেখে সে ঠোঁটে লাবণ্য নেই, কেমন খরখরে শুকনো। চোখের কোণে কালসিটে দাগও এড়ায় না তার। আর মুহূর্তে দাউ দাউ করে ওঠে বুকের ভেতরটা— কেমন সব হারানোর বেদনায় অস্থির হয়ে পড়তে থাকে। তবু সব কিছুকে অস্বীকার করে বলে, 'যাই কও সূয্যির মা, বিয়ার আগের দিনগুলা বড় মধুর ছিল। ছিল কিনা কও?'

লীলাবতী বলে, 'সেই ছল করি তুমি জল খাতি আসতা মোদের বাড়ি।' বলেই খিলখিল করে হাসল। কিছুক্ষণ পর ফের বলতে থাকে, 'খরগোসের মত তোমার চোখের মণি এদিক-ওদিক বন্‌বন্ কইরে ঘোরতো। এই বুঝি ধরা পড়, এই বুঝি সব্বনাশ হইয়ে গেল, এমনভাব...'

'যাই কও, তোমার বাবা বড় নিদ্দয় ছিল। কী খাটানোই না খাটাইতো, সারা দিন খাটলি পর দ্যাড়টা টাকা দিত, তাও কত দরকষাকষির পর, কও তোমার বাবা নিদ্দয় ছিল কিনা, কও?'

লীলাবতী বলে, 'তা জানি না। তবে বাবা তোমারে খুব স্নেহ কইরতেন।'

'স্নেহ কইরতেন না ছাই। আসলে তুমি না থাকলি, আমি কবে অন্যত্র চলি যাতাম।'

সে কথায় হি হি করে হাসল লীলাবতী। বলে, 'জানো, বাবা বোধ হয় বুঝতি পাইরেছিল।'

'তা আর পাইরবেনা। লোক ঠকাতি ঠকাতি চোখ জোড়া পাকা কইরে ফেইলেছিল তোমার বাবা, হাসল মুকুন্দ। কিছুক্ষণ পর কী মনে করে ফের বলতে থাকে, 'যাই বল না ক্যান ওই যে বলে না, কারো সব্বনাশ কারো পৌষ মাস, আমারও হইয়েছিল তাই... ভাগ্গিস পাকিস্তান হইয়েছিল, নইলে তো তোমার বিয়া হইত ওই শালা তাড়িখোর পরান মণ্ডলের সঙ্গে।'

লীলাবতী উত্তর দেয়, 'ভালই হইত। পাটরাণী কইর়ে রাখতো পরান মণ্ডল, জানো তার কত ট্যাকা।'

সে কথায় ভীষণ রেগে গেল মুকুন্দ। বলে, 'অমন ট্যাকায় আমি পেচ্ছাব করি। ও শালা পরান মণ্ডল আগের জন্মে শকুন ছিল।'

মুকুন্দকে রাগতে দেখে লীলাবতীর কেন যেন ভালই লাগল। ও আরও রাগুক, এটাই যেন দেখতে চায় সে। বলে, 'শকুনই থাউক আর খচ্চবই থাউক ও কেষ্ট বর্মণের মাইয়ারে তো মাথায় কইরা রাখছে—কত গয়না, কত শাড়ি।'

মুকুন্দ লীলাবতীর চোখে চোখ রেখে বলে, 'আর তোমারে আমি পায়ে ঠেলিছি না।' চুপ করে গেল মুকুন্দ। স্থির চোখে দূরের আকাশটার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। পরে নিজের মনেই বলতে থাকে, 'সত্যি সূয্যুর মা, তোমারে আমি এট্টুও সুখ দিতে পারি নাই; ভাবলি পর মাথাডা আমার গরম হইয়ে যায়। দেইখো সূয্যু বড় হলে আমাদের দুঃখ কষ্ট বইলে কিছু থাকবে না।'

মুকুন্দর দিকে পরম মমতায় তাকাল লীলাবতী। অনেক দিন পর ওর প্রশস্ত বুকে সেই অনেককাল আগেকার মত ভঙ্গিতে মাথা রাখতে ইচ্ছে হল। কিন্তু কেমন যেন দ্বিধা সঙ্কোচে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে থাকে। পরে ধীর শান্ত গলায় বলে, 'কার সাথে কার তুলনা। পরান মণ্ডল হচ্ছে গিয়ে ভাগাড়ের শকুন, আর তুমি, তুমি হচ্ছোগে ওই আকাশের সূয্যিব বাবা—' মুহূর্তেই সব সঙ্কোচ দূর হয়ে গেল লীলাবতীর। মুকুন্দর বুকে মাথা রেখে বলে, 'সূয্যু তাড়াতাড়ি ফিরলি বাঁচি।'

তাড়াতাড়ি ফেরা দূরের কথা, পাঁচ মাস পার হয়ে ছ'মাসে পড়ল, সূয্যুর সঠিক কোন সংবাদই পেল না মুকুন্দ। সেই বোশেখ মাসে কলকাতায় বাবুদের সঙ্গে চলে গেল ও, কলকাতায় পৌঁছে মাত্র একখানা পৌঁছ সংবাদ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই দেয় নি। এখানকার যে যখন কলকাতায় যায়, মুকুন্দ তাদের সঙ্গে দেখা করে, সূর্যর খোঁজ নিয়ে আসতে বলে, কেউ বলে, 'সময় পেলে খোঁজ নেবো।' কেউ বলে, 'মুকুন্দ তুমি তো বড্ড ছেলে ন্যাওটা, সূর্য কি তোমার বোকা হাবলা ছেলে যে, হারিয়ে যাবে।' কথাগুলো শুনে মুকুন্দর চুপসে যাওয়া মন মুহূর্তের জন্য কিসের গর্বে ফুলে ওঠে, ধূসর বিবর্ণ মনের আকাশে রং-বেরং-এর প্রজাপতি পাখনা মেলে উড়তে শুরু করে। কিন্তু সেই সুখের আবেগ বেশীক্ষণ তার মনে স্থির থাকে না। লীলাবতীর সপ্রশ্ন চোখের মণি দুটো হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ অসহায় বোধ করতে থাকে মুকুন্দ।

তবুও নিজেকে ধরা দেয় না। সহজ হাসি-খুশীভরা মন নিয়ে ঋজু পায়ে বাড়িতে ঢোকে মুকুন্দ। বেশ কিছু দিন ধরেই লক্ষ করেছে ও, লীলাবতী এখন আর আগের মত আচরণ করে না, ছুটে এসে সূর্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে না। কঠিন মুখ তুলে চেয়ে থাকে। বুকের ভেতরটা ছাত ছাত করে ওঠে মুকুন্দর। কিভাবে যে প্রলেপ দেয়া যায় সে ভাষা জানা নেই তার। তাই ইচ্ছে করেই কারখানা থেকে দেরি করে বাড়ি ফেরে, কোন কোন দিন একা একা এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে বাড়ি আসে। নয়তো বা কোন কোন দিন বুড়ো বটতলায় একাকী নিঃসঙ্গ সময় কাটায়।

আর লীলাবতী অকারণে ঘর-বার করে। বাড়ির পাশের কাঁটাগাছ ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল সাফ করে। ছোট খুপরি হাতে নিয়ে বসে উত্তরের দিকের ছোট্ট জমিটার মাটি খোঁড়ে। দেখতে দেখতে সূর্য মাঝ আকাশে উঠে এলে পর বাঁ হাতের চেটো দিয়ে চোখ ঢেকে এদিক-ওদিক কী যেন খোঁজে।

মুকুন্দ বাড়ি এলে পর লীলাবতী জিজ্ঞেস করে, 'তোমাব কী হয়েছে, কও দি'নি? বোজ রোজ রাইত হয় ফিরতি?'

ফ্যাকাশে হাসে মুকুন্দ। বলে, 'ওভারটাইম হতিছে জোর। এই সুযোগ হাতছাড়া কবতি নাই।'

'ক্যান, এত ওভারটাইমের ধুম লাগল ক্যান? দ্যাশে কী আর জন-মুনীশ নাই?'

সে কথায বিজ্ঞের হাসি হাসল মুকুন্দ। বলে, 'নতুন লোক নিতি গেলি অনেক হ্যাপা, তাই... ও তুমি বোঝবা না।'

লীলাবতীর দু' চোখের সাদা জমিতে জল টলটল করে। মুখে কিছুই বলে না। কোন কথাব মধ্যে না গিয়ে আপন মনেই ঘর গুছোতে শুরু কবে।

মুকুন্দ বলতে থাকে, 'চলো না, কইলকাতায গিয়ে সূয্যুর খোঁজ করে আসি।'

কথাটা কানে যেতেই ঘুরে দাঁড়াল লীলাবতী। মুকুন্দ দেখল, লীলাবতীব ঠোঁট দুটো কেমন যেন থিবথিব করে কাঁপছে। ঘন-কালো চোখের পাতা দুটো দেখতে দেখতে ভিজে গেল। মুকুন্দ এগিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়াতেই, লীলাবতীর বুকের মাঝখানটা কি বকম যেন গুবগুব কবে উঠলো প্রথমটায়, তারপর কী বকম সরু চিকন শব্দ বেব করে কেঁদে উঠলো।

মুকুন্দ এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। কোত্থেকে একজাতীয় অসাধাবণ শক্তি ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সারা শরীরের মাংসপেশীগুলো অসম্ভব শক্ত হয়ে উঠলে পব লীলাবতীকে ধমক দেবার সুরে বলে, 'বলি এ সব কী হতিছে, অ্যাঁ?' কথা নাই বাত্রা নাই ছ্যাক ছ্যাক কবে কান্দনের কী হলো। দ্যাখো, ওই সব ফ্যাচফোঁচ আমার ভাল লাগে না, হ্যাঁ।'

লীলাবতী শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে. 'চলো খাতি চলো।'

মুকুন্দ কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না। ধীর পায়ে ওকে অনুসরণ করতে গিয়েও কিসের এক বাধায চুপ করে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রান্না ঘরে গিয়ে রুটি তরকারি ও জলের গেলাস ঠিক করে মুকুন্দর অপেক্ষায় বসে রইল লীলাবতী। দূরে কিসের একটা শব্দ হতেই গাছের ডালে বসে থাকা কাকগুলো একযোগে কা কা করে উঠলে এক ধরনের অস্বস্তিতে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে যেতে থাকল। সূর্যর কথা বারবার মনে আসতে লাগল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ঠেলে বেরুলো। বার দুই সূর্যর নামটা নিজের অজান্তেই উচ্চারণ করে ফেলতে থাকে সে। এক এক সময় মনে হয়, এই বুঝি সূর্য এসে হাজির হয়।

মুকুন্দ এসে বলে, 'কিছু মনে করো না সূয্যুর মা। মাথাডার মধ্যি কী রকম যেন সব চিড়িক পাড়ে। কী বলতে কী বইলে ফেলি।'

লীলাবতী নিরুত্তর বসে থেকে কেবল শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে মুকুন্দর দিকে।

রুটি আর তরকারি কোন রকমে খামচা খামচি করে খেয়ে পর পর দু গেলাস জল খেল সে। তারপর ধীর শান্ত গলায় বলে, 'নানাজন নানান কথা কয়, শুনে মনটা দিন দিনই ' কথাটা

শেষ করতে পারে না ও। কেমন যেন এক ধরনের যন্ত্রণা আর বিরক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে থাকে সে সময়। 'শালার নরেন শা' বলে কিনা, সূয্যু কইলকাতায় মেয়েছেলের পাল্লায় পড়েছে। বেজন্মার ব্যাটা, মেয়েছেলে দেখেছিস কখনও'... বলেই হাঁপাতে থাকে মুকুন্দ। ট্যাঁক থেকে বিড়ির কৌটো বের করে একটা বিড়ি মুখে দিয়ে ফস্ করে দেশলাই জ্বালল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলতে থাকে ফের, 'আসুক সূয্যু ফিরে, তখন শো'রের বাচ্চার পাছায় মারবো দুই লাথ। শালার নবেন শা সেও কী না এখন সতী সাজে... শালার বাপের ঠিক নাই, তার আবার কথা,' বলেই আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে বিড়িটায় টান দিতে গিয়েই দেখে বিড়িটা নিবে গেছে। রাগে সারা শরীর কাঁপতে থাকে মুকুন্দর। দরজার বাইরে পোড়া বিড়িটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, 'নাও খাইযে নাও, রাত কইরে লাভ কী?'

পাশাপাশি শুযে লীলাবতী আর মুকুন্দ। রাত বেড়ে চলে। ঘুম নেই ওদের চোখে। নিঝুম রাতে দূরে রেল স্টেশনেব ইঞ্জিনের সান্টিং-এর শব্দ কানে আসে। বুঝিবা, রাতজাগা পাখির ডানা ঝাপটানিব শব্দও শুনতে পায় ওরা। শীত শীত করছিল মুকুন্দর। লীলাবতীকে বলে, 'একটা ক্যাঁথাট্যাঁথা গায়ে দিয়ে দাও না, শীত করতিছে।'

কোন উত্তর না দিয়ে অভিজ্ঞ মানুষের মত ওর কপালে হাত ছোঁয়াল লীলাবতী। একটা নিশ্চিন্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিজের শাড়ির আঁচলটা মুকুন্দর গায়ের ওপর আলতোভাবে বিছিয়ে দিতে দিতে বলে, 'এরকম করে কদ্দিন চলবে, বলতি পারো?'

ওর তরফ থেকে কোন একটা প্রশ্নই যেন সে সময় আশা করছিল মুকুন্দ। কিন্তু এরকম তীক্ষ্ণ ধারাল প্রশ্ন নয়, নেহাতই একটা সাধারণ প্রশ্ন লীলাবতীর তরফ থেকে হোক, এটাই চেয়েছিল। কিন্তু তা না হওয়ায় বুকের ওপরের পাথরটা আরও শক্তভাবে চেপে বসল। একটা গরম নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'জানি না; ঘুমুতি চাই, সে শালাও তো আসে না।'

'রোজই তো তুমি জেগে থাক', আমি টের পাই।

'আমিও টের পাই, তুমি...'

এবার মুখোমুখি ঘুরে শুলো ওরা দুজন। যেন বহু বছর, বহু যুগ পর এমন মুখোমুখি ঘুরে শোওয়া। মুকুন্দ ডান হাত দিয়ে লীলাবতীকে বুকের কাছে টেনে আনলো। ওর রোগা শুকনো ঠোঁট দুটোর ওপর রাখলো নিজের ঠোঁট জোড়া। দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনের মাঝে সে স্বাদ, সেই প্রথম যৌবনের স্বাদ পেলো না। কেমন নোনা, বিস্বাদ, খরখরে লাগল। লীলাবতীর শরীরটা ভীষণ ঠাণ্ডা, যেন ঠিক মরা মানুষেব শরীর। ভয় নয়, ভীষণ রাগ হলো মুকুন্দর। ইচ্ছে হলো, জোর করে ধাক্কা দিয়ে লীলাবতীকে তক্তোপোশ থেকে ফেলে দেয়। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকারের ভেতর থেকে কিরকম এক মসৃণ, পেলব আলো, লীলাবতীর মুখের ওপর পড়েছে দেখতে পেয়ে বোবা হয়ে গেল মুকুন্দ। ওর মুখের ওপরও কী এই আলো পড়েছে? যদি পড়ে তাহলে কী, মুকুন্দর মনের বিরক্তির কী ঘৃণার ভাবটা লীলাবতীর চোখে পড়েছে। ভাবলো, না, লীলাবতীর চোখ অত ধারাল নয়। বড় সরল, সহজ লীলাবতী। অত ঘোর প্যাঁচের মধ্যে কখনই যেতে পারে না সে। বেশ কিছুটা নিশ্চিন্তি বোধ করলে পর ধীর গলায় বলে মুকুন্দ, 'হ্যাগো, তোমার কাছে সূয্যুর একটা ছবি আছে না?'

'সে তো সেই ছোট্ট বেলার ছবি। অন্নপ্রাশনের পর তুমি ওরে নিয়ে মেলায় গিয়েছিলে। সেইখান থিকাই তো তুলে এনেছিলে ছবিডা।'

'হউক। কাইল তুমি দিও দিনি ওই ছবিডা। পুলিসের লোক ওই ছবি দেখেই ঠাহর করতি পারবে।'

'কাইল ক্যান; এখনই দি।' বলেই উঠে পড়লো লীলাবতী। বিয়ে করেছিলো বাপ-মায়ের অমতে। তাই বিয়ের সময় কিছুই পায়নি। পরে কারখানার চাকরিটা পাকা হলে পর মুকুন্দ শেয়ালদা বাজার থেকে একটা টিনের বাক্স কিনেছিল। ওর পীড়াপিড়িতেই দোকানদার বাক্সটার গায়ে লিখেছিল 'সুখে থাক'। মনে পড়তেই মুকুন্দ একটা ঘন নিঃশ্বাস ফেলে নিস্পন্দ পড়ে রইল।

অনেকদিনের ছবি তাই নজর এড়াতে এড়াতে ছবিটা বাক্সটার একেবারে নিচে চলে গেছে। সমস্ত কাপড়-চোপড় ব্যস্ত হয়ে টেনে টেনে নামিয়ে খবরের কাগজে মোড়া ছবিটা বের করলো লীলাবতী। হ্যারিকেনের আলোটাকে উস্কে দিয়ে মুকুন্দ কাগজের মোড়ক খুলে ছবিটা দেখতে থাকল। ঝুঁকে পড়ে লীলাবতীও দেখতে থাকল ছবিটা। একই সঙ্গে দু'জনেই বলে উঠলো, 'কী দুষ্টু চোখ সূয্যিটার।'

লীলাবতী ছবিটার দিকে চেয়ে বললো, 'পরান মণ্ডলের মা অরে কেষ্টঠাকুর বলে ডাকত।'

'আর ঐ সুদাম ঘোষ বলতো..' কথাটা শেষ না করে হি হি করে হাসতে লাগল মুকুন্দ। মুকুন্দর হাসির কারণটা যেন বুঝতে পেরেছে, তাই লীলাবতীও মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

'যাই কও, সূয্যির মা, সুদাম ঘোষ লোকটা সব সময় রসে টইটম্বুর থাকতো। সূয্যিকে দেখে বলেছিল, 'বোঝলা মুকুন্দ, বড়ো হলি ছেলে তোমার অনেক মাগী মচকাবে বলে দিলাম।' একটু থেমে ফের হাসতে হাসতে বলে, 'যেমন তোমারে মচকেছি আমি, ও শোরের বাচ্চা কলকাতায় কি লটরপটর করছে কে জানে?' কথাকটি বলেই গম্ভীর হয়ে গেল মুকুন্দ। সেই সঙ্গে লীলাবতীও।

পরের দিন সকালবেলা ছবিটাকে প্যান্টের পকেটে পুরে কারখানার উদ্দেশ্যে পা বাড়াল মুকুন্দ। যেতে যেতে ছবিটাকে পকেট থেকে বের করে দেখলো বার কয়েক। সূর্য যে ওদের মাঝখানে এত বড় একটা জায়গা জুড়ে থাকবে তা কি ভাবতে পেরেছিল কখনও। নিজের ছেলেবেলার কথা কেমন যেন মনে পড়ে গেল। বাপ-মার ওপর রাগ করে সেও তো ইতি উতি দু'দিন ঘুরেছিল। পরে এক সময় প্রচণ্ড খিদের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ঘরে ফিরে এসেছিল। সে সময় বাপ-মা তার ওপর কোনো খারাপ ব্যবহার তো করেনই নি উপরন্তু, কেমন এক বিশেষ যত্ন করেছিলেন। নিজেকে সে ভীষণ অপরাধী মনে করেছিল এখন এই মুহূর্তে সে স্পষ্ট বুঝতে পারল। আজ সে আর লীলাবতী যেমন কষ্টে দিন কাটাচ্ছে সে সময় তাদেরও তাই হয়েছিল। কিন্তু সূর্য তো রাগ করে যায়নি। ও তো কলকাতার বাবুদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় গেছে। দলের বাবুটার নাম যেন কী। মনে করতে চেষ্টা করলো মুকুন্দ। রাজীব না রাজেন বাবু? না না, ও ধরনের নাম নয়। কেমন একটা চমক দেয়া উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো নাম। নামটা কী? অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলো না। মুকুন্দ ভাবল, এই তো কাল কী পরশুও এই নামটা তার ঠোঁটের গোড়ায় ছিল। এখন কেন সে মনে করতে পারছে না।'

ভোঁ বাঁজলো কারখানাটার। আজও দেরী হয়ে গেল। মুখটা কেমন শুকনো খরখরে। টিনের কৌটো বের করে একটা বিড়ি ধরাল। শালার ম্যানেজার! খিস্তি যখন খেতেই হবে, তখন দেরী করে গেলেই চলবে। বেশ একজাতীয় তৃপ্তির স্বাদ এ মুহূর্তে অনুভব করতে পারলো মুকুন্দ। সমস্তিপুর প্যাসেঞ্জারটা এই সময় এঁকে বেঁকে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে গেল। হিসেব করে দেখল এখন সকাল ন'টা দশ। ট্রেনগুলোর ভেতরে এত লোক, কোথায় যায় সব? দেশ ছেড়ে আসার পর সেই যে এখানে এসে আস্তানা গেড়েছে মুকুন্দ তারপর থেকে আজ প্রায় কুড়ি বাইশ বছর পার হয়ে গেল, কোথাও যায়নি ওরা। সূয্যু একবার পুরী যেতে চেয়েছিল। সে কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বলেছিল মুকুন্দ, 'বুঝলি সূয্যু, তোকে আমি দার্জিলিং নিয়ে যাবো। ক্যামুন করে সূয্যু ওঠে তা দ্যাখায়ে আনবো।' মুহূর্তের মধ্যে সূর্য সে কথার গুরুত্ব দিয়ে ডাগর চোখ দুটো মেলে ধরে ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'সূয্যু ক্যামন করে ওঠে বাবা?'

হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিল মুকুন্দ, 'ভগমানের হাতে এট্টা মেশিন আছে, লাটাই এর মতন দেখতি সেই মেশিন। যেমন লাটাইতে সুতো গোটায়, সুতো ছেড়ে দ্যায় তেমনি করে ভগমান ওই মেশিনডারে ঘোরায়। ফলে পাহাড়ের গা ঘেঁষে সূয্যু ওঠে, উঠতি উঠতি আবার পশ্চিমে ঢলে পড়ে, তখন আর এক ভগমান ওই সূয্যুডোরে নিয়ে লোফালুফি করে— ফুটবলের মত সট মাইরে সূয্যুডারে বিলাত পাঠাইয়ে দ্যায়...'

বিস্ময়ে দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইতো তখন সূর্যর। মাথার ভেতর থেকে তখন দার্জিলিং এর পাহাড়ের কথায় হারিয়ে যেত। মুকুন্দর গা ঘেঁষে বসে গায়ের গন্ধ নিতো। বুকের ভেতরটা মুহূর্তেই কী রকম ফাঁকা হয়ে গেল। পা দুটো অসম্ভব ভারী, মাথার ভেতরে অনেক রকমের শব্দ বন বন লাট্টুর মত পাক খেতে লাগল। কী মনে করে জিগা গাছটার নিচে বসে হাঁপাতে থাকল মুকুন্দ।

কারখানায় আর যাওয়া হলো না তার। সময়ের কাঁটা দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতে থাকে। গাছের নিচের ছোট্ট ছায়াটা সরে গিয়ে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে ভরে গেল। মাঝে মাঝে দু-একজন পথচারী কেমন চোখে মুকুন্দব দিকে চেয়ে থেকে এগিয়ে গেল কোন কথা না বলে। গা পুড়ে যাচ্ছিল রোদ্দুরে। কী মনে করে উঠে পড়লো সেখান থেকে। এই দীর্ঘ সময় সে এখন কিভাবে কাটাবে? বাড়ি ফিরে যাবে কী না ভাবল একবার। লীলাবতীর কথা মনে পড়তেই একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা ওকে ছুঁয়ে গেল। ঠিক এই মুহূর্তে লীলাবতীর জন্য অসম্ভব এক কষ্টে ছেয়ে যেতে লাগল মনটা। অবশেষে বাড়ির দিকেই পা বাড়াল মুকুন্দ। ওকে এই অসময়ে দেখতে পেয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল লীলাবতী। মুকুন্দ পকেট থেকে সূর্যর ছবিটা বের করে বলল, 'এটা যেখানে ছিল সেইখানেই রেখে দাও সূয্যুর মা। এতদিনে সূয্যু অনেক পাল্টে গ্যাছে।'

মুকুন্দ দেখতে পেলো, লীলাবতীর প্রসারিত হাতটা তখন অসম্ভব কাঁপছে।

মিনিবাসের বৃদ্ধ ভদ্রলোক

কার্জন পার্কের যেদিকটায় রানী রাসমণির মূর্তি ঠিক তার উল্টো ফুটপাথে শ' খানেক লোকের ভিড়। এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়, রোজকারই ঘটনা, সকাল থেকে রাত ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত এরকম ভিড় লেগেই থাকে। জোকা, ঠাকুরপুকুর, আমতলা, বজবজ, পর্ণশ্রী, চৌরাস্তা, সখের বাজার যাবার জন্য কতই না সরকারী বেসরকারী বাস। এছাড়া জোকা পর্যন্ত আছে ট্রাম। কিন্তু কোনটাতেই ঠিকমত ওঠার উপায় থাকে না। মাঝপথে যদি কারো নামতে হয়, তবে সে আধমরা হয়ে নামে। জামা-কাপড় অবিন্যস্ত হয়ে যাবে, মাথার চুল এলোমেলো হবে অবশ্যই।

একদিন শুভ্রাকে রমেন বলেছিল, 'আমাদের অবস্থা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাগত সৈনিকদের মত।' শুভ্রা স্থির নিষ্পলক চোখে চেয়েছিল সেদিন। কিন্তু আজ কেমন বিভ্রান্ত আর অসহিষ্ণু দেখাচ্ছিল রমেনকে। ওর চোখ রক্তাভ, চেহারায় অস্বস্তি আর অস্থিরতা লক্ষ করল। তাই কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে বলো তো? শরীর ভাল নেই নাকি?'

রমেন কেমন এক ঘোর আচ্ছন্নতার মাঝে রয়েছে তখনও। আমতা আমতা করে কী যেন বলার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই ঠিকমত বলতে পারল না। ফলে জটিল গোলকধাঁধায় জড়িয়ে পড়ল যেন শুভ্রা। রমেনের গা ঘেঁষে বসে ওর কপালে হাত ছোঁয়ালো। ভীষণ ঘামছিল রমেন সে সময়। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, কনকনে হাওয়াও বইছে, সুতরাং এ আবহাওয়ায় কারুরই ঘামবার কথা নয়, ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল শুভ্রা, প্রেসার বাড়েনি তো?

রমেনের উত্তর না পেয়ে ফের জিজ্ঞেস করল, 'চুপ করে আছ কেন? কী হয়েছে বলবে তো?' সে কথায় সম্বিত ফিরে পেল রমেন। ফ্যাকাশে হেসে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই। অফিস যাবার সময় তোমার শরীর ভাল ছিল না, তার ওপর শম্পারও খবর বেশ কিছুদিন ধরে পাচ্ছিনা। বয়স বাড়লেই কি মানুষের এরকম হয়!'

শুভ্রা বলল, 'কী জানি। হয় তো হয়।' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সহাস্যে বলল, 'শম্পার চিঠি আজই পেয়েছি। ও না মা হতে চলেছে।'

খুবই স্বভাবিক হয়ে গেল রমেন মুহূর্তেই। বলল, 'বড় বাঁচা বাচালে। সব যে ঠিক আছে, তাতেই আমি খুশী।'

শুভ্রা বলল, 'মুখ-হাত ধুয়ে নাও। তোমার জন্য চা করি।'

রমেন যেমনটি বসেছিল তেমনি বসেই রইল। মিনিট দশেকের মধ্যে দু' দুটো সিগারেট শেষ করে ফেলল। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে শুভ্রা সবিস্ময়ে বলল, 'চুপচাপ বসে আছ যে? মুখ-হাত

ধুলে না। থাকগে, চা-টা খেয়ে নাও। আমি বরং এই ফাঁকে গোপালের দোকান থেকে ঘুরে আসি।'

ঘন ঘন চায়ে চুমুক দিল রমেন। বলল, 'এই অসময়ে গোপালের দোকানে কেন?'

শুভ্রা খুব স্বাভাবিক গলা করেই উত্তর দিল, 'ভেবেছিলাম দুপুরেই সব কিনে কেটে রাখব। ঘুমই কাল হল। তার ওপর এই আবহাওয়া। ঘরে কিছুই নেই যে মশাই।'

চা শেষ করে রমেন বলল, 'আমি থাকতে তুমি যাবে কেন? চুপচাপ আমার পাশে বসো তো। দোকানপাট আমিই করতে পারব।'

শুভ্রা কথা না বাড়িয়ে একেবারে গা ঘেঁষে বসল রমেনের।

রমেন স্থির চোখে ওকে দেখল শুধু। বলল, 'জানো, আজ খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'ভয়? কিসের ভয়?' শুভ্রার উৎকণ্ঠিত গলা।

'সে এক মজার ব্যাপার, পরে বলবো।' বলেই একটা সিগারেট ধরাল। ঘন ঘন দু-চারটে টান দিয়ে বলল, 'খিচুড়ি ডিমভাজা এ ওয়েদারে জমবে ভাল। ইলিশ কিনতে গেলে বেহালা বাজারে যেতে হবে। তুমি আদেশ করলে তাও যেতে পারি।'

'না, না, অত কষ্ট করতে হবে না। গোপালের দোকানে যা পাও, তাই বুঝেসুঝে নিয়ে এসো।' বেশ কিছুটা সময় চুপচাপ থেকে রমেন বলল, 'শম্পার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে পারলে ভাল হত।'

শুভ্রা নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রমেনকে ফের ভাল করে দেখল, পরে হাসিমুখে বলল, 'কনগ্র্যাচুলেশন জানাবে নাকি?'

'কনগ্র্যাচুলেশন জানাতে দোষটা কোথায়?' রমেন প্রশ্ন করল।

'দোষের কিছু নেই। তবে আমাদের সমাজে এসব চলে না। শম্পা ভীষণ লজ্জা পেয়ে যাবে।'

'যা হচ্ছে, তাতে লজ্জার কী?'

'আহ্, তুমি বুঝবে না' ও আমাকে যা বলতে পারে, তা কি তোমাকে বলতে পারবে? শুভ্রা কথা কটি বলেই একরকম জোর করেই রমেনকে বলল, 'দেরি না করে বরং গোপালের দোকান থেকে ঘুরেই এসো। কাল অফিসে গিয়ে শম্পার সঙ্গে ফোনে কথা বলো।

রমেন পাঞ্জাবি পরে ছাতা হাতে গোপালের দোকানের উদ্দেশে পা বাড়াল। কিছুটা এগোতে না এগোতেই শঙ্করের মুখোমুখি পড়ে গেল রমেন। শঙ্কর নামী এক কোম্পানির ফিটার, পেটা চেহারা, গায়ের রঙ মাঝারি, মাথার চুল কোঁকড়ানো। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা লুকিয়ে শঙ্কর জিজ্ঞেস করল, 'এখন কোথায় বেরুচ্ছেন দাদা?' প্রফুল্ল আবাসনের গেটের সামনে ভেপাব ল্যাম্প-এর আলোয় গায়ের রঙ কেমন বিদঘুটে দেখায়। শঙ্করকে নিজের ছাতার নিচে টেনে বলল, 'আজ ফিরতে এত দেরি হল যে?'

'কী করি দাদা। এরকম অসময়ে যে বৃষ্টি আসবে তা কি আগে জানতাম, বেরুবার মুখে একটা মেশিন বেগড়াল, সাধারণ গণ্ডগোল। ভ্যানতারা করে পাক্কা দু' ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম আমরা ক'জন, ব্যস, ভাল দাঁও মেরে দিলাম ওভারটাইমের।'

হো হো করে হাসল রমেন। বলল, 'কোম্পানি লাটে তুলে দেবে দেখছি।'

শঙ্কর হাসল সে কথায়। বলল, 'আমরা তো তবু গায়ে গতরে খেটে টু পাইস একস্ট্রা রোজগার করি, ম্যানেজমেন্টের শাঁসাল অফিসারদের কাছে আমরা চুনোপুঁটি।'

রমেন প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করল, 'সুমি এখন কেমন আছে?'

মুহূর্তেই ফ্যাকাশে হয়ে গেল শঙ্করের মুখ। 'এমনিতে তো ভালই, তবে.'

'তবে কী?'

'বোধহয় হাতটা ওর অকেজো হয়ে গেল। আমিও শেষ লড়াই চালিয়ে যাব।'

রমেন বলল, 'আলবাত চালাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে। সুমিকে বলো, কাল-পরশু একবার গিয়ে ওর হাতের চা খেয়ে আসব।' শঙ্কর উত্তর দিল, 'আপনি গেলে ও খুব খুশী হবে, জানেন দাদা, এখানকার লোকজন...।'

ওকে কথা বাড়াতে না দিয়ে রমেন বলল, 'এবার বাড়ি যাও। তুমি তোমাব মনে থাকবে। জান তো বোবার শত্রু নেই। যাও।'

শঙ্করকে একরকম জোর করেই বাড়িমুখো করে দিয়ে রমেন গোপালের দোকানে এসে দাঁড়াল।

বেশ কিছু খদ্দের ভিড় করে আছে দোকানে। গোপাল মাল বেচতে বেচতেই জিজ্ঞেস করল, 'বহুদিন পর দোকানে এলেন স্যার। বলুন কী দেবো?'

রমেন বলল, 'এঁরা আগে এসেছেন। আগে এঁদের বিদেয় কর, তারপব বলছি।'

গোপাল উত্তব দেয়, 'এঁবা সব ধারের খদ্দের স্যার, ওদের দেরি হলে কিচ্ছু আসে যাবে না। বলুন, আপনার কী চাই?'

রমেন কথা না বাড়িয়ে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসেব এক এক করে নাম কবে গেল। গোপাল সরু লম্বা একটা কাগজে চটপট সেগুলো লিখে বাখতে রাখতে বলল, 'আমাব ওটা মনে আছে স্যার?'

ব্যাঙ্ক লোনের কথাটা, মুহূর্তেই মনে পড়ে গেল, রমেনেব। বলল, 'একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। আজই ডাইরিতে নোট করে রাখব।'

গোপাল হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'অটোরিক্সা বেব করতে পারলে ভাইটার একটা গতি হয। আপনারা দু'চারজন আছেন বলেই যা একটু ভরসা।'

রমেন উত্তর দিল, 'নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো।'

'তা হলেই হবে স্যার।' জিনিসপত্র ঠিকমত সাজিয়ে দিতে দিতে গোপাল আড়চোখে রমেনকে দেখে বলল, 'তাহলে সামনের সপ্তাহেই পাকা খবর পেতে পারি, কী বলেন?'

সে কথার উত্তব না দিয়ে দাম মিটিয়ে বমেন বাড়ি ফিবে এল। টিভি-তে তখন কী একটা হিন্দি সিরিয়াল হচ্ছিল।

শুভ্রা টিভি বন্ধ করে বলল, 'এত দেরি হল কেন?'

রমেন বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, 'এই শেষ। আর কখনো ও দোকানমুখো হচ্ছি না। সব ব্যাটা ধান্দাবাজিতে ওস্তাদ।'

শুভ্রা জিনিসপত্র গুছোতে গুছোতে উত্তর দিল, 'পস্টাপস্টি বলে দিলেই পার, তুমি কিছু পাববে না।'

নতুন করে সিগারেট ধরিয়ে রমেন বেশ আয়েস করে বলল, 'তাহলে কেউ দাদাও বলবে না। স্যারও বলবে না।'

শুভ্রা খোঁচা দেবার ভঙ্গি করে বলল, 'ফলস ভ্যানিটি। তা ছাড়া, এও তো তোমার এক ধরণের ধান্দাবাজি।'

একটু যে আঘাত পেল না রমেন তা নয়। তবু চালু লোকদের মত ওকথার গুরুত্ব না দিয়ে শব্দ করে হেসে বলল, 'ওই একটা জিনিসের ওপরেই তো টিকে আছে সব। যে মুহূর্তে সকলে জেনে যাবে তুমি ফালতু, তখনই তুমি বাদের খাতায় চলে যাবে। আমরা আসলে যে কী তা হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছি আজ।'

রমেনের কথায় শুভ্রার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। জিজ্ঞেস করল, 'একটু আগে কী সব ভয়ের কথা বলছিলে, আর এখন হাড়ে-হাড়ে কী টের পেয়েছ সেটা বলবে তো?'

রমেন সরাসরি শুভ্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। শুভ্রাকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল খুব। তবু সে সবকে আমল না দিয়ে সামান্য হেসে বলল, 'বোগাস ব্যাপার! অত চিন্তা করছো কেন? রান্না চাপাও তো, আমি বরং দু-চারটে টুকটাক কাজ সেরে রাখি।'

শুভ্রা গোমড়া মুখ করে উত্তর দিল, 'অফিসটাকে অফিসে রেখে এলেই পার। ওটাকে বাড়ি নিয়ে আস কেন ঠিক বুঝি না।'

খুশীর ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলে রমেন বলল, 'ফলস ভ্যানিটির মধ্যে এটাকেও ফেলতে পার। অফিসের লোক দেখবে, রমেন বাড়ুজ্জে অফিসেও যেমন খাটে, বাড়িতেও ফুরসুত পায় না। আবার পাড়া-প্রতিবেশীরাও ভাববে, লোকটা কাজ ছাড়া কিছুই বোঝে না।' কথা শেষ করেই গুণ গুণ করে একটা গানের কলি আউড়ে পা নাচাতে নাচাতে বলল, 'আমরা তাহলে দাদু-দিদিমা হয়ে যাচ্ছি, কী বলো?'

সুন্দর ভঙ্গিতে হাসল সে কথায় শুভ্রা। বলল, 'এই তো সংসারের নিয়ম।'

রমেন মুখ টিপে হেসে বলল, 'তোমাকে কিন্তু দুবার আঁতুড় ঘরে যেতে হয়নি। প্রথম ঝক্কি সামলেই সব খেল খতম করে দিয়েছি।'

'তুমি না একটা যাচ্ছেতাই। নাতি বা নাতনি আসছে। এবার থেকে মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকবে, বুঝলে।' বলেই উঠে দাঁড়িয়ে রান্নাঘরমুখো হল।

'ফিনিসিং চা কি আর একবার পাব ম্যাডাম?'

'কতবার চা খাবে?' শুভ্রার কথার ঝাঁঝ ছিল না এতটুকুও। কেমন যেন এক ধরনের প্রশ্রয়ের ভঙ্গি আছে এটা টের পেল রমেন। ও কিন্তু অফিসের কাজে হাতও দিল না মোটেই। টেপরেকর্ডারি চালিয়ে রবিশঙ্করের সেতারে ডুবে গেল।

খাওয়াদাওয়ার পর রোজকার মত পিরিওডিক্যালস-এ চোখ বোলাল না রমেন। দু' আঙুলের

মাঝে জ্বলন্ত সিগারেট থেকে নীল ধোঁয়া উঠছিল। সিগারেটে টান দেওয়া ভুলে গিয়ে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে খোলা জানালার দিকে চেয়েছিল। শুভ্রা সতর্ক চোখে ওর সব কিছু দেখেও কিছুই বলছিল না।

রমেন বলল, 'অ্যালবামগুলো আলমারি থেকে বের করতো?'

শুভ্রা জিজ্ঞেস করতে পারতো, এখন এ সময়ে অ্যালবাম দেখার কী হল। কিন্তু কী মনে করে কোন প্রশ্ন তো করলোই না, উপরন্তু অ্যালবামগুলো একে-একে বের করে রমেনের সামনে রাখতে থাকল। রমেন অ্যালবামগুলোর দু'একটা পাতা উল্টেই পাশে সরিয়ে রেখে শম্পার ছেলেবেলাকার ভর্তি অ্যালবামটা বের করে নিয়ে বেশ উৎসুক ভঙ্গিতে পাতাগুলোয় চোখ রাখল।

'দ্যাখো, দ্যাখো, শম্পার এই ছবিটা?' ছবিটা শুভ্রার দিকে এগিয়ে ফের বলল, 'এটা পুরীর সমুদ্রতীরে তোলা। তখন শম্পার বয়স ছ'বছর ছিল, তাই না?'

রমেনের একেবারে গা ঘেঁষে বসে শুভ্রাও ছবিটাকে দেখল। 'খুব সুন্দর তুলেছিলে কিন্তু ছবিটা। পাকা ক্যামেরাম্যানের তোলা বলে মনে হয়। ছবি দখে ফটোর দোকানের লোক খুব প্রশংসা করেছিল তোমার।'

'ছবিটা এনলার্জ করে যদি বাঁধিয়ে রাখতাম তো খুব ভাল হত। কিংবা নেগেটিভটাও যদি থাকতো তো এখনও চেষ্টা করতে পারতাম। শম্পার ছেলেমেয়েরা ওর মায়ের ছেলেবেলার ছবি দেখে খুব মজা পেত।'

শুভ্রা কী মনে করে জিজ্ঞেস করল, 'হঠাৎ এতদিন পর একথা তোমার মনে পড়ছে কেন?'

রমেন করুণ মুখ করে ফ্যাকাশে চোখে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। ফ্যাসফেসে গলায় উত্তর দিল, 'আসলে আমরা খুব ভীতু, কাপুরুষ। আজ হাড়ে-হাড়ে তা টের পেয়েছি।'

শুভ্রা বলল, 'আজ কী হল তোমার। কী হয়েছে, বল না?'

রমেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কেবল ভয়, আর ভয়। উঃ মাগো।' বলেই সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে নির্জীবের মত বসে রইল।

'কিসের এত ভয় তোমার?'

আরও করুণ হয়ে গেল রমেনের মুখটা। বলল, 'জানো, বাড়ি ফেরার সময় একটা ঘটনা ঘটল মিনিবাসে। আর সেই থেকে ভয় বুকের মাঝে খামচে বসে আছে। কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না।'

শুভ্রা চুপচাপ বসে থেকে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

রমেন বলতে থাকে, 'মোমিনপুরে মিনিবাসটা থামতেই একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক উঠলেন। বয়স আশির কাছাকাছি। ভিড় ঠেলে উঠতে ওঁর খুবই কষ্ট হয়েছিল। কোনক্রমে উঠেই ভদ্রলোক বললেন, 'আমি বৃদ্ধ, অসুস্থ, দয়া করে কেউ আমাকে একটু বসতে দিন।' কেউই আমরা ওর কথার গুরুত্ব দিইনি। ভদ্রলোক এবার বললেন, 'ভাবছেন আমি নাটক করছি। বিশ্বাস করুন, আমার সমস্ত শরীর গুলোচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে আমি বমি করে ফেলতে পারি। তখন কিন্তু

কেউ আমাকে দুষবেন না।' সে কথা শুনে কে একজন বলল, 'কন্ডাক্টর, বুড়োটাকে বাস থেকে নামিয়ে দাও।' আর তা শুনেই ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'আমাকে বাস থেকে নামিয়ে দেবার স্পর্ধা কার আছে? আমি এই অসুস্থ শরীর নিয়ে অভিশাপ দিচ্ছি সকলকে, আপনাদের যেন বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়, বাড়ি গিয়ে যেন দেখেন আপনাদের মহাসর্বনাশ হয়েছে। বাস থেকে নামিয়ে দেবে। কী অডাসিটি। যারা আহার, নিদ্রা, মৈথুন ছাড়া জীবনের আর কোন সার সত্য টের পেল না, তারা দেবে আমাকে বাস থেকে নামিয়ে !' বলতে না বলতেই ভদ্রলোক মাথা নিচু করে বমি করে দিল। বাসটা চলছিল যথারীতি; কিন্তু বাসের ভেতরের অতগুলো মানুষ ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল। তারাতলাতেই বাসটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। আমরা কেউই কোন কথা বলতে পারছিলাম না। 'মাগো। কী কষ্ট। কী কষ্ট। এবার শুভ্রার একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'বিশ্বাস কর, নিজের মুখ তো নিজে দেখতে পায় না কেউ, তবে বাসের অন্য সকলের মুখেই আমি ভয় আর আতঙ্কের ছাপ দেখেছি। বাসের কেউই কোন কথা বলতে পারছিল না।' বড় শ্বাস ফেলে ফের বলতে থাকল রমেন, 'কন্ডাক্টর ছেলেটি বলে উঠল, 'শরীর তো আপনাদেরও একদিন না একদিন খারাপ হতে পারে, তখন যদি কেউ আপনাদের বলে বাস থেকে নামিয়ে দিতে তখন কী করবেন? হেসে উড়িয়ে দেবেন, না, রেগে যাবেন? এ পর্যন্ত বলেই ও বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে ফাঁকা একটা সিটে বসিয়ে বলল, 'এখানে বসুন মাস্টারমশাই।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক রুমাল দিয়ে ভাল করে মুখ মুছে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ছেলেটির দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে তো চিনতে পারছি না, কী নাম তোমার?'

'তিরাশি সালে ক্লাস এইটে পড়তাম। পাশ করতে পারিনি। আপনি আমাকে চিনবেন না স্যার। আমার নাম পল্টু হালদার।'

ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছেলেটির দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'এই এক জ্বালা' তোমার কচি মুখটা কেন যে মনে পড়ছে না।'

'আপনি সকলকে অভিশাপ দিলেন কেন স্যার?'

করুণ মুখ করে বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, 'বিশ্বাস করো, ও সব আমার মনের কথা নয়। জানই তো, শকুনের অভিশাপে গরু মরে না। অসুস্থ শরীরে কী বলেছি, তার জন্য ক্ষমা চাইছি আমি। সকলে সুখে থাক, সকলের মঙ্গল হোক এই তো সারা জীবন ধরে চেয়েছি। উনি হাত জোড় করে সকলের কাছে ক্ষমা চাইলেন। আমরা মাথা নিচু করে ছিলাম। তবুও ভয়ের কাঁটাটা কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছিলাম না। বাড়িতে এসে যতক্ষণ না সব ঠিকঠাক দেখছিলাম ততক্ষণই উৎকণ্ঠা ছিল।' একটানা বলে গেল রমেন কথাগুলো।

শুভ্রা কী মনে করে বলল, 'চল না কাল শম্পার ওখানে যাই। একটু চোখের দেখা এই আর কী।' ও কথায় রমেনের সারা মুখচোখ উদ্ভাসিত হয়ে গেল। বলল, 'সেই ভাল।'

খেলা

পরীক্ষার শেষদিনে রতুর মন খারাপ হয়ে গেল।

অনেকেই হৈ হৈ করছিল। রতু ত্যারছা চোখে ওদের দিকে তাকাল। বেশ একটু বিরক্তি মেশান দৃষ্টি। লা লা লা, লা লা লা করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বাচ্চু সিঁড়ি ভেঙে নামছিল। রতুকে দেখে শরীরটায় মোচড় দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

কিরে অমন ব্যোম মেরে আছিস কেন? শুধোয় বাচ্চু।

সে কথার জবাব না দিয়ে রতু বলে, 'একটা সিগ্রেট ছাড়তো।' পুবমুখে জটলাটার দিকে চোখ রেখে 'পরীক্ষা দিয়ে সব শালা যেন ভিকট্রি সেলিব্রেট করছে' বলল রতু।

চাপা প্যান্টের পকেট থেকে চারমিনারের প্যাকেট বের করে রতুর দিকে এগিয়ে বলল, 'হঠাৎ এত খচে গেলি কেন। সাপ্লাই তো ঠিকই এসেছে। তবে.......কথাটা শেষ করতে পারল না বাচ্চু। রতু আরও ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'পরীক্ষার শালা ইয়ে করেছি আমি।' একটুক্ষণ থেমে সিগারেটে আগুন ধরিয়ে বলল, 'মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল কেন জানিস? এখন এই মুহূর্ত থেকে কমপ্লিট বেকার, ধ্যেত।'

ও কথায় হেসে ফেলে বাচ্চু। বলল, 'চল মেট্রোর ছবিটা ফায়ার করে দিয়ে আসি। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল রতু। সিগারেটটায় ঘনঘন দু-তিনটে টান দিয়ে বলল, 'না-রে আগে বাড়ি যাই। তারপর।' ও কেন এখন বাড়ি যাবে, বুঝে উঠতে পারল না বাচ্চু। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে রতু বলল,' 'আজ বাবা অফিস যায়নি। শরীরটা খারাপ দেখে এসেছি। নাঃ। দেরী করিস নি চল।' কথা বলতে বলতে ওরা ট্রাম স্টপে এসে দাঁড়াল। প্রায় ফাঁকা একটা ট্রাম এসে পড়তেই ওরা লাফিয়ে ট্রামটায় উঠে পড়ল। পাশাপাশি বসে বাচ্চু বলল, 'হপ্তা খানেকের মধ্যেই আমাকে বোধহয় খোঁয়ারে ঢুকিয়ে দেবে। বড়দা আর বাবা কদিন ধরে কি নিয়ে ফিসফিস করছে। আমাকে দেখলেই স্পিক টু নট।'

রতু ওকে আশ্বস্ত করে বলল, 'দূর তোদের বিরাট বিজনেস। ওসব ফিসফিস-টিসপিস সব দু'নম্বরই খাতা নিয়ে যা তোরও শোনা বারণ।'

সে কথায় কেমন যেন খুশী ছুঁয়ে যায় বাচ্চুকে। বলে, 'আমি বাবা এক নম্বরেও নেই, দুনম্বরেও নেই। আমি চাই অ্যাবসলিউট ফ্রিডম। ফ্রিডম ইজ মাই বার্থ রাইট' বলেই ট্রাম কাঁপিয়ে হেসে উঠল। বাচ্চুর থাই-এর ওপর একটা চাপড় মেরে বলল রতু, 'তুই মাইরি একদম কোটেশান মাস্টার হয়ে গেছিস।' বলেই ফ্যাক ফ্যাক করে হাসল কিছুক্ষণ।

বাচ্চু বলল, 'তোর বাবার কি অসুখ রে?'

রতু হাসছিল ঠিকই, বারবারই বাবার কথা মনে পড়ছিল। বাচ্চুটা যে ফের এমন করে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবে বোঝে নি। মুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, 'জানি না, বলছিল বুকে ব্যথা।' ট্রামের টিকিট দুটো গোলা পাকিয়ে হাতের চেটোয় নিয়ে বলল, 'বাবা শেষ অব্দি কোন ফক্কা বাজি না করে বসে।'

নির্দিষ্ট স্টপে ট্রাম এসে পড়তেই রতু নেমে গলা চড়িয়ে বলল, 'কাল আসিস।'

বাচ্চু ঘাড় নেড়ে জানলার বাইরে চোখ রেখে রতুর দিকে চেয়ে রইল। ট্রাম থেকে নেমে পড়তে খুবই ইচ্ছে করছিল, রতুর বাড়িতে গিয়ে ওর বাবার অসুখটা কি জেনে আসতে মন চাইলেও কেন যেন ভরসা পেল না। কেমন ভয় করছিল। এমন আর কখনও তার হয়েছে কিনা মনে করতে পারল না।

বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করল রতু। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয় হয়, কেমন যেন নিঃসাড় নিঃশব্দ মনে হল গলিটাকে। মিনিট পাঁচ সাত কী তারও বেশি ঠায় দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল। কড়া নাড়তে ভয় করছিল খুব। অবশেষে অনেক কষ্টে ঈষৎ কড়া নাড়ল। ভেতর থেকে দরজা খোলার শব্দ হল। ছোট বোন ইলু দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল। ভাল করে ইলুর মুখটা দেখে নিয়ে কিছু আঁচ করতে চেষ্টা করল। বারো বছরের ইলু বয়স অনুপাতে বড্ড বেশি গম্ভীর। ফ্যাসফেসে গলায় শুধোল, 'তোর কি হয়েছে রে ইলু?'

দাদাকে সে আগে কখনও এমন করে কথা বলতে শোনে নি। ফলে আরও গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, 'কিছু নাতো।'

'বাবা কেমন আছে রে?'

তুমি যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই তো বাবা অফিস গেলেন।'

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল রতুর। ইলুর মাথায় হাত দিয়ে চুলগুলোকে এলোমেলো করে দিয়ে বলল, 'ফাস্‌কেলাস পরীক্ষা দিয়েছি ইলু। চাকরি পেলেই তোকে আমি.....কথাটা শেষ না করেই বলল কী চাস, মিনি স্কার্ট, বেলবটস? দরজায় খিল দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে বলল, 'পূর্ণতে সাউন্ড অফ মিউজিক এসেছে দাদা, দেখাবে?'

কৃত্রিম গাম্ভীর্য নিয়ে রতু বলল, 'খুব পেকেছিস না? কোথায় কোন সিনেমা হচ্ছে, সবের খোঁজ রাখছিস। দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি।' বলেই কোনক্রমে পাশ কাটিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল রতু।

পকেট থেকে ভাঁজ করা দুখানি কাগজ বের করে মা-র দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এগুলো রাখো। পরে এ দুটো বাঁধাতে দিও।'

'কী এগুলো?'

'অ্যাডমিট কার্ড আর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার। তোমার ছেলে যে অ্যাদ্দুর এগিয়েছে তাই যথেষ্ট।'

যে কথা শুনে সুন্দব হাসলেন চারুবালা। পরে স্নেহ-গদগদ গলায় বললেন, 'প্রতিবারই তো বলিস আর হল না। আবার পাশ-ও তো দিয়ে দিস।'

রতুর মুখে এসে গিয়েছিল কেমন পাশ সে দিচ্ছে, কিন্তু বলল না কিছুই। জামা গেঞ্জি খুলে আলনাব সঙ্গে লটকে রাখল। মুখ হাত ধুয়ে এসে বলল, 'কিছু মালকড়ি ছাড়না! ইলুটার কাছে

একটু হলে প্রেস্টিজটা গিয়েছিল আর কি?'

চারুবালা ছেলের মুখের দিকে চেয়ে কী যেন খুঁজলেন। রতুদের সব কথা কেমন যেন তার কাছে ধোঁয়াটে, অস্পষ্ট ঠেকে। অনেক কিছুই বুঝতে পারেন না। ভিতরে ভিতরে ভীষণ এক অস্বস্তি কেমন পেঁচিয়ে ধরতে থাকে। রতু একটু কাছে এগিয়ে এসে বলে, 'একটা ফাস্ কেলাস ইংরাজি ছবি চলছে পূর্ণতে। ইলুটা দেখতে চায়। কোনদিন বলেনি, এই প্রথম বলল।'

চারুবালা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। রতুর আবদারের কাছে হঠাৎ নিজেকে কেমন ছোট মনে হতে থাকে। প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্যই বলেন, 'একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকেলের দিকে তোর বাবার অফিসে একবার যাস্। লোকটা শরীর খারাপ নিয়ে অফিসে গেল'।

'বাবা আজ না গেলেই পারতেন।' ধীর গলায় বলল রতু, 'ঠিক আছে যাবো'। ঘাড় নিচু করে পাশের ঘরে চলে গেল।

এখন দুপুরটা ভজনদের রকে কাটে ওদের। বাচ্চু পকেট ট্রানজিসটারটা নিয়ে এসে বসে। রতু আর তার পাড়ার বন্ধু ঝন্টু ভজনদের রকটা পুরোপুরি দুপুরে লিজ নিয়ে নিয়েছে। বিবিধ ভারতীটা ছেড়ে দিয়ে ওরা কাত হয়ে বসে। ঠেলাওলা, রিক্সাঅলাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে রঙ্গ -তামাসা করে। ঠাঠা রদ্দুরে ঝলসায় সব। পথে লোকজন কম। চকচকে আকাশটাব দিকে ভালো করে চোখ মেলতে না পারলেও, মাঝে মাঝে দু একটা কালো বিন্দুর মত উড়ন্ত চিলের দিকে নজর যায়। হঠাৎ এই সময় কিশোরের কিংবা আশার জনপ্রিয় কোন গান বাজতে শুরু করলে ঝন্টু বলে, 'দুপুরটা মাখো মাখো জমিয়ে দিয়েছে মাইরি।'

রতু বড় রাস্তার দিকে তকিয়ে ছিল। বলল, 'আরে ব্বাস, জম্পেস একটা চিড়িয়া আসছে রে?'

তখন কারোরই গানে মন থাকে না। ওরা সকলে এক সঙ্গে ড্যাবডেবে চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ রতু বাচ্চুকে বলল, 'এই তোর কাছে পঞ্চাশ পয়সার একটা চাকতি হবে?'

পকেটে হাত দেয বাচ্চু। খুচরো পযসাব ভেতর থেকে একটা আধুলি বের করে রতুর হাতে দিয়ে বলে, 'মেরে দিও না চাঁদ।' মেয়েটা বেশ খানিকটা দূরে। গলা পিচের ওপর পয়সাটা ছুঁড়ে দিয়ে অন্যমনস্ক হবার ভান করল রতু। ট্রানজিসটার-এ মন দিয়ে আড়চোখে মেয়েটার দিকে তাকায়। পয়সাটার কাছে এসেই মেয়েটা থমকে দাঁড়ায়। কয়েক সেকেণ্ড কী যেন ভাবে। মেয়েটা যেই না কুঁজো হয়ে পয়সাটা তুলতে যায় অমনি রতু বলে, 'উহুঁ উহুঁ ওটা ছুঁলে বাচ্চুর প্রেমে পড়তে হবে।'

ভীষণ ঘাবড়ে যায় মেয়েটা। লজ্জায় আর রাগে রতুদের দিকে তাকায়। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে, অস্ফুটে কী সব বলে দ্রুত চলে যায়। মেয়েটাকে অমন করে চলে যেতে দেখে রতু বলে, 'রাগ করবেন না মাইরি, আমাদের এ একটা খেলা,' বলেই হিহি করে হাসে।

বাচ্চু বলে, 'কী যে করিস না রতু। মেয়েটাকে আমার চেনা বলে মনে হল।' অমনি রতু ঠোঁট ছুঁচলো করে শিষ দিল। বলল, 'তাই বল, ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ বাবা।'

ঝন্টু বাচ্চুর থুতনি ধরে একটা চুমু খেল।

বাচ্চু অসহায় মুখ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। পরে আমতা-আমতা করে বলল, 'বিলিভ মী, ওসব আমার আসে না।'

রতু বলল, 'যাই বল্, খাসা কিন্তু দেখতে। ব্রেন খাটিয়ে খেলাটা কী রকম বের করেছি বল্।' বাচ্চুর দু' আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগারেটটা ফস্ করে টেনে নিয়ে নিজের ঠোঁটে গুঁজে দিয়ে বলল, 'প্রেমের ব্যাপারে প্রথম প্রথম একটু ডাউন খেতে হয়, তারপর যেই বুঝবে টোপ গিলেছে, তখন থেকেই পুরুষসিংহ পুরুষসিংহ ভাব না করলেই গ্যাছো।'

ঝন্টু ওদের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে আপন মনেই বলে, 'কী ফ্যাচ-ফ্যাচ কচ্ছিস? গানটা শোন না। কী গলা মাইরি মান্নার।'

'নে, রাখ! রসের কথা হচ্ছে তা না, কী গলা মাইরি, কী গলা মাইরি করে ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিস। আরে, শালা ওদের বাড়ির চাকরেরও যা গলা শুনলে ট্যারা হয়ে যাবি!'

ঝন্টু তার উত্তরে বলল, 'তুমি চাঁদ সব শুনে এসেছ, না? থাড কেলাস লোকের মত কতা বলিস!

রতু একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বাচ্চুকে বলল 'গোটা দশেক টাকা ধার দিতে পারিস?'

'দ-শ-টা-কা' একটু টেনে উচ্চারণ করল বাচ্চু।' তারপর আমি শালা ট্যাঁকখালির জমিদার হয়ে ঘুরি আর কি?'

'দে না মাইরি!' একটু চেপে গলায় আবদার তুলে ধরল রতু—ভোম্বলের বোনটাকে না একটা টিপ দিয়েছি। বললাম, সিনেমা যাবি? তা মাইরি, অমন করে রাজি হয়ে যাবে বুঝিনি। বলল, হ্যাঁ, নুন-শোতে নয় রতুদা ম্যাটিনিতে যাবো।' একটু থেমে ফের বলল, 'আর কেউ সঙ্গে থাকলে কিন্তু যাবো না। কী হারামি মেয়ে রে বাবা!' বাচ্চু কেমন যেন চুপসে গিয়ে বলল, 'নে। তবে তোর জন্য না ফের মার কাছে ল্যাং ল্যাং করতে হবে।'

ঝন্টু হাসল সে কথায়। বাচ্চুর পকেট থেকে চারমিনারের প্যাকেটটা বের করে নিল। বলল, 'কী গরম রে বাপ। ছাল চামড়া সব ঝলসে যাচ্ছে।'

'তোর তো গণ্ডারের চাম্ড়া' রতু হাসতে হাসতে বলল।

ঝন্টু একটুও রাগ করল না সে কথায়। বলল, 'দেখিস, কোন দিন আমি নাঙ্গা সন্ন্যাসী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবো।' পরিবেশটা মূহূর্তে কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। রতু দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কান খুঁচলো। আরামে ওর চোখজোড়া বুজে এল। হঠাৎ কী মনে করে ধীরে বলে উঠল রতু, 'হ্যারে বাচ্চু তোর সেই খোঁয়াড়ের কী হল?'

'মাকে ধরে ম্যানেজ দিয়ে দিয়েছি। বংশে আমিই শালা প্রথম কলেজে পড়ছি, চাট্টিখানি ব্যাপার নাকি?' বাচ্চু উত্তর দেয়।

ঝন্টু বলল, 'এখন রাস্তা সাফ করতেও বি-এ পাশের ভিড়। সেজন্যই লেখাপড়ায় আমার কোন ইনটারেস্ট নেই।'

দিন দুই পরে ফের রতুরা সেদিনের সেই মেয়েটাকে দেখতে পেলো। সঙ্গে আর একজন মেয়ে। আজকে আর ওরা সেদিনেব সেই খেলার পুনরাবৃত্তি করল না। মেয়ে দুটো ঠিক ওদের

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ইতস্তত কী যেন খুঁজলো।

সেদিনের সেই মেয়েটা নতুনটাকে বলল, 'আমাদের সেই খেলাটা তোর মনে আছে?' বলেই ব্যাগ খুলে একটা আধুলি রাস্তার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল। রতু দেখল, ভীষণ দেমাকে ঝলসাচ্ছে মেয়ে দুটো। কেমন এক ক্ষ্যাপামিতে পেয়ে বসল। দ্রুত ওদের সামনে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'এটা নিয়ে যান। কেন মিছিমিছি লস্ করবেন?'

প্রথম দিনের মেয়েটা বলল, 'মাঝে মাঝে আমরা এমন করে ভিখিরিদের সেবা করি। আর কথা বাড়ালো না। ভয়ংকর গর্বের সঙ্গে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল। রতু স্তম্ভিত হয়ে ক্ষণকাল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। উত্তেজনায় মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করতে থাকে। ধীর পায়ে ও ফের রকে এসে বসল।

রতু শান্ত ধীর গলায় আপন মনেই বলে উঠলো, 'ও মেয়ে, তোমার বড় দেমাক। তুমি মাইরি ফের আসবে আমি জানি। জেনো, এই সব ভিখিরিই একদিন তোমাদের সব, যা এতদিন যত্ন করে, আদর করে আগলে রেখেছ, সব লুঠ করবে।'

বাচ্চু আর ঝন্টু অবাক চোখে চেয়ে রইল ওর দিকে। বাচ্চু একটা সিগারেট রতুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও, শান্ত হও চাঁদ, মাথা ঠাণ্ডা কর।'

ঝন্টু বলল, 'কেমন ফাস্ কেলাস একটা সিনেমা দেখলাম।' একটুক্ষণ থেমে বলল, 'তা বলে আমাদের একদম ভিখিরি বানিয়ে গেল?'

রতু একটি তুড়ি দিয়ে বলল, 'লে লে। শকুনের কান্নায় কী গরু মরে?' ওদের সেই পঞ্চাশটা পয়সা তখনও রাস্তার ওপর পড়ে ছিল। সেদিকে চোখ রেখে রতু বলল, 'ঝন্টু ওটা নিয়ে আয়।' পড়ে পাওয়া মাল আঠার আনা।' একটু থেমে ফের বলল, 'মিছিমিছি ওরা আমাদের ইনসালট করলো। ছিঃ ছিঃ।'

ঝন্টু পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়ে এসে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল কিছুক্ষণ। তারপর পয়সাটাকে দু ঠোঁটের মাঝে চেপে ধরে বলল, 'এ আমি খর্চা করবো না। লাইফ লং বুকে করে রেখে দেবো।'

বাচ্চু হালকা মেজাজে বলল, 'তিনটে ভিখিরির জন্য স্রেফ আট আনা। বড্ড কম। দেমাক দেখাবি তো নোট ফোট ছুঁড়লি না কেন? বিকেলে কষে মোগলাই প্যাঁদাতুম।'

অপমানটা রতুর ভীষণ লেগেছিল। বাচ্চুর কথায় ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'মেলা ফ্যাচফ্যাচ না করে চুপ মেরে যা তা? ভাল্লাগছে না; বাড়ি যাই।' বলেই পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে সোজা হন্‌হন্ করে এগিয়ে গেল।

একটু আগে ওরা চা খেয়ে মশলা চিবুতে চিবুতে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল। অনেক লোকজনের ভিড়, ট্রাম-বাস, রিকসা ওদের চোখের সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করল। উলটো দিক থেকে একটা লেডিস্ ট্রাম আসতে দেখেই রতু ওদের বলল, 'দাঁড়া আমি আসছি।' এক লাফে রাস্তা পার হয়ে গেল রতু। বাচ্চু আর ঝন্টুর সব কিছু কেমন অস্পষ্ট ঠেকছিল। ট্রামটা যেই স্টপে এসে দাঁড়িয়েছে, অমনি রতু ফার্স্ট ক্লাসের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'হেনা বোস কেউ আছেন? হেনা বোস! ওর বাড়িতে খুব বিপদ।'

ট্রামের ভিতবের মহিলা যাত্রীরা সকলেই একযোগে রতুকে নজর করল। ও আর বেশিক্ষণ ওখানে দাঁড়াল না। চোখের পলকে কেমন অদৃশ্য হয়ে গিয়ে হাসতে হাসতে ফিরে এল।

সে সময় অসম্ভব খুশীতে ঝলমল করছিল রতুর মুখটা। বাচ্চুর কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলল, 'কেমন কায়দা করে মেয়েগুলোকে সব দেখে নিলাম—' বলেই ওদের কাছে ব্যাপারটা খুলে বলল রতু। 'রাস্তা না হয়ে অন্য কোন নির্জন জায়গা হলে ট্যুইসট নাচতাম বুঝলি?' ঝন্টু খুশীতে বলে উঠল।

পরের দিন ওরা জায়গা পালটালো। বাচ্চু ঘরিতে সময় দেখল পাঁচটা পনেরো। কতক্ষণে প্রথম লেডিস্ ট্রামটা যায়, তারই অপেক্ষায় ওরা সতর্ক হয়ে রইল। ঠিক পাঁচটা চল্লিশ মিনিটের সময় একটা লেডিস ট্রাম ওদের চোখের সামনে এসে দাঁড়ালে রতু অসম্ভব করুণ মুখ করে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'অর্চনা মিত্র কেউ আছেন? ওঁর বাড়িতে খুব বিপদ।' বলেই সরে আসতে যাবে, রতু বাচ্চু আর ঝন্টু দেখল, বছর চল্লিশের কাছাকাছি একজন খুব ব্যস্ততার সঙ্গে ট্রাম থেকে নেমে পড়ল।

ওরা তিনজনই ভীষণ ঘাবড়ে গেল তা দেখে। পা গুলো অসম্ভব ভারি হয়ে গেল মুহূর্তে।

ভদ্রমহিলা ওদের দিকে চেয়ে—আমার নাম অর্চনা মিত্র, কি হয়েছে বলুন—কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা থাকলেও, বেশ ভরাট গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

কিছু একটা বানিয়ে ভদ্রমহিলার কাছ থেকে পার পেতে পারতো রতু। কিন্তু কী হল, শান্ত ধীর গলা গলায় মাথা নিচু করে বলল, 'দিদি, এটা স্রেফ আমাদের একটা খেলা। আমি মিথ্যে বলেছি।'

অর্চনা মিত্র এবার ভাল করে ওদের দিকে তাকালেন। নিজের ছেলের বয়সী হবে। কেমন মায়া হল। তবুও কঠিন গলায় বললেন, 'সব কিছুর ক্ষমা নেই। তোমাদের যদি আমি পুলিশে দি, লোক ডাকি?'

রতু বলল, 'সে আপনার ইচ্ছে, আমাদের কিছু বলার নেই।'

অর্চনা মিত্র হেসে ফেললেন এবার। বললেন, 'কী কর? পড়? না, ওসব পাট তুলে দিয়েছ?'

রতু বলল, ওদের সব কথা। অর্চনা মিত্র হাতঘড়িতে সময় দেখলেন। মুহূর্তের মধ্যে কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন, 'চলো, তোমাদের সঙ্গে বসে কোথাও গল্প করি। ভয় নেই। আমার ছেলেও তোমাদের মতন।'

স্নিগ্ধ হাসিতে ভরিয়ে দিলেন পরিবেশটা।

রতু সাহস পেয়ে গিয়ে বলল, 'আমাদের কপালই খারাপ। আমাদের সব খেলা কেমন করে যে ভণ্ডুল হয়ে যায় বুঝি না।' একটা নিরিবিলি জায়গার জন্য ওরা একসঙ্গে হাঁটতে লাগল। কেউ-ই সে সময় কোন কথা বলতে পারছিল না।

সময়ের পা

স্টেশান চত্বরে থিক্‌থিকে কাদা জলের মধ্যে মা-হারা মেয়েটাকে নিয়ে ত্যারছাভাবে মাথা বাঁচিয়ে একপাশে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল সুরেশ। খুলনার সুরেশ দাস। মাথার চুল কাশ ফুলের মত সাদা। লম্বাটে মুখ, খড়্গের মত নাক চাপা ঠোঁটের ওপরে সব সময় ঝুলে থাকে। কোটরাগত চোখ দুটিতে বুদ্ধিহীনতার ছাপ।

টিপটিপ করে তখনও বৃষ্টি হচ্ছিল। অবিশ্রান্ত মানুষের মিছিল একটু অবাক চোখেই দেখছিল ও। 'অ্যাও লোক! অ্যাও লোক।' দীর্ঘশ্বাস ঠেলে বেরুবার মতই অস্ফুটে নিজের মনেই কথাগুলো বলে ফেলেছিল সুরেশ, মেয়েটা ঘুমিয়ে কাদা, সাত-আট বছরের মেয়ে দেখলে কে বলবে। বাড় নেই এতটুকু। হাড় জিরজিরে চামড়া মোড়া একটা ডিগডিগে মানুষের ছানা। দেখলে নিজেরই কেমন খারাপ লাগে। চাই কি মাঝে মাঝে ভয় ওঁৎ পেতে বসে সুরেশের বুকে।

ও কলকাতায়—এর আগেও এসেছিল বার কয়েক; তখন দেশের এই হাল হয় নি। কাজ-কম্ম সেরে বুক ফুলিয়ে ফের গিয়ে ওপারে পৌছেছে। সে কি আজকেব কথা। হিসেব কষে দেখলে দেখতে পায়, প্রায় তিরিশ বছর আগেকার কথা? হায়রে হায়? সে সব দিন কোথায় গেল।

নেভান বিড়িটায় ফের আগুন ধরাল। এক মুখ ধোঁযা ছেড়ে মেয়েটাকে আড়চোখে দেখে নিয়ে কেমন ভয়ার্ত চোখে এপাশে-ওপাশে তাকিয়ে দেখতে থাকল। চল্লিশ বছর আগে দেশ ভাগ হয়েছে। এর মধ্যে কত কী-ই না ঘটে গেল। চেনা-জানা সম্পন্ন মানুষেরা একে একে দেশ ছেড়ে গেল, অন্ধকার রাতে চোরের মত নিজেদের প্রাণ নিয়ে দেশ ছেড়ে ভিটে ছেড়ে চলে গেল। ওর চোখের সামনে দিনরাত ঘটে চলল ওই দৃশ্য। চৌকিদাবেব পোশাক পরে বিহ্বল চোখে সব দেখল। যাবার সময় কেউ কেউ অস্ফুট বেদনা মাখান গলায় বলেছিল, 'চল্লাম রে সুরেশ। ভাল থাইকো, সুখে থাইকো।' বুকের ভেতবটায় কেমন জমাট বেদনায় টস টস করে উঠেছে। দু' চোখের সাদা জমিতে জল টলটল করে। আবছা অন্ধকাবে সে সব কি কেউ কখনো দেখতে পেয়েছিল? দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুরেশ, মনে পড়ল ছেলেবেলার প্রাণের বন্ধু পালান মণ্ডলও একদিন চলে গেল। অনেক সেধেছিল পালান, 'চলরে সুরেশ। এ পোড়া দ্যাশে থাইকা কি হবে চল।' সে দিনের সব কথা আজ স্পষ্ট মনে পড়ল ওর।

সময়টা ছিল শরৎকাল, শিউলির গন্ধে ম ম করতো চতুর্দিক। খাল-বিল নদীজলে থৈ থৈ, নদীর পাড়ের কাশ ফুলগুলো সাদা মাথা দুলিয়ে হাওয়ায় বিভোর নাচে মত্ত। আ—হা—হা কী

সোন্দর দ্যাশ, কী সোন্দর—আকাশ! সব কিছু এক মুহূর্তে দেখতে পেল সুরেশ।

মেয়েটার মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। ঘাড় কাত করে মেয়েটাকে দেখল সুরেশ। বুকের মধ্যিখানে ছাত ছাত করে ওঠে হঠাৎ। 'মরে গেল নাকি?' আঁৎকে ওঠে সুরেশ। আকস্মিক দুর্বল হয়ে যায় মন, অবশ হয়ে যায়। মেয়েটার বুকের ওপর শির বের করা হাত রেখে মনের এই সন্দেহ দূর করল সুরেশ। হঠাৎই যেন প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয়ে উঠল মনটা। যেমন করেই হোক, মেয়েটাকে বাঁচাতেই হবে। এক জায়গায় হার হয়েছে বলে, সব জায়গাতেই হেরে যাবে, এ চলবে না। যেমন করেই হোক, যে করেই হোক পুষ্পিকে বাঁচাতেই হবে। কেন না, পুষ্পি না বাঁচলে তো নিজেরও বাঁচা চলে না।

বৃষ্টিটা একটু থেমেছে, হঠাৎ দেখল সুরেশ, কে যেন মন্ত্র দিয়ে চারদিকের ভৌতিক পরিবেশটকে দূর করে দিল। আঁধার দূর হয়ে গেল মুহূর্তেই, বাতি জ্বললে কী সোন্দরই না কইলকাতা।' আপন মনেই বিড় বিড় করে বলল কথাগুলো।

পালানের কথা আজ অনেককাল পর মনে পড়ল কেন? পালানকে ও গর্ব করে বলেছিল, 'মরি এই দ্যাশেই মরবো, তগো মত ডর নাই আমার।'

পালান সে কথার কোন উত্তর দেয় নি। সজল চোখে সুরেশের দিকে চেয়ে মাথা নিচু করে চলে গিয়েছিল ধীর পায়ে।

খুব সন্তর্পনে মেয়েটাকে বুকে চেপে সেখান থেকে উঠে দাঁড়াল সুরেশ। অনেক লোকের ভিড়, মনে হতে থাকল কতকাল আগেকার কলকাতা আর এখনকার কলকাতা যেন আসমান জমিন ফারাক। রাস্তাঘাট আগের থেকে অনেক বেশি আলো ঝলমল। মানুষজন যেন কিরকম বিভ্রান্ত। কেউ কারো দিকে চায় না, চেয়েও দেখে না। ওর বড় সাধ যায়, যেন একজনও ওকে জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাবে গো তুমি? হায় হায়—কেউ-ই সে কথা জিজ্ঞেস করে না। চোখ তুলে ভাল করে তাকিয়েও দেখে না।

হঠাৎ নজরে যায় ছাতা বগলে অশ্বিনী পণ্ডিতের মত একজন যেন গুটি গুটি ওর দিকে এগিয়ে আসছে। বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল সুরেশ সে দিকে। লোকটা পাশ কেটে চলে যাচ্ছিল।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল সুরেশ, 'পণ্ডিতমশাই না?'

লোকটা আপন মনে চলে যাচ্ছিল। সে কথায় থমকে দাঁড়াল। সুরেশকে ভাল করে নজর করল।

লোকটা মাথা নেড়ে জবাব দিল, 'না, তুমি ভুল করেছ।'

দুহাত জোড়া করে কপালে ঠেকাল সুরেশ। কিছু বলতে গিয়ে শুকনো খড়খড়ে ঠোঁট দুটো থির থির করে কেঁপে উঠল কেবল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললো, 'তুমি কোথায় যাবে?'

এই একটা প্রশ্ন করুক তাই চাইছিল সুরেশ। দুচোখ জল ভর্তি হয়ে গেল। বলল, জানি না, অ্যাত দিন দ্যাশেই ছিলাম, হক্কলে দ্যাশ ছাড়ল, আমি ছাড়ি নাই। পালানরে কইছিলাম, মরলে

দ্যাশেই মরবো। অ্যাখন আর থাকতে পারলাম না।' বলেই ডুকরে কেঁদে উঠল সুরেশ।

সুরেশের কোলে হাড্ডিসার মেয়েটার প্রতি নজর করলো বৃদ্ধ। ক্ষণকাল কী যেন ভাবলো, ভুরু দুটো কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, 'এর কী অসুখ?'

সুরেশ ভ্যাবলা চোখে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'জানি না, হয়তো মইরা গ্যাছে, নয়তো যাবে একদিন......শেষ করতে পারল না। খুকখুক কাশির মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ভদ্রলোক আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালো। কেমন গম্ভীর থমথম করছে আকাশটা। একটু ইতস্তত করলো। পকেটে হাত দিয়ে বেশ কিছু খুচরো পয়সার ভেতর থেকে একটা আধুলি বের করে বললো, 'এটা রাখ, ওকে কিছু খেতে দাও।' বলেই সুরেশের শিরা বের করা হাতের মধ্যে আঁধুলিটা গুঁজে দিয়ে একটু দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল ভদ্রলোক।

কী যেন সব ঘটে গেল মুহূর্তে। সব কিছু কেমন যেন ওলোট-পালট হয়ে যেতে থাকল। বিস্ময়-বিহ্বল চোখে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল সুরেশ। মুঠো খুলে আধুলিটা দেখল। হাতটা তখন অসম্ভব কাঁপছিল, দুচোখে তখন জল নেই, কেবল এক ঝাঁক বিস্ময়। এক মুহূর্তেই কী যেন বুঝে গেল সুরেশ।

সেখানে দাঁড়িয়ে না থেকে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে একজন ব্যস্ত সমস্ত মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি কী সাতক্ষীরার অশ্বিনী পণ্ডিত?'

লোকটা পাশ কেটে এগিয়ে যেতে গিয়েই দেখল সুরেশেব প্রসারিত হাতটা কিছু চাওয়ার ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে। বিরক্তি মেশান মুখে তাকিয়ে পকেট থেকে পাঁচ পয়সা বেব করে কোনক্রমে ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল।

সুরেশ আর সময় নষ্ট করল না। বাঁ-হাতের মুঠোয় পয়সাটা রেখে ডানদিকের থিকথিকে ভিড়টার দিকে এগিয়ে গেল। ভিড়ের মধ্যে গিয়ে বলল, আপনি কী সাতক্ষীরার অশ্বিনী পণ্ডিত?'

উত্তর শোনার জন্য নয়, কেবল প্রসারিত হাতটায় কিছু পড়ছে কিনা তাই শুধু বোঝবার চেষ্টা করছিল সুরেশ সে সময়।

প্রসারিত হাতটা একবার ডান দিকে, একবার বাঁ-দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আর অস্ফুটে শুধু বলেই চলেছিল, 'আপনি কি সাতক্ষীরার অশ্বিনী পণ্ডিত?'

———